নীহার রঞ্জন গুপ্ত

কিরীটী অমনিবাস

কবিতা সমগ্র

নবারুণ ভট্টাচার্য

৬

প্রমা ও প্রকাশ

কিরীটী অমনিবাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

ষষ্ঠ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৮২
প্রথম 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৯৯
তৃতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪০৭

—একশ কুড়ি টাকা—

প্রচ্ছদপদ ঃ
অঙ্কন—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ—অটোটাইপ

KIRITI OMNIBUS VOL. VI
An anthology of detective fictions Vol. VI by Niharranjan Gupta.
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.
10, Shyama Charan Dey Street, Calcutta - 700 073

Price Rs. 120/-

I S B N : 81-7293-058-5

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও এসসি অফসেট, ৩০/২বি হরমোহন ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০৮৫ হইতে সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা	ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়		i
মৃগতৃষ্ণা	...	...	১
মিথুন লগ্ন	...	...	১৭৩
মণিকুণ্ডল	...		২৪১

ভূমিকা

ফ্রয়েড অনুমান-জাত সিদ্ধান্তের নিদর্শনরূপে একটি খাসা গল্প বলেছিলেন। পূর্ব ইউরোপের এক ইহুদী রেলগাড়িতে শহর থেকে গ্রামে ফিরছে। গ্রামেই তার বাড়ি, তার বয়স হয়েছে, গ্রামের সবাইকে সে চেনে। ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ি। এপথে তাদের মত গাঁইয়া লোক ছাড়া আর বিশেষ যাত্রী ওঠে না। ছোট কামরা, প্রায় খালি, দুজন মাত্র যাত্রী, বুড়ো ইহুদী আর এক ছোকরা। স্পষ্টই বোঝা যায়, শহুরে যুবক, গ্রামে—খুব সম্ভবত তাদেরই গ্রামে যাচ্ছে। কারণ এদিকে আর তেমন গ্রাম কই! কিন্তু ছোকরাটি কে এবং কী প্রয়োজনে তাদের গ্রামে যাচ্ছে?

বুড়ো ইহুদী অনুমানের পর অনুমান, যুক্তি দিয়ে সাজিয়ে খাড়া করল। অনুমান-পদ্ধতী অনুযায়ী ব্যাপারটা তার স্বগত-চিন্তায় দাঁড়াল এইরকম ঃ

"আমাদের গ্রামে বাস করে চাষাভুষো আর ইহুদী। এ ছোকরা চাষাভুষো নয়, তা পোশাকেই মালুম হয়। ইহুদী বলে মনে করা যায় কি? শহুরে ছোকরা গ্রামে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কী? ছোকরার হাতে একখানি বই, সেটি পড়ছে, সুতরাং নিশ্চয়ই ইহুদী। চাষাভুষোরা তো লেখাপড়ার ধার ধারে না। কিন্তু আমাদের গ্রামে কেন? সেখানে মাত্র পঞ্চাশ ঘর লোক বাস করে, আর সবাই গরীব। তা হলে? দাঁড়াও, ভাল কথা মনে পড়েছে। শমুয়েল-বুড়ো ব্যবসাপাতি করে—তার দুটি মেয়ে। একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে, আর একটির জন্য বুড়ো পাত্র খুঁজছে। শমুয়েল ধনী, ইদানীং তার ঠাট-বাট বড়লোকের মত, চাল চলন কেতাদুরস্ত হয়েছে। সুতরাং তার ছোট মেয়েটির জন্য সে গ্রামেই জামাই খুঁজবে না। সে নিশ্চয়ই ঘটককে বলেছে, বাইরে থেকে একটি সুপাত্র যোগাড় করে দাও। শমুয়েল তো বুড়ো, চলাফেরা বিশেষ করে না; সে তো আর নতুন একটা পরিবারের সঙ্গে আলাপ করতে গ্রামের বাইরে যাবে না, সুতরাং সে জামাই খুঁজবে এমন একটা পরিবার থেকে যাদের সে ভাল করে চেনে জানে। তার মানে এই, এমন একটি পরিবার যারা আগে এই গ্রামেই বাস করত, পরে গ্রামের পাঠ উঠিয়ে শহরে চলে গিয়েছে। কে হতে পারে সে লোক? হয়েছে, কোহেন পরিবার। তাদের একটি শিশুপুত্র ছিল। বিশ বছর আগে তারা গ্রাম ছেড়ে চলে যায় বুদাপেস্ত-এ। একটা ইহুদী ছোকরা, সেখানে কী হতে পারে? কী আবার হবে, ডাক্তার ছাড়া! শমুয়েল বুড়ো একটা ডাক্তারকে জামাই হিসাবে পেতে চাইবে নিশ্চয়ই। ডাক্তার-পাত্রকে ভারি যৌতুক দিতে হবে, মেলা টাকা-পয়সা খরচা করতে হবে। তা শমুয়েল বুড়ো করতে পারে। এই যে ছোকরা আমার উল্টো দিকের বেঞ্চিতে বসে

আছে, তার পোশাক সাফ-সুতরো, কিন্তু ভাল দামী পোশাক নয়। এর নাম নিশ্চয়ই ডক্টর কোহেন। কিন্তু বুদাপেস্‌ত-এ কোহেন চলবে না। সম্ভবত এই পরিবার নিশ্চয়ই পদবী বদলেছে। বুদাপেস্‌ত-এ কী পদবী চালু? হ্যাঁ, হয়েছে—কোভাক্‌স—এই পদবী হাঙ্গেরীয়রা ব্যবহার করে। ইহুদীরা যেমন করে কোহেন পদবী!

রেলগাড়ি যখন গ্রামের স্টেশনের কাছাকাছি এসেছে, তখন বুড়ো তার ছোকরা-সহযাত্রীকে মধুর স্বরে বললে, 'শুনুন ডক্টর কোভাক্‌স্‌, যদি শমুয়েল-বুড়ো আপনাকে নেবার জন্য স্টেশনে না এসে থাকেন, তাহ'লে আপনার চিন্তার কিছু নেই। আমিই আপনাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাব আর আপনার বাগদত্তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।'

বিস্মিত যুবক শুধাল, 'আপনি কি করে জানলেন আমি কে আর কোথায় যাচ্ছি? আমরা তো এতক্ষণের মধ্যে একটি কথাও বলিনি।'

বুড়ো মৃদু হেসে বলল, 'আমি কি করে জানলাম? তা আমার অনুমান মাত্র আর তা যুক্তিনির্ভর।'

সব গোয়েন্দা-গল্পের মূলে আছে এই যুক্তিনির্ভর অনুমান, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ আর সদাসতর্ক বিচার। শার্লক হোমস সে-কথাই তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন, 'এলিমেণ্টারি, মাই ডিয়ার ওঅটসন, এলিমেণ্টারী।' কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি সদাসতর্ক রহস্যভেদী গোয়েন্দার কাছে যা 'এলিমেণ্টারি', রহস্য-বুভুক্ষু পাঠকের কাছে তা অনেক কিছু। ব্যোমকেশ বক্‌সীও এই আয়ুধ ব্যবহার করে পাঠককে মাত করেছিলেন। রহস্যভেদী রহস্যসন্ধানী সত্য-সন্ধানী—যে নামেই তাকে ডাকুন তিনিই গোয়েন্দাগল্পের নায়ক, তার কাছে দুর্ধর্ষ খুনী, জালিয়াত আর নিষ্ঠুর চক্রীর পতন হবেই।

ইংরেজী বাংলা অনেক গোয়েন্দা-কাহিনী আমরা পড়েছি। এই সব গল্প পড়ে আমরা কী পাই? তাৎক্ষণিক উত্তেজনা, রোমাঞ্চের স্বাদ আর বুদ্ধির অসিক্রীড়া আমাদের যে আনন্দ যোগায় তা আর কোথাও পাই না।

বাংলার গোয়েন্দা-কাহিনী বা ডিটেকটিভ গল্প, রহস্যমালা বা রোমাঞ্চ সিরিজ—যে নামেই ডাকুন—পদে পদে পাঠককে যুগিয়েছে উত্তেজনা আর আমোদ। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ বক্‌সী আর নীহাররঞ্জন গুপ্তের কিরীটী রায় প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ তাঁদের রহস্যভেদী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের পক্ষে আরও দু-একজন এসেছেন, কিন্তু জনপ্রিয়তার সেরা এই দুজন। শার্লক হোমসের সঙ্গী যেমন ওঅটসন, ব্যোমকেশ বকসীর সঙ্গী যেমন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তেমনি কিরীটী রায়ের সঙ্গী সুব্রত রায়। আর আছে কিরীটীর পরিচালক জংলি।

কিরীটী রায়ের নিপুণ রহস্যভেদের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ধর্ষ শয়তান কালোভ্রমরও রহস্যপিপাসু পাঠকের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। বস্তুত কিরীটীর সঙ্গে কালোভ্রমরের বুদ্ধি ও সাহসের পাল্লা কষা না থাকলে অনেকের কাছে রহস্য-

কাহিনী জমাটি হয়ে ওঠে না।

কিরীটী রায়ের রহস্যভেদের পদ্ধতি সে নিজেই ব্যাখ্যা করেছিল সুব্রত আর রাজুর কাছে (কিরীটীর আবির্ভাব গল্প) ঃ

> এর মধ্যে চমৎকারের বা আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কতকটা সত্যি, কিছুটা মিথ্যে আর বাকিটা অনুমান—এই রীতির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের কার্যপদ্ধতি। বলতে পারেন কমনসেন্সে-এর মারপ্যাঁচ মাত্র। একজন শয়তানকে তার দুষ্কর্মের সূত্র ধরে খুঁজে বের করা এমন বিশেষ কিছু একটা কঠিন বা আজব ব্যাপার নয়। দুষ্কর্মের এমন একটি নিখুঁত সূত্র সর্বদাই সে রেখে যায় যে, সে নিজেই আমাদের তার কাছে টেনে নিয়ে যায় সেই সূত্রপথে। এ সংসারে পাপ-পুণ্য পাশাপাশি আছে। পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের তিরস্কার—এইটাই নিয়ম। আজ পর্যন্ত পাপ করে কেউ রেহাই পায় নি। দৈহিক শাস্তি বা দশ বছর জেল হওয়া অথবা দ্বীপান্তরে যাওয়াটাই একজন পাপীর শাস্তিভোগের একমাত্র নিদর্শন নয়। ভগবানের মার এমন ভীষণ যে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরও তার কাছে একান্তই তুচ্ছ।

কিরীটী রায়ের কাছে যা 'কমনসেন্স-এর মারপ্যাঁচ মাত্র', পাঠকের কাছে তা-ই পদে পদে যোগায় রোমাঞ্চ-উত্তেজনা। এক অপরাধীকে তার দুষ্কর্মের সূত্র ধরে খুঁজে বের করা, কিরীটীর মতে, 'এমন বিশেষ কিছু একটা কঠিন বা আজব ব্যাপার নয়'। কিন্তু রহস্যপিপাসু পাঠক কিরীটী আর সুব্রতর সঙ্গী হয়ে যখন অপরাধীর সন্ধানে বার হয় তখন তার উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠে। কিরীটী যখন অপরাধীকে ধরে ফেলে তখন পাঠকের মনে হয়—এ আর কঠিন কোথায়, এ তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু গল্পের সূত্রপাতে তা অনুধাবন করা যায়নি, কিরীটীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুষ্কর্মের গোপন সূত্রটি কখন আবিষ্কৃত হল তা অনুমান করা যায়নি। তার ফলে রহস্যভেদ হয়ে যাবার পর পাঠক মনে মনে কৃতজ্ঞ হয় কিরীটীর কাছে। সারা কাহিনীতে পরিব্যাপ্ত রহস্য-রোমাঞ্চ-উত্তেজনা পাঠককে যে স্বাদ দিয়েছে তা সে ভুলতে পারে না।

কিরীটী রায়ের সৃষ্টিকর্তা নীহাররঞ্জন গুপ্তের কৃতিত্ব এইখানে যে কাহিনীর শেষ পর্যন্ত তিনি সাসপেন্সকে টেনে নিয়ে যেতে পেরেছেন। অমোঘ যুক্তি-শৃঙ্খলায় কাহিনীকে বিন্যস্ত করে পাঠকের অনুমান আর কল্পনাকে পরাজিত করে তিনি কৌতূহলকে পৌঁছে দিয়েছেন তুঙ্গে। এখানেই তাঁর জিত।

'মৃগতৃষ্ণা' বিচিত্র রহস্যকাহিনী। 'ননসেন্স ক্লাব'-এর সদস্য সংখ্যা দশ—আটটি পুরুষ-বন্ধু আর দুটি বান্ধবী গড়ে তুলেছিল ক্লাবটি। পরে এল আর একটি নারী। তিনটি নারী আটটি পুরুষ। কিছুকাল আগে পর্যন্ত সকলেই ছিল অবিবাহিত। পরে দুজনের মধ্যে বিবাহ হল। রইল বাকি অবিবাহিত অষ্ট ছ'টি পুরুষ, আর দুটি নারী। হঠাৎ ঘটল বিপর্যয়। এগারোজনের

মধ্যে দুজন নিহত হল বিষপান করে। বন্ধুদের মধ্যেই আছে হত্যাকারী। সে কে ? পর পর দুটি খুনের উদ্দেশ্য কি ? বন্ধুদের মধ্য থেকে কে কেন খুন করবে ? সৌরেশ আর শিশিরকে যে হত্যা করেছে তার মোটিভ কি ? সুযোগ-সুবিধা সকলেরই থাকলেও একটা খুব জোরালো খুনের উদ্দেশ্য কিছুতেই মিলছে না !

সমাধান কে করবে ? কিরীটী রায় ছাড়া আবার কে ! কীভাবে কিরীটী যুক্তিনির্ভর অনুমান-সাহায্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে রহস্যভেদ করল, তারই রুদ্ধশ্বাস কাহিনী 'মৃগতৃষ্ণা'।

আর কলকাতায় জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর রোদে কিরীটীর অন্ধকার ঘরে এসেছিল এক বোরখা-পরা খানদানী বেগমসাহেবা তার অপহৃত মণিমুক্তা উদ্ধারের আশায়। 'মণিকুণ্ডল' গল্পে তারই আশ্চর্য উদ্ঘাটন ! নবাব সাহেবের দুই বেগম, বড়ী বেগমের সম্পর্কিত ভাই আর বাঁদী— এই চারজনের মধ্যে একজন হত্যা করেছে নবাব সাহেবকে। সে কে ? সাসপেন্স এ গল্পে মধ্যপথে চরমে পৌঁচেছে। রহস্যভেদী কিরীটীর দ্রুত চিন্তা আর কাজের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হত্যাকারীর চক্রান্ত। সবকিছুর মূলে আছে আদিম রিপু আর স্বর্ণলালসা।

কলকাতার ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চে এক জনপ্রিয় নাটকের শততম রজনীর অভিনয়ের পরদিন প্রভাতে সাজঘরে আবিষ্কৃত হলো নায়িকা মায়ার মৃতদেহ। মায়া কি আত্মহত্যা করেছে, না, মায়াকে হত্যা করা হয়েছে ? 'মিথুন লগ্ন' গল্পে এ প্রশ্নে উত্তর দিয়েছে রহস্যভেদী কিরীটী রায়। কি করে কিরীটী সিদ্ধান্ত করল যে মায়াকে খুন করা হয়েছে এবং খুন করেছে থিয়েটারের ভিতরের লোক, তা না জানা পর্যন্ত পাঠক স্বস্তি পায় না পূর্বাপর কৌতূহলকে বজায় রেখে লেখক কিরীটীর ক্ষিপ্রসঞ্চারী বুদ্ধি আর যুক্তির অব্যর্থ খেলা দেখিয়েছেন।

রহস্যভেদী কিরীটী রায়ের এই খেলা দেখে সব বয়সের পাঠক বার বার মুগ্ধ হয়েছে, হচ্ছে, হবে। কিরীটী রায় আজ বস্তু থেকে সত্যতর হয়ে উঠেছে। অনেক সময় ভাবি, কলকাতার পথে পথে চলতে চলতে হঠাৎ কিরীটী রায়ের সঙ্গে চীনেপাড়ায় বা বড়বাজারে বা হাতিবাগান অঞ্চলে দেখা হয়ে যাবে না তো ? এই ভূমিকার পাঠক শুধাবেন, আপনি তাকে চিনবেন কি করে ? কেন, চিনব না কেন ? কিরীটীর চেহারার বর্ণনা তো 'কিরীটীর আবির্ভাব' গল্পে দেওয়াই আছে : "প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ চেহারা। মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল, ব্যাকব্রাশ করা। চোখে পুরু লেন্সের কালো সেলুলয়েডের চশমা। দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো।" দূর থেকে দেখেই চিনে ফেলব। কিন্তু কিরীটী রায়ের চেহারার সঙ্গে কলকাতার অন্য কোন লোকের চেহারার মিল থাকতে পারে না কি ? পারে, তা অস্বীকার করি না। কিরীটী রায়ের সৃষ্টিকর্তা নীহাররঞ্জন গুপ্তের ছবিটা সামনে রাখুন—দেখবেন ঐ বর্ণনার সঙ্গে

অবিকল মিলে যাচ্ছে। তবে কি নীহাররঞ্জন গুপ্ত-ই কিরীটী রায় ?--অ্যাঁ, কি সর্বনাশ ! জানি না, এ কেবল অনুমান। কিরীটী রায় তো বলেইছে যুক্তি-নির্ভর অনুমান থেকেই সে রহস্যভেদ করে থাকে। পাঠক, দেখুন না চেষ্টা করে।

বঙ্গভাষা বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১০ ৩-১৯৭৫

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

মৃগতৃষ্ণা

এক

এ যে কত বড় মর্মান্তিক আঘাত তা আপনাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না কিরীটীবাবু। সৌরেশ—সৌরেশ যে শুধু আমার অকৃত্রিম বাল্য-সুহৃদ্ ও সহপাঠীই ছিল তা নয়, আমার মনের দিক দিয়েও এত বড় বন্ধু, এত বড় আত্মীয় আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না। আর তাছাড়া একবার-একবার ভেবে দেখুন তো, আমারই বাড়িতে—আমারই জন্মতিথি উৎসবে এসে অকস্মাৎ সে এমনি আনন্দ করে খেতে বসে জলের গ্লাস থেকে জল খাওয়া মাত্রই মারা গেল! কেমন করে—কেমন করে আমি সবার কাছে মুখ দেখাব কিরীটীবাবু?

বেদনায় মর্মপীড়ায় অনিল চৌধুরী যেন একেবারে ভেঙে পড়লেন।

চোখ দু'টি অশ্রুজলে তাঁর ঝাপসা হয়ে এল।

কিরীটী ঠিক যে কিভাবে অনিল চৌধুরীকে সান্ত্বনা দেবে বুঝে উঠতে পারে না।

এ বাড়ির প্রীতিভোজে হিরণ্ময় উপস্থিত ছিল অন্যতম আমন্ত্রিত হিসাবে! তার মুখেই আনুপূর্বিক সমগ্র ঘটনা ইতিপূর্বে ও শুনেছে। সমগ্র ঘটনাটা এত দ্রুত ও এত আকস্মিক যে সে-রাত্রে উপস্থিত সকলেই যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

এবং বলতে গেলে একপ্রকার হিরণ্ময়েরই একান্ত অনুরোধে ও পীড়া পীড়িতে তারই সঙ্গে সে এখানে এসেছে—অনিল চৌধুরীর বাড়িতে।

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অনিল চৌধুরীর জন্মতিথি উৎসবোপলক্ষে তার নিজগৃহে সে একটি বিশেষ প্রীতিভোজের আয়োজন করেছিল। বিশেষ পরিচিত মাত্র দশজন বন্ধু ও বান্ধবী সে-রাত্রে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। এবং অতর্কিতে সেই রাত্রে পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে সহসা যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই সমস্ত আনন্দ ও উৎসবকে নির্বাপিত করে মৃত্যুর নিষ্ঠুর কালোছায়া সব কিছুকে গ্রাস করল।

দিন দুই বাদে বিকেলের দিকে অনিল চৌধুরীর গৃহে হিরণ্ময়, কিরীটী ও অনিল চৌধুরীর মধ্যে সেই আলোচনাই চলছিল।

ঘটনাটা হচ্ছে এই।

রাত্রি বোধ করি তখন দশটা হবে, অনিল চৌধুরী বলতে লাগলেন, হিরণ্ময়ের কাছেই হয়ত আপনি শুনে থাকবেন মিঃ রায়, একান্ত ও বিশেষ পরিচিত বন্ধুদের ছাড়া সে-রাত্রে আর আমি কাউকেই উৎসবে নিমন্ত্রণ করিনি। একা মানুষ, বিয়ে-থা করিনি। জনতিনেক চাকর, একজন রাঁধুনী বামুন ও সোফার ব্যতীত বাড়িতে লোকজনও নেই।

এত বড় বাড়িটায় তাহলে আপনার নিজের বলতে আর কেউই নেই—এক আপনি ছাড়া?

না। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মা মারা যান। এগারো বছর বয়সের সময় বাবাও হঠাৎ ট্রেন-কলিশনে অ্যাক্সিডেণ্টে মারা যান। ভাল করে বোঝবার আগেই আমি মা বাবা দুজনকেই হারিয়েছি। আমার বাবার নাম নিশ্চয়ই আপনি শুনে থাকবেন—সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী পৃথ্বীশ চৌধুরী!

পৃথ্বীশ চৌধুরীর ছেলে আপনি?

হ্যাঁ। বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীর ভাগ্যে সাধারণতঃ যে প্রাপ্তিযোগ ঘটে, বাবার বেলায় তার বিপরীতই হয়েছিল। কারণ বাবা বরোদার মহারাজার স্টেটে বছর দশেক রাজ-চিত্রশিল্পী থেকে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করে গিয়েছিলেন। তাই অর্থের অভাব আমাকে কোনদিন পীড়া দেয়নি। মা-বাবাকে হারিয়ে মাসীমার স্নেহে মানুষ হয়েছি এবং আমি উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মেসোমশাই-ই আমার সমস্ত যা কিছু দেখাশুনা করায় কিছুই আমাকে হারাতে হয়নি।

সে-রাত্রে কে কে এসেছিলেন উৎসবে?

সৌরেশ—সেও ছিল আমারই মত একজন শিল্পী, তবে চিত্রশিল্পী নয়—সংগীত-শিল্পী। বর্তমানে আধুনিক গান গেয়ে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন, সৌরেশের খ্যাতি তাঁদের সকলের কাছেই ঈর্ষার বস্তু ছিল। হিরণ্ময়—আপনি তো ওকে চেনেনই। সুজিত কর—ঔপন্যাসিক সুজিত কর। বিখ্যাত অভিনেতা শিশির মল্লিক। চিত্র-পরিচালক ভবানী রায়। দৈনিক 'রাজপথ' কাগজের সম্পাদক সংবাদপত্রসেবী বিনয় মুখোপাধ্যায়। আমার, সৌরেশ, হিরণ্ময় ও শিশিরের বান্ধবী মালবিকা রায়। ভবানীর স্ত্রী ডাক্তার অজিতা রায় ও কমলা ঘোষ।

সকলেই এখনও কলকাতায় আছেন তো?

হ্যাঁ।

সে-রাত্রের সমস্ত ঘটনাই যদিও আমি হিরণ্ময়বাবুর মুখে শুনেছি, তবু আর একবার সবটা আপনার মুখে শুনলে ভাল হত মিঃ চৌধুরী। কিরীটী বলে।

সেই কথাই আপনাকে আমি বলছিলাম কিরীটীবাবু। অনিল চৌধুরী আবার তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন, গান-বাজনা শেষ হবার পর, রাত্রি তখন প্রায় দশটা হবে, সকলে খাবার ঘরে গেলাম। মেঝেতে আসন পেতে সকলে—আমরা দশজন একত্রে আহারে বসেছি।

কলার পাতায় নুন ও লেবু কেবল পড়েছে, আর পাশে কাঁচের গ্লাসে বরফ-জল দেওয়া আছে, পাতে তখনও লুচি পড়েনি। সকলে তখনও হাসি ঠাট্টা-তামাশা করছে। বিশেষ করে সৌরেশের মত আমুদে ও রাশভারী লোক আমাদের বন্ধুদের মধ্যে দ্বিতীয় কেউ ছিল না। সমস্ত আসরে মধ্যমণির মত সে-ই যেন সকলকে আনন্দদান করছিল। সৌরেশের একপাশে ছিল শিশির, অন্যপাশে ছিল হিরণ্ময়। হঠাৎ এমন সময় পাশের জলের গ্লাসটা তুলে আমাদের

সকলকে সম্বোধন করে শিশির অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলে উঠল, বন্ধু ও বান্ধবী-গণ! আমরা আজ রাত্রের এই মুহূর্তটিতে যে শুভলগ্নটিকে স্মরণ করে প্রীতি-উৎসবে মিলিত হয়েছি, যিনি যাই বলুন না কেন, এটা আধুনিক সভ্যতার একটা ফ্যাশান মাত্র। কারণ এ ধরনের প্রীতি-উৎসবের রেওয়াজ ইতিপূর্বে আমাদের দেশে বা সমাজে প্রচলিত ছিল না, তাই একে বিদেশীর অনুকরণ বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি করা হবে না! এবং অনুকরণ যখন করছি তখন সর্বতোভাবে এবং সর্বান্তঃকরণে করাই উচিত। কি বল তোমরা?

সকলে আমরা একসঙ্গে সম্মিলিত কণ্ঠে সায় দিয়ে উঠি। শিশির আবার বলতে থাকে, অতএব ওদের দেশে যেমন এই ধরনের প্রীতি উৎসবে সাধারণতঃ যাকে কেন্দ্র করে বা যার স্মরণে প্রীতি বা শ্রদ্ধা জানাতে সকলে মিলিত হয়, তারা সকলে একত্রে একযোগে সর্বাগ্রে সেই বিশেষ ব্যক্তির স্বাস্থ্য পান করে থাকে, এস, তেমনি আমরাও আজ সকলে আমাদের বন্ধুবর প্রিয় শিল্পী অনিল চৌধুরীর স্বাস্থ্য পান করি। আরে-আরে, সকলের মুখ যে অন্ধকার হয়ে গেল! ভয় নাই, ওরে ভয় নাই! ভয় নাই, মধু অভাবে যেমন শাস্ত্রীয় মতে গুড় দানের ব্যবস্থা আছে, তেমনি মদ্যাভাবে চলে জল—অর্থাৎ জলপান। অতি বিশুদ্ধ কলের জল। বেঁচে থাকুক আমাদের পৌর-প্রতিষ্ঠান ও তাদের সুবৃহৎ টালার ওয়াটায়-ট্যাংকটি। বিশুদ্ধ খাঁটি জল স্বাদহীন বর্ণহীন। মধ্যে মধ্যে একটু যা ক্লোরিনের গন্ধ।

সকলে শিশিরের কথায় আমরা হো-হো করে হেসে উঠি।

শিশির আবার বলে, আশা করি কলকাতার পৌর-প্রতিষ্ঠানের সরবরাহিত বিশুদ্ধ পাইপ্-ওয়াটার দিয়ে আমাদের সকলের প্রিয় বন্ধু অনিলের দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করে তাকে স্বাস্থ্যবান্ করতে আর কারও তাহলে আপত্তি হবে না!

না—না—না। সকলে একত্রে চিৎকার করে ওঠে।

তবে আসুন, যে যার গ্লাস হাতে নিন। শিশিরের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে আপন আপন জলের গ্লাস হাতে তুলে নেয় এবং পান করে।

ঠিক সেই মুহূর্তে সৌরেশের হাত থেকে প্রায়-জলভর্তি কাঁচের গ্লাসটা দুম করে মাটিতে পড়ে ঝনঝন্ করে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল ও সেই সঙ্গে সঙ্গে সৌরেশও টলে পড়ে গেল তার আসনের ঠিক পাশটিতেই।

আচম্কা সৌরেশকে অমন ভাবে পড়ে যেতে দেখে হিরণ্ময় ব্যস্তভাবে বলে ওঠে, কি—কি হল?

সৌরেশের কোন জবাব পাওয়া গেল না। কেবল ততক্ষণ তার দেহটা বার-কয়েক প্রসারিত ও কুঞ্চিত হয়ে আক্ষেপ করে, হঠাৎ কেমন একটা অস্ফুট গোঁ-গোঁ শব্দ করে স্থির হয়ে গেল। বন্ধ ওষ্ঠের ফাঁক দিয়ে খানিকটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল লালার সঙ্গে মেঝেতে।

ততক্ষণ সকলেরই দৃষ্টি ওদিকে আকৃষ্ট হয়েছে।

সকলেই 'কি—কি হোল ?' বলতে বলতে ভূপতিত সৌরেশের চারপাশে ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। দলের মধ্যে, আগেই বলেছি ভবানীর স্ত্রী মিসেস অজিতা রায় ছিলেন ডাক্তার, তিনিই এগিয়ে এলেন এবং নিচু হয়ে ভূপতিত সৌরেশের অসাড় দেহটা পরীক্ষা করে বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লেন।

কি ? হিরণ্ময় প্রশ্ন করে, কি—কি হয়েছে মিসেস রায় ?

সব শেষ। মারা গেছে। বিষণ্ণকণ্ঠে মিসেস রায় কোনমতে যেন কথা কটা উচ্চারণ করে থেমে গেলেন।

মারা গেছে ! হিরণ্ময় প্রশ্ন করে।

হঠাৎ যেন একটা কঠিন প্রস্তরের মত নিস্তব্ধতা সকলের মাঝখানে নেমে এসেছে।

উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর নিচে সৌরেশের অসাড় প্রাণহীন নিস্পন্দ দেহটা আকুঞ্চিত হয়ে আছে তখনও। মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাত ঈষৎ বেঁকে আছে। বিকৃত মুখভঙ্গী, বদ্ধ ওষ্ঠের পাশ দিয়ে ক্ষীণ একটা রক্তমিশ্রিত লালার ধারা, চোখ দুটো ঠেলে বের হয়ে এসেছে। বিস্ফারিত ভয়াবহ যন্ত্রণাকাতর দৃষ্টি স্থির।

সকলেই আমরা মৃতের চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ, বিমূঢ়। কারও মুখে শব্দটি নেই। সকলেই যেন বোবা বনে গিয়েছি।

প্রথমেই শিশির কথা বলে, মারা গেছে !

হ্যাঁ। মৃদুস্বরে কথাটা বলেন মিসেস রায়। তারপর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে সেই দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, পুলিসে একটা ফোন করে দিন আপনারা কেউ।

পুলিস ! কেন ? শিশির প্রশ্ন করে।

অস্বাভাবিক মৃত্যু—

অস্বাভাবিক মৃত্যু ?

হ্যাঁ, কোন তীব্র ভয়ঙ্কর বিষের ক্রিয়ায় মুহূর্তে মৃত্যু ঘটেছে। পুলিসে সংবাদ না দিলে পরে গোলমাল হতে পারে।

আবার কিছুক্ষণ সকলে চুপচাপ।

শেষ পর্যন্ত পুলিসে সংবাদ পাঠানো হয় এবং স্থানীয় এলাকার থানা-ইনচার্জ মহেন্দ্রবাবু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এখানে এসে হাজির হন।

তিনি এসে মৃতদেহ পরীক্ষা করে মিসেস রায়ের উক্তিকেই সমর্থন করলেন। বললেন তীব্র কোন বিষের ক্রিয়াতেই আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে সৌরেশের।

তারপর শুরু হল আমাদের প্রত্যেককে জেরা। সে কি লজ্জাকর ও বিশ্রী ব্যাপার ! একজনের পর একজনকে ডেকে নিয়ে আলাদা করে আধ ঘণ্টা, তিন কোয়ার্টার ধরে জেরার পর জেরা !

এত করেও পুলিস সন্তুষ্ট হয়নি, আমাদের প্রত্যেকের উপরে হুকুমজারি করেছে, আপাতত আমরা কেউই তাদের অর্থাৎ পুলিসের কর্তৃপক্ষকে না

জানিয়ে কলকাতা ত্যাগ করতে পারব না। অর্থাৎ আমরা সকলেই তাদের সন্দেহের পাত্র—নজর বন্দী!

পুলিসের এতে তো দোষ কিছু নেই মিঃ চৌধুরী। খুনের ব্যাপার—

খুন! বিস্মিত অনিল চৌধুরীর কণ্ঠ চিরে যেন অর্ধস্ফুট আর্ত চিৎকার বের হয়ে আসে, আপনি—আপনিও তাই বলছেন?

খুন বৈকি। কোন বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটেছে যখন আপনার বন্ধুর—তাছাড়া সকলেই জলপান করলে, আর কারও কিছু হল না, একমাত্র একজনই আপনাদের মধ্যে মারা গেলেন এবং মারা গেলেন যেহেতু তাঁর জলের মধ্যে ছিল তীব্র কোন বিষ। অবশ্য ময়নাতদন্তের ফলাফল থেকেই জানতে পারা যাবে কী বিষ ছিল জলের মধ্যে। শুধু খুন নয়—নৃশংস হত্যা।

কিন্তু—

আমি বুঝতে পারছি মিঃ চৌধুরী আপনি কি বলতে চান! আগে থাকতে তো আর ঠিক ছিল না কোন্ আসনে আপনাদের মধ্যে কে গিয়ে বসবে। এবং একটি জলের গ্লাসেই বিষ মেশানো ছিল। সেক্ষেত্রে সে বিষমিশ্রিত বিশেষ জলটি, যে-ই পান করত তারই মৃত্যু হত। ঘটনাচক্রে হয়ত সৌরেশই জলের গ্লাসটি থেকে জল খেয়ে মারা গিয়েছেন।

কিরীটী একটু থেমে আবার বলতে শুরু করে, কথাটার মধ্যে লুকোছাপা কিছু নেই মিঃ চৌধুরী। এবং এক্ষেত্রে অস্ট্রিচ পাখীর নীতি অবলম্বন করে, নিজের দৃষ্টি ও বিচারকে ফাঁকি দেবার কোন যুক্তিও নেই। আপনার জন্মতিথি উৎসবকে কেন্দ্র করে সেদিনকার সেই রাত্রে যে ব্যাপার ঘটে গিয়েছে সত্যিই তা মর্মান্তিক এবং আপনার নিজের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার ও পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নেই। হিরণ্ময়ের কাছেই আমি সমস্ত ব্যাপারটা যখন শুনলাম এবং ওই-ই আমাকে একান্তভাবে অনুরোধ করলে এখানে একবার আসবার জন্যে, আমি ওর অনুরোধ তখন এড়াতে পারিনি। তবু ঘটনাটা যখন আপনার গৃহেই ঘটেছে এবং আপনার জন্মতিথি উৎসবকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে তখন এ ব্যাপারের মীমাংসায় পৌঁছতে আপনার চাইতে আর কেউ বেশী আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না। তাই আপনার অনুমতি ব্যতিরেকে এ ব্যাপারে আমার হাত দিতে যাওয়াও ধৃষ্টতা মনে করি বলেই আজ এসেছি। যদিও পুলিসের কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বেই এ ব্যাপারটা তাঁদের হাতে নিয়েছেন এবং সেদিক থেকে আপনার কর্তব্যের কোন ত্রুটিই আর থাকেনি।

কথা বললে এবারে হিরণ্ময়, না না, সেজন্যে নয় কিরীটী, অনিলের সঙ্গে পরামর্শ করেই তোমার কাছে আমি গিয়েছিলাম। পুলিস এ ব্যাপারে তার কর্তব্য করছে করুক, কিন্তু বর্তমানে আমাদের তিনজনের, বিশেষ করে আমার, অনিলের ও শিশিরের দিক থেকে সৌরেশের এই নৃশংস মৃত্যুর একটা মীমাংসা হওয়া একান্তই প্রয়োজন। আর সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত না হচ্ছে, আমরা বন্ধুরা মনে এতটুকুও শান্তি পাব না। প্রতি মুহূর্তে আমাদের বিবেকের

কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

কিরীটী যেন হিরণ্ময়ের কথাগুলো ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, তাই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে হিরণ্ময়ের মুখের দিকে তাকায়।

এক-আধদিনের নয়—দীর্ঘ একুশ বছরের বন্ধুত্ব আমার, অনিল, শিশির ও সৌরেশের এবং সৌমিত্রের।

সন্ধ্যার অন্ধকার ইতিমধ্যে কখন এক সময় চারিদিক আবছা ধূসর করে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, ঘরের মধ্য থেকে কখন যে শেষ আলোর দীপ্তিটুকু পর্যন্ত মুছে গেছে কেউ ওরা টের পায়নি। সহসা পাশের বাড়িতে রেডিওর ঘোষণা শুনে হিরণ্ময় থেমে গেল।

ঘোষকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল ঃ আকাশবাণী, কলকাতা, আজকের এই সময় যাঁর গান গাইবার কথা ছিল—আপনাদের ও আমাদের সকলের প্রিয় গায়ক শ্রীসৌরেশ রায়ের—আপনারা সকলেই জানেন, গত বৃহস্পতিবার রাত্রি দশটায় অত্যন্ত আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আজ আর তিনি আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তাঁর গীত রেকর্ডের মধ্যে আজও তাঁর মিষ্টি-মধুর কণ্ঠস্বর-টুকু রয়ে গিয়েছে। তাই তাঁরই একটি প্রিয় গান রেকর্ড থেকে বাজিয়ে আপনাদের শোনানো হচ্ছে।

বেতারে সৌরেশের কণ্ঠসঙ্গীত শোনা গেল ঃ

বন্ধু! যেদিন লইব বিদায়
এই ধরণীর ধূলি হতে,
কোন ক্লান্ত গোধূলি বেলায় ;
মনে কি পড়িবে সেদিন
এই গানখানি মোর—
ছলছল বেদনায়।

সত্যি! সৌরেশের গলা ছিল অপূর্ব! অমন দরদভরা মিষ্টি কণ্ঠ সচরাচর বড় একটা শোনা যায় না। গান শোনা যেতে লাগল ঃ আমাদের এই সব হাসি-কান্নাভরা দিনগুলো, কত সন্ধ্যা রাত্রির কত মুহূর্তের সঙ্গে যা অবিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে রইল, সে সব দিনগুলো কি মনে পড়বে তোমাদের? আমার এ কণ্ঠের গান—যা তোমরা এত ভালবাস, সেই গানের সুর কি তোমাদের স্মৃতির পাতায় কখনও দোলা লাগাবে? আমাকে স্মরণ করে কি তোমাদের চোখের কোলে কখনও দু ফোঁটা অশ্রু দেখা দেবে? তা যদি হয়, জেনো, আমি তোমাদের মধ্যেই তো আছি। গানের সুরে আমার কণ্ঠের সাড়ার মধ্য দিয়েই আমাকে তোমরা পাবে। আমার গানের মধ্যেই আমি রয়ে গেলাম। আমি মরিনি—এ মৃত্যু আমার মৃত্যু নয়।

সৌরেশের গান শেষ হয়ে গিয়ে, আবার অন্য কার যেন গান শোনা যেতে লাগল।

ঘরের মধ্যে কিন্তু কারও কণ্ঠে কোন সাড়া বা শব্দ নেই।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে মনে হয় যেন সব কিছু দৃষ্টি হতে অবলুপ্ত করে দিয়েছে। বড় রাস্তার ঠিক ওপরে অনিল চৌধুরীর বাড়ি। একটা মোটরের শব্দ পাওয়া গেল। রাস্তার ইলেকট্রিক বাতিগুলো ইতিমধ্যে জ্বলে উঠেছে। পথ-পার্শ্বস্থিত একটি আলো থেকে খানিকটা আলোর রশ্মি তির্যকভাবে এসে ঘরের খোলা জানলা পথে মেঝের ওপরে এসে লুটিয়ে পড়েছে।

শোকের একটা পাষাণ গুরুভার যেন ঘরের মধ্যে চেপে বসেছে।

হিরণ্ময়ই পুনরায় সেই পাষাণের মত গুরুভার কঠিন স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কথা বললে, আমরা পাঁচ বন্ধু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম, আমাদের জীবনের চাইতেও যেন আমাদের প্রীতি ও ভালবাসা আমাদের কাছে বড় হয়ে থাকে চিরদিন—চির-জীবন যেন এই বন্ধুত্বকে আমরা আমাদের জীবনের সকল কিছু থেকে শ্রেষ্ঠ আসন দিই। কিরীটী, বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই কি আমি বলতে চাইছি! আমি শুধু বলতে চাই সত্যিই যদি কারও চক্রান্তেই সৌরেশ নিহত হয়ে থাকে, সে কেউ—আমরা কেউ যেন না হই।

ঐ যে সৌমিত্রের কথা বললেন, সে কি ঐ উৎসবে উপস্থিত ছিল না?

না। বছরখানেক হল সৌমিত্র কলকাতায় নেই। সেও একজন শিল্পী আমাদের মতই। সৌমিত্রশঙ্করের নাম আপনি শুনেছেন কিনা জানি না, বর্তমানে সে ইউ. পি. গভর্মেণ্টের প্রধান অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট। কেমিস্ট হলেও তার মত অত চমৎকার বেহালাবাদক বাংলা কেন সমগ্র ভারতবর্ষে খুব কমই হয়ত আছে। সেন্ট্রাল গভর্মেণ্টর অধীনে সে কয়েক বছর কলকাতাতেই অ্যাসিস্টেণ্ট চীফ কেমিস্টের কাজ করছিল, হঠাৎ নিজে চেষ্টা করে ইউ. পি.-তে চলে গেল। সৌমিত্রকে এখনও আমরা এ দুঃসংবাদ জানাইনি, তবে সংবাদপত্রে যদি সে এ দুঃসংবাদ পড়ে থাকে আমাদের মতই সে মর্মাহত হবে।

সৌমিত্রের কথা থাক্ হিরণ্ময়, সে যখন সে-রাত্রে এখানে উপস্থিত ছিল না তখন এ খবর শোনবার পর সে আমাদের তিনজনকেই হয়ত সন্দেহ করবে। বিশেষ করে আমাকে। বলতে বলতে যেন লজ্জায়, দুঃখে অনিল চৌধুরী মাথা নিচু করেন।

মিথ্যে আপনি মনে কষ্ট পাচ্ছেন মিঃ চৌধুরী, কিরীটী বলে, সৌরেশ-বাবুর মৃত্যু একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা, তার ওপরে তো মানুষের হাত থাকতে পারে না।

কিন্তু মনকে তো কই প্রবোধ দিতে পারছি না কিরীটীবাবু। যখনই সে সর্বনাশের কথা ভাবি, মনে হয় এর জন্যে মূলতঃ আমিই দায়ী। আমারই বাড়িতে—আমারই জন্মতিথি উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে সে এসেছিল। খাওয়া পর্যন্ত তার হল না, অভুক্ত অবস্থাতেই জল খেতে গিয়ে কোথা থেকে কি হয়ে গেল! বলতে বলতে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন মিঃ চৌধুরী।

দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে অবাধ্য অশ্রু ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়তে লাগল।

॥ দুই ॥

অন্ধকার নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে কালো পক্ষ বিস্তার করে।

বাড়ির সংলগ্ন উদ্যানে একটা বেঞ্চের ওপরে একাকী বসে মালবিকা আবছা অস্পষ্ট গাছপালাগুলোর দিকে চেয়ে ছিল।

অন্ধকারে দু-একটা জোনাকি আলোর ফুলকি দেখিয়ে ঘোরাফেরা করছে। কালো অন্ধকারের বুকে পিট্‌পিট্‌ করে অসংখ্য তারা জ্বলছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে। সৌরেশের কথাই ভাবছিল মালবিকা। সৌরেশের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় আরও চারজনকে—হিরণ্ময়, সৌমিত্র, শিশির ও অনিল।

বহুদিন থেকেই এদের পাঁচজনের সঙ্গে মালবিকার আলাপ। জীবনে ওদের পাঁচজনের মত বন্ধু ও সুহৃদ পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা।

মালবিকার জীবনে অতর্কিতে ওরা পাঁচজন এসেছিল। বাবা ছিলেন মফস্বলের কলেজের প্রোফেসার। গ্রামে থাকলেও ছিলেন অত্যন্ত উদার মনোভাবাপন্ন।

মালবিকার মা প্রসন্নময়ী যদিচ অত্যন্ত গোঁড়া ব্রাহ্মণ বংশের মেয়ে তথাপি আত্মভোলা, বিলেত-ফেরত, নাস্তিক স্বামীর সঙ্গে জীবনের চিরটাকাল অদ্ভুত একটা সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে সংসার-তরীটাকে চালিয়ে নিয়ে এসেছেন। মালবিকার পিতা প্রোফেসর অচিন্ত্য মুখার্জী পিতার একমাত্র সন্তান। অচিন্ত্যর পিতার গ্রামের জমিদারী ছাড়াও বিহারে গোটা-দুই কয়লার খনি ছিল এবং ঐ খনি দুটিই ছিল সংসারের লক্ষ্মীর ঝাঁপি। অচিন্ত্যর যখন পনের বছর বয়স, প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, ন'বছরের মেয়ে প্রসন্নময়ী এলেন মুখুজ্যেবাড়িতে মাথায় ঘোমটা টেনে, এক হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে ও অন্য হাতে কয়েকটা মাটির পুতুল বুকে আঁকড়ে ধরে কুলবধূ হয়ে।

তারপর অচিন্ত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো একটার পর একটা কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে বিলেত গেলেন। সেখান থেকে দর্শনশাস্ত্রে পি, এইচ, ডি. হয়ে ফিরে এলেন! দেশে প্রত্যাবর্তন করে অনেক ভাল ভাল সরকারী চাকরির প্রলোভনকে একপাশে অবহেলায় ঠেলে মফস্বলের এক বেসরকারী কলেজে সামান্য দুশো টাকা মাইনের চাকরি নিয়ে চলে গেলেন।

জীবনের সুদীর্ঘ আঠারোটা বছর চাকরি করে হঠাৎ একদিন সামান্য ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আবার একদিন ফিরে এলেন কলকাতায় শ্যামবাজার অঞ্চলে সুবৃহৎ পৈতৃক ভিটায়। দুটি মাত্র সন্তান। দুটিই কন্যা।

বড় মেয়ে মালবিকার বয়স তখন বাইশ বছর। কলকাতায় কোন এক বেসরকারী কলেজ থেকে সবে বি. এ. পরীক্ষায় পাস করে ইউনিভার্সিটিতে এম. এ. পড়ছে এবং দ্বিতীয়া সাগরিকা থার্ড ইয়ার বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী তখন।

সেও আজ প্রায় সাত-আট বছর পূর্বের কথা।

তারপর মালবিকা এম. এ. পাস করে দেশের কাজে ভিড়ে গেল। দু'বছর জেল খাটলে এবং বর্তমানে ছোটখাটো একটা নার্সারী স্কুল খুলে তাই নিয়ে

মেতে আছে, বিয়ে-থা করেনি আজ পর্যন্ত।

ছোট সাগরিকা কিন্তু বি. এ. পাস করে এম. এ. না পড়ে নার্সিং শিখে এখন স্বাধীন ব্যবসা করে। স্কুল খোলা থাকলে মালবিকা স্কুল-বোর্ডিঙেই থাকে। তবে গ্রীষ্ম ও পূজাবকাশে মা-বাবার কাছে এসেই কিছুদিন কাটিয়ে যায়।

এবারেও গ্রীষ্মের ছুটিতে মালবিকা বাবার এখানে এসেছিল। ছুটি ফুরিয়ে এল, এবারে যেতে হবে। আবার সেই নার্সারী স্কুল। রুটিন-বাঁধা একটানা একঘেয়ে জীবন।

কিন্তু মালবিকা কি আজ ক্লান্তি বোধ করছে? জীবনে ইচ্ছা করেই যে পথটা সে বেছে নিয়েছিল, যে জীবন পথের দু'পাশে জ্ঞানের মণিদীপ জেবলে চেয়েছিল সে আরতি করতে, ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত, সেখানে কি সত্যিই আজ কোন দ্বিধা বা সংকোচ দেখা দিয়েছে?

দুর্বলতা! সত্যিই কি আজ সে দুর্বল হয়ে পড়েছে?

না, আজ নয়—এ দুর্বলতা একদিনের নয়—হঠাৎ আসাও নয়।

বছর পাঁচেক ধরে মনের অগোচরে আজকের এই দুর্বলতা তিল তিল করে তার মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে।

না, আজ আর তাকে অস্বীকার করবার, এড়িয়ে যাবার কোন উপায়ই নেই।

* * *

ওদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল মালবিকার Nonsense Clubয়ে।

বান্ধবী অজিতার অনুরোধে পড়েই মালবিকা গিয়েছিল Nonsense Clubয়ে।

শ্রাবণী পূর্ণিমার রাত্রে 'ননসেন্স ক্লাবে'র ছিল একটি বিশেষ অধিবেশন। সেই সঙ্গে হয়েছিল ছোটখাটো একটি জলসার আয়োজন ক্লাবের সভ্য ও সভ্যাদের নিয়ে।

সৌরেশ রায়—আধুনিক ও রবীন্দ্র-সংগীতে অদ্বিতীয়-কণ্ঠ সৌরেশ রায়ই নাকি আজকের অধিবেশনে গান গাইবে।

সৌরেশের গান মালবিকার চিরদিন শুনতে ভারি ভাল লাগে কিন্তু সামনা-সামনি বসে শোনবার সৌভাগ্য আজ পর্যন্ত ওর হয়নি। এত বড় সুযোগ—মালবিকা অজিতার কথায় সহজেই রাজী হয়ে গেল। অজিতাও ক্লাবের একজন সভ্যা।

ক্লাবের আয়োজনটা সামান্যই। লেক্ টেরেসে একটা ফ্ল্যাটে দুখানা অপরিসর ঘর নিয়ে ননসেন্স ক্লাবের আড্ডা। জনা-আষ্টেক সভ্য ও সভ্যা। সভ্যা বলতে অবিশ্যি অজিতা ও কমলা। বাকি সব সভ্য।

ক্লাবের প্রধান পাণ্ডা ও উৎসাহীদের মধ্যেই—হিরণ্ময়, অনিল, সৌমিত্র, সৌরেশ, বিনয়, সুজিত, ভবানী, শিশির ও অজিতা—বিশেষ করে অনিল,

সৌমিত্র ও সৌরেশের উৎসাহেই একদিন গড়ে উঠেছিল এই ননসেন্স ক্লাবটি। আপন খেয়াল-খুশিতে, অসম্ভব ও আজগুবী নিয়ে এদের কারবার। ক্লাবের কোন বাঁধা-ধরা নিয়মকানুন নেই।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই মালবিকার কানে এল সৌরেশের অপূর্ব মধু-স্রাবী কণ্ঠস্বর (সৌরেশ গাইছিল ঃ

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে
কি এনেছিস বল্ !
হাসির কানায় কানায় ভরা
কোন্ নয়নের জল !

মানুষের কণ্ঠস্বর যে এত মধুর, এত মর্মছোঁয়া হতে পারে এ যেন মাল-বিকার ধারণারও অতীত ছিল। ইতিপূর্বে সে সৌরেশের গাওয়া গান শুনেছে বটে তবে সে হয় রেকর্ডে, না হয় রেডিওতে। কিন্তু রেডিও বা রেকর্ডে গলার অতি সূক্ষ্ম যে কারুকার্য তা তো এত সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করে না। বাঙ্ময় সুরের যে ঐন্দ্রজাল, সে তো এমনি করে ব্যক্ত হয় না। সংগীত যে মানুষের অন্তরকে এমনি করে স্পর্শ করতে পারে, তার অচেতন আত্মোপলব্ধিকে এমনি করে সম্মোহিত করতে পারে, ইতিপূর্বে মালবিকা নিজেও তা কোন দিন বোঝেনি। অজিতার সঙ্গে সঙ্গে মালবিকা কক্ষমধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। হারমোনিয়ম নয়, শুধু গলায় তানপুরার সাহায্যে সৌরেশ গান গাইছিল আর তার সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বেহালা বাজাচ্ছিল সৌমিত্র।

ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ কয়েকটা চেয়ার ও সোফা। উপস্থিত সকলে সেই সব চেয়ার ও সোফা অধিকার করে বসে আছে।

অজিতা ও মালবিকাকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতে দেখেও কেউ এতটুকু ঔৎসুক্য বা কৌতূহল প্রকাশ করলে না।

একটা দুটো করে সৌরেশ সেদিন প্রায় চারটি রবীন্দ্র-বর্ষাসংগীত গাইলে। মালবিকাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে ইতিমধ্যে অজিতা কখন একসময় ইলেকট্রিক স্টোভে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছিল পাশের ঘরে ঢুকে।

দেওয়াল-আলমারিতে যে দুধের টিন, চিনির কৌটো এবং কাপ-প্লেটগুলো ছিল সেগুলো নামিয়ে কাপে কাপে চা তৈরি করে গানের আসরে নিঃশব্দে প্রবেশ করে একসময় সকলকে চা-ও পরিবেশন করে গেল।

কোনরূপ প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাবাদ না করে ঘরের মধ্যে সকলেই যে যার হাত বাড়িয়ে অজিতার হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে চা পানে মনঃসংযোগ করে। মালবিকাও বাদ যায় না।

সৌরেশের গান শেষ হল।

কিন্তু গান শেষ হলেও সৌমিত্রের বেহালা যন্ত্রটি নীরব হয় না। হারানো সুরকে তখনও যেন সে ছড়ির সাহায্যে তারের উপরে স্পর্শ-টান দিয়ে জাগিয়ে

রাখতে চায়।

মালবিকা অজিতাকে বেশ ভাল করেই চেনে। চিরটাকালই ও একটু ছটফটে মেয়ে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকলেও চঞ্চল প্রকৃতির। নারী সুলভ লজ্জা-সংকোচের ধার ধারে না। এবং নারী হয়েও তার মধ্যে পুরুষের একটা সহজ, ঋজু, সচেতন আত্মবোধ আছে। ম্যাট্রিক পাস করে চিরাচরিত মেয়েদের মত আই. এ না পড়ে আই. এস্-সি. পাস করে মেডিকেল কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়েছে। রান্নাঘরের হাতা, কড়াই, খুন্তি সম্পর্কে যদিও ওর খুব একটা বিরাগ বা বিতৃষ্ণা নেই, ডাক্তারী ছুরি, কাঁটা, ওষুধপত্র, এনাটমি হল বা অপারেশন থিয়েটারের উগ্রআইডোর্ম ও ক্লোরোফরম বা ইথারের মিষ্ট তীক্ষ্ণ গন্ধেই অনুরাগটা যেন একটু বেশী।

সংগীত বা বাদ্যযন্ত্র তাকে আকর্ষণ করে বটে, তবে সমস্ত অন্তরে যেটা সত্যিকারের সাড়া জাগায় সেটা কানে স্টেথো লাগিয়ে তার ডায়াফ্রাম্‌টা যখন রোগী বা রোগিণীর বক্ষে সংস্থাপিত হবার পর বক্ষের নানা প্রকারের অদ্ভুত সব শব্দ—'রালস্' 'রংকাই' 'ক্রিপিটেশনস' 'মারমার' ইত্যাদি শব্দগুলোই কানের মধ্যে গুঞ্জরণ তোলে।

নানা প্রকারের রং তাকে আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু সাধারণ মেয়েদের মত শাড়ি-ব্লাউজের রামধনু রং নয়, প্যাথলজিকাল ও ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীর মধ্যে র‍্যাকে ও ডেস্কে সাজানো ছোট-বড় শিশিগুলোতে যে সব সলুশন্ ও 'ডাই' আছে—সেগুলোই যেন মনের আকাশে সত্যিকারের সাতরঙা রামধনু রচনা করে।

এক কথায় অজিতা বোস্ মেয়ে হয়েও যেন মেয়ে নয়। মালবিকা ও কমলা অতটা না হলেও অজিতারই অনেকটা সমধর্মী।

তাই হয়ত ঐ ননসেন্স ক্লাবে তারা এসে নাম লেখাতে পেরেছিল।

ক্লাবে অজিতার হাতের তৈরী চায়ের প্রশংসা করত সবাই। রহস্যটা অবশ্য কিছুদিন আলাপের পর ভবানীই একদিন ক্লাবে ভেঙে দিয়েছিল।

কারণও ছিল তার। অজিতা নারী হয়েও তার দেহের এবং শুধু দেহেরই নয়, চালচলন, কথায়-বার্তায়, হাবে-ভাবে যে একটু ঋজু পুরুষ ভাব ছিল, কোন পুরুষই সেই জন্য অজিতার প্রতি বড় একটা আকর্ষিত হত না ; তথাপি এদের মধ্য থেকে ভবানীকে অজিতা বোধ হয় আকর্ষণ করেছিল এবং ভবানী মধ্যে মধ্যে হসপিটালে যখন অজিতা নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকত, সেখানে গিয়ে সে হানা দিত।

এমনি এক শীতের সন্ধ্যায় অজিতা যখন ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে কতকগুলো টি. বি. স্পুটাম নিয়ে মাইক্রোস্কোপে তাদের স্বরূপ ও আকৃতি নির্ণয়ে ব্যস্ত, ভবানী গিয়ে হাজির।

অজিতা তার নামের আগে মিস বা নামের পর কোন পদবী বা দেবী ইত্যাদি মোটেই পছন্দ করত না। সে বলত, কোন মানুষের পরিচয় তো আর

ঐ নাম বা পদবীটার মধ্যে নেই, তবু ডাকার সুবিধার জন্যে যখন একটা নাম থাকা একান্তই প্রয়োজন—তখন মিথ্যে ঐ নামটার সঙ্গে মিস বা পদবী, দেবী ইত্যাদি জুড়ে দীর্ঘ না করে কেবল নামটুকু ধরে ডাকলেই তো সময়সংক্ষেপও হয় এবং সোজাও হয়। এবং বিশেষ যে নারী বা পুরুষকে ডাকা, সেও বুঝতে পারে।

তাকে সেই জন্যে সকলে কেবল 'অজিতা' বলেই ডাকত।

মাইক্রোস্কোপের তলা থেকে একটা স্লাইড নিয়ে অজিতা যখন ট্যাপ-ওয়াটারে সেটাকে ধুচ্ছে, পিছন থেকে ভবানী ডাকল, অজিতা ?

কে ? ফিরে দাঁড়ায় অজিতা।—ভবানী ! এস—তারপর ?

ফিল্মের শুটিং হচ্ছিল। হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ায় স্টুডিও ছেড়ে চলে এলাম সোজা তোমার কাছে।

বল কি ! হঠাৎ শুটিং করতে করতে আমাকে মনে পড়ে গেল ! সর্বনাশা অন্তরের টান তো ! টালিগঞ্জ থেকে একেবারে সোজা কলেজ স্ট্রীটে ! দাঁড়াও, গলাটা শুকিয়ে উঠেছে। ইলেক্ট্রিক ফার্নেসে চায়ের জল চাপিয়ে রেখেছিলাম, জলটা নিশ্চয়ই এতক্ষণ হয়ে গিয়েছে, চা করে আনি।

অজিতা পাশের ঘরে চলে গেল।

অজিতার হাতের তৈরী চা খেয়ে পরের দিনই ননসেন্স ক্লাবে এসে ভবানী ঢক্কানিনাদে অজিতার তৈরী চায়ের অভূতপূর্বতা ও অনিন্দনীয়তা বিঘোষিত করলে।

একটু পরেই অজিতা যখন ক্লাবে এল, সকলে সমস্বরে দাবি জানাল, অজিতা, চা ! তোমার হাতের তৈরী চা !

অজিতা প্রথমে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে উঠতে পারেনি। পরে সৌরেশ তাকে সব বুঝিয়ে দিতে হেসে বললে, ভবানী is terribly naughty !

অজিতার তৈরী চা-পানের পর কিন্তু সকলেই সমস্বরে প্রশংসাবাদ জানাল এবং সর্বসম্মতিক্রমে অজিতার উপরেই এবার থেকে চা তৈরীর যাবতীয় দায়িত্ব-টুকু তুলে দেওয়া হল। এবং সেইদিন থেকেই নির্বিবাদে অজিতাও ঐ দায়িত্ব-টুকু পালন করে আসছে সানন্দে।

যা হোক, সেদিনও গান-শেষে চা-পানের পর অজিতার মধ্যস্থতায় ক্লাবের সভ্য ও সভ্যাদের সঙ্গে মালবিকার আলাপ-পরিচয়টা সাঙ্গ হল।

ছন্নছাড়া বেপরোয়া এই ক্লাবটিকে কেন্দ্র করে যারা এসে এখানে জড় হয়, সকলকেই মালবিকার ভাল লাগল। ফলে ক্রমে মালবিকাও ক্লাবের একজন রীতিমত সভ্যা হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে একদিন অকস্মাৎ মহাসমারোহে ডাঃ অজিতা বোসের সঙ্গে পরি-চালক ভবানী রায়ের বিবাহ হয়ে গেল। এবং সেই বিবাহ-আসরেই প্রথম মালবিকা হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল একটি ক্ষুদ্র ব্যাপারে, সৌরেশ সোজাসুজি এক ফাঁকে মালবিকাকে নিভৃতে ডেকে এনে বললে, একটা কথা বলব তোমাকে।

মনে করবে না তো কিছু ?

এদিককার ব্যালকনীটা নির্জন, উৎসবের আলো এখানে এসে পড়েনি। তবে আকাশে ছিল চাঁদ—তার আলো অপর্যাপ্তভাবেই জায়গাটায় ছড়িয়ে দিয়েছিল তার জ্যোতি।

বাগানে বোধ হয় কোথাও হাসনুহানা ফুল ফুটেছে, বাতাসে তার উগ্র মিষ্ট গন্ধ ছড়িয়ে আছে।

উৎসব-বাড়ির সানাইয়ে ধরেছে জয়জয়ন্তী আলাপ। উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ বটে, কোন একজন পুরুষের কোন এক নারীকে তার মনের কথা খুলে বলবার।

কিন্তু বেচারা সৌরেশ মালবিকাকে ঠিক চিনত না। প্রেম বা ভালবাসার ব্যাপারে মালবিকা ছিল অত্যন্ত ভীরু ও সংশয়াপন্ন। সহজ স্ত্রী পুরুষের হৃদয়-দৌর্বল্যের ব্যাপারটাকে সে অন্তরে অন্তরে এড়িয়ে চলত এবং ঐ সম্পর্কে কারও কোন কথা শুনলে বিশেষ একটা কৌতুকেই যেন অনুভব করছে এমনই একটা ভাব দেখাত, অন্ততঃ মালবিকার সঙ্গে বেশী মিশলে ঐ ধারণাটা হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

সহজ অসংকোচেই জিজ্ঞাসা করল, কি কথা ? বল !

আমি তোমাকে বিবাহ—

সৌরেশের কথাটা শেষ হল না—বাধা দিয়ে মৃদু হাস্যের সঙ্গে মালবিকাই কথাটা শেষ করল, বিবাহ করতে চাও ? কিন্তু আমি ঠিক এখনও ঐ কথাটা আমার সম্পর্কে কোনদিনই ভেবে দেখিনি। তোমার মত আমি যদি কখনও তাগিদ অনুভব করি তো তখন ভেবে দেখা যাবে। কেমন ?

ব্যাপারটা এইখানেই মালবিকা চুকিয়ে দিলেও, সৌরেশ কিন্তু চুকিয়ে দিতে পারেনি। এবং সেটা মালবিকা সৌরেশের হাবেভাবে কথায়বার্তায় বেশ ভাল করেই উপলব্ধি করত। যদিও ঐদিনকার কথাবার্তার পরে আর দ্বিতীয়বার কোনদিনই সৌরেশ ও সম্পর্কে মালবিকাকে মুখোমুখি অনুরোধ জানায়নি বা ঐ সম্পর্কে কোনরূপ উচ্চবাচ্যও করেনি।

আজ অনেকদিন পরে সৌরেশের আকস্মিক মৃত্যুর পর অন্ধকারে উদ্যান-মধ্যে বেঞ্চের উপরে বসে মালবিকার সেই কথাগুলোই মনে পড়ছিল ; এবং সেই সঙ্গে আরও মনে পড়ছিল—শুধু সৌরেশই নয়, শিশিরও একদিন ঐ ইচ্ছাটিই ব্যক্ত করতে চেয়েছিল ; তারপর অনিল ও হিরণ্ময় পত্র দ্বারা জানিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত সৌমিত্রও তাকে সোজাসুজি বিবাহের প্রার্থনা জানিয়েছিল। একই জবাব দিয়েছে মালবিকা সৌরেশের মত প্রত্যেককে।

ওদের মধ্যে সৌরেশ, শিশির, অনিল ও হিরণ্ময় দ্বিতীয়বার তাকে ও সম্পর্কে কিছু আর না বললেও সৌমিত্র কিন্তু অত সহজে হাল ছাড়েনি।

ব্যাপারটাকে অর্থাৎ তার দাবিকে অত সহজে মিটিয়ে ফেলতে চায়নি।

সব চাইতে ব্যাপারটার মধ্যে মজা ছিল এই যে সৌরেশ, সৌমিত্র, শিশির,

অনিল ও হিরণ্ময় প্রত্যেকেই তারা অন্তরে অন্তরে মালবিকাকে আকাঙ্ক্ষা করলেও, কেউ কারও মনের কথা জানত না বা কেউ কাউকে ঘুণাক্ষরে ঐ সম্পর্কে সন্দেহও করেনি এবং একে অন্যের সঙ্গে ঐ সম্পর্কে কোনদিন সামান্য আলোচনাও করেনি।

মালবিকা জানত এরা পাঁচজন কত অন্তরঙ্গ বন্ধু, কি অচ্ছেদ্য প্রীতি ও সৌহার্দ্য এদের পাঁচজনের পরস্পরের মধ্যে।

সামান্য মাত্র সন্দেহও যদি একে অন্যকে করত তাহলে হয়ত বন্ধুত্বের চির-অবসান হয়ে যেত বা প্রীতির সম্পর্কে ছেদ পড়ত ; কিন্তু সুচতুরা মালবিকাও কোনদিন এদের কাউকেই কারও সম্পর্কে যেমন কোন কথা বলেনি, তেমনি নিজেও কারও কাছে কোনদিন ধরা দেয়নি। সৌমিত্র যে হঠাৎ একদিন কলকাতা থেকে নিজে চেষ্টা করে ইউ. পি.-তে বদলি হয়ে চলে গেল তার আসল কারণটা আর কেউ না বুঝলেও মালবিকার কিন্তু বুঝতে কষ্ট হয়নি। নিছক মালবিকার প্রতি বিরাট একটা অভিমান নিয়েই সৌমিত্র কলকাতা থেকে সরে গিয়েছিল, অন্ততঃ মালবিকার সেইরূপ ধারণাই হয়েছিল।

কারণ যাবার আগে সৌমিত্র মালবিকাকে একটা চিঠি দিয়েছিল ঃ

মালবিকা,

তোমাকে ভালবেসেছিলাম সমস্ত অন্তর দিয়ে, কিন্তু প্রতিদানে কিছুই পেলাম না তোমার কাছ থেকে। কাব্যে, গল্পে কাহিনীতে পড়েছি এবং মানুষের জীবনে দেখেছি ও শুনেছি, নারী কোমলা, প্রেমময়ী, কিন্তু রক্ত-মাংসের শরীরে নারী হলেও অন্তরে নিশ্চয়ই সে শ্রেণীভুক্তা নও, তাই এমন উদাসীন এমন নিষ্ঠুর। তুমি কাউকে ভালবাস কি না জানি না, এবং জানতে পারলে যদিও এত বড় দুঃখেও আমার সামান্য সান্ত্বনা থাকত, তবু তোমাকে যাবার আগে অভিশাপ না দিয়ে এইটুকুই জানিয়ে গেলাম—যদি তোমার প্রতি আমার এ ভালবাসা সত্যি হয় একদিন আমার খোঁজ তুমি করবে, শুধু সেই দিনটির শুভাকাঙ্ক্ষা নিয়ে আজ তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। তুমি আমার যে ক্ষতি করেছ তার জন্যে তোমাকে দোষ দিয়ে নিজেকে আমি ছোট করব না। কিন্তু একটা কথা তোমার জানা দরকার, জীবনে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ— আমাদের পাঁচজনের মধ্যে যে বন্ধুত্ব তাকেও আজ ত্যাগ করে আমাকে দূরে চলে যেতে হল—সেও আজ তোমারই জন্যে। তবু—তবু তোমাকে আমি ভালবাসি এবং চিরদিনই এমনি ভালবাসব।

বন্ধু— সৌমিত্র।

চিঠির প্রত্যেকটি কথা আজও মালবিকার স্পষ্ট মনে আছে। ভোলেনি সে চিঠির একটি অক্ষরও। এবং চিঠিখানাও সে নষ্ট করে ফেলেনি। সযত্নে রেখে দিয়েছে বাক্সের মধ্যে তুলে, কেন তা সে-ই জানে।

সৌমিত্র আজ দূরে চলে গেছে প্রায় এক বছর হল।

তবু সৌমিত্র চোখের সামনে না থাকলেও কি তাকে সে ভুলতে পেরেছে ?

একমাত্র সৌমিত্রই তার জবাবকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলে না। বাকি চারজন—অনিল, হিরণ্ময়, সৌরেশ ও শিশির এদের মধ্যে কোন পরিবর্তনই আজও তার চোখে পড়েনি অবিশ্যি।

তারা যেন পূর্বের মতই বন্ধুত্বের যোগসূত্রটাকে অবিচ্ছিন্ন রেখেছে।

আশ্চর্য হয়ে যায় মালবিকা। পুরুষ ও নারীর মধ্যে কি প্রেম বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সুন্দর একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে না ?

আলাপ পরিচয় ও সৌহার্দ্যের শেষ কি পরস্পরের বিবাহের মধ্যেই হবে ? নারী ও পুরুষের যাবতীয় সম্পর্কের শেষ পরিণতি কি স্বামী ও স্ত্রীর বন্ধনেই ?

কৈশোর থেকেই মালবিকা নানা পুরুষের সান্নিধ্যে এসেছে, কোন সংকোচই তাকে বা তার মনের গতিকে সংকুচিত করতে পারেনি। রেখাপাত করতে পারেনি কেউ কোনদিন—কোন পুরুষই।

কিন্তু আজ যেন মনে হচ্ছে সেও নারী।

মনের গহন তলদেশে কোথায় একটি ছোট্ট মেয়ে ঘুমিয়ে ছিল, সহসা বসন্ত বাতাসে যেন সেই ঘুমন্ত মেয়েটির সর্বাঙ্গে একরাশ গন্ধফুল ঝরে পড়েছে, ফুলের স্পর্শে হঠাৎ জেগে উঠেছে মেয়েটি।

কোথা থেকে আসছে এ উগ্র মদির গন্ধ ? বাতাসে আজ কিসের স্পর্শ ? স্নায়ুতে স্নায়ুতে আজ কিসের এ মাদকতা ? আবেশে চক্ষু দুটি মুদে আসে।

কে যেন এসে এই মুহূর্তে তার সামনে দাঁড়িয়েছে।

কে ? মেয়েটি কে ? কপোল ও কপালে রক্তারুণিমা।

মালবিকা চারদিকে তাকায় ভীরু দৃষ্টিতে– আশেপাশে কেউ নেই তো !

না। অন্ধকার অস্পষ্ট তারার আলোয় সব তরল আবছা।

তিন

সেদিন তাই কিরীটী বলেছিল, তোমার কথা আমি বুঝতে পেরেছি হিরণ্ময়। সৌরেশবাবুর আকস্মিক মৃত্যুতে তোমরা যেন তোমাদের বিবেকের কাছে অপরাধী হয়ে পড়েছ। এক্ষেত্রে সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে আজ এই মুহূর্তে আমি কথা দিতে পারছি না ঠিক তোমাদের আমি সাহায্য করতে পারব কিনা।

কেন ?

সর্বাগ্রে এখানে সেই উৎসবের রাত্রে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করছি ততক্ষণ কোন রকম কথাই আমি দিতে পারছি না।

তোমার কি মনে হয় না কিরীটী, এর মধ্যে সত্যিই কোন নিষ্ঠুর চক্রান্ত আছে ? যার ফলে সৌরেশের প্রাণহানি ঘটেছে ? হিরণ্ময় আবার প্রশ্ন করে।

শুধু মনে কেন, তোমাদের মুখে ঘটনা যতটা শুনেছি তাতেই আমি স্থির-নিশ্চিত যে সৌরেশবাবুকে হত্যা করা হয়েছে।

অনিল চৌধুরী যেন কিরীটীর কথায় হঠাৎ কেঁপে ওঠে।

কিরীটী তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে অনিল চৌধুরীর মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল, কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে অনিল চৌধুরীর কাঁপুনিটুকুও যেমন কিরীটীর নজর এড়ায় না, তেমনি তার মুখের সমস্ত রক্ত সরে গিয়ে যে মুখখানা একেবারে রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে সেটুকুও বুঝতে ওর কষ্ট হয় না।

কিরীটী বলে, এভাবে আনন্দের উৎসরের মধ্যে আকস্মিকভাবে একজন প্রিয় বন্ধুর শোচনীয় মৃত্যুর ব্যাপারটা যে মর্মান্তিক কোন সন্দেহই নেই তাতে এবং যা ঘটেছে তাতে তোমাদের কোন হাত না থাকলেও, ঘটনাচক্রে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক তোমরা সব বন্ধুরাই যে জড়িত হয়ে পড়েছ তাও বুঝতে পারছি—

কিরীটীর কথাটা শেষ হল না, বাইরে বারান্দায় কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

পায়ের শব্দে সকলেই সচকিত হয়ে ওঠে।

ভবানীর স্ত্রী ডাঃ অজিতা রায় এসে প্রবেশ করল দ্রুত চঞ্চল পদে এবং ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সে বলে, অনিল, শুনেছ? সৌরেশের পোস্টমর্টেম্ রিপোর্ট? তার স্টমাকে তীব্র হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড পয়েজন্ পাওয়া গেছে। আমি তখুনি বলেছিলাম, তীব্র কোন বিষের ক্রিয়ায়—বলতে বলতে হঠাৎ ওদের পাশে তৃতীয় অপরিচিত ব্যক্তি কিরীটীকে উপবিষ্ট দেখে ডাঃ অজিতা রায় থমকে কথা বন্ধ করে ওদের দিকে সপ্রশ্ন কুঞ্চিত দৃষ্টিতে তাকায়।

হিরণ্ময়ই কথা বলে, অজিতা, আমার বন্ধু কিরীটী রায়। কিরীটী বলে কিরীটীকে পরে সম্বোধন করে হিরণ্ময় বলে, আমাদের বান্ধবী ডাঃ অজিতা রায়—ভবানী রায়ের স্ত্রী। ইনিও সেদিন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

ওঃ, নমস্কার ডাঃ রায়। কিরীটী হাত তুলে অজিতাকে নমস্কার জানায়।

অজিতাও প্রতিনমস্কার জানায় হাত জোড় করে, তারপর বলে, আপনিই কিরীটী রায়?

হ্যাঁ।

আপনার নাম শুনেছি—সত্যসন্ধানী—রহস্যভেদী কিরীটী রায়!

কিরীটী স্মিতভাবে তাকায় ডাঃ অজিতা রায়ের মুখের দিকে।

সাধারণতঃ বাঙালী মেয়েদের মধ্যে এমন চেহারা বড় একটা দেখা যায় না। খুব রোগাও নয়, আবার খুব মোটাও নয়—মাঝারি চেহারা, তবে বেশ লম্বা। গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। আশ্চর্য চোখ-মুখের গঠন।

কিন্তু যেন মেয়েলী শ্রী অজিতার চেহারার মধ্যে কোথাও নেই। কেমন একটা উদ্ধত পৌরুষের ছাপ সমস্ত চেহারায়।

তীক্ষ্ন সজাগ অনুসন্ধানী দু'চোখের দৃষ্টি, উন্নত নাসা, পুরু ওষ্ঠ। ছড়ানো চৌকো চোয়াল দৃঢ়কঠিন। রোমশ বাহু বলিষ্ঠ ও সুগঠিত। নারীর কমনীয়তা কোথাও তার মধ্যে নেই। মোটা মোটা আঙুল।

অজিতা রায় যে বসেছে চেয়ারটার ওপরে, তার বসবার সে ভঙ্গীটুকুর মধ্যেও যেন মেয়েলী ভাব নেই।

কিরীটীবাবুকে আমি আর অনিল পরামর্শ করেই সৌরেশের হত্যা-ব্যাপারে একটা মীমাংসা করবার জন্যে ডেকে এনেছি এখানে অজিতা। সব কথাই ও শুনেছে, ওর কাছে আমাদের কিছুই গোপন নেই। তোমার যা বলবার তুমি অসংকোচেই বলতে পার অজিতা। হিরণ্ময় বলে অজিতাকে লক্ষ্য করে।

ভালই করেছ হিরণ্ময়, পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটা শুনে অবধি আমিও ঐ কথাই ভাবছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, মনে মনে নিজেকে যেন কেমন অপরাধীই মনে হচ্ছে। দেখ, আমি চিরদিন অত্যন্ত সোজা কথার মানুষ, তোমরা সকলেই তা জান হিরণ্ময়। আজ দু'দিন থেকে সেই বিশ্রী ঘটনার পর কেবলই আমার কি মনে হচ্ছে জান? আমরা যতই পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বের গর্ব করি না কেন, সৌরেশের এইভাবে আকস্মিক বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যু—সে বন্ধুত্বের কষ্টিপাথরে এমন একটা আঁচড় কেটে গিয়েছে যে দাগ সহজে মিলোবার নয়।

কি তুমি বলছ অজিতা? অনিল রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করে।

আমি ঠিকই বলছি অনিল। ভেবে দেখ, সে-রাত্রে তোমার জন্মতিথি উৎসবে আমরা কজন বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধব ছাড়া বাইরের লোক অন্য কেউই তো উপস্থিত ছিল না এখানে যাতে করে আমরা নিজেদের এই লজ্জাকে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারি। তাছাড়া পোস্টমর্টেমে সৌরেশের পাকস্থলীর মধ্যে যখন হাইড্রোসায়নিক অ্যাসিড বিষ পাওয়া গিয়েছে—সে বিষ অন্য কিছু থেকে আসেনি, নিশ্চয়ই যে গ্লাসের জল পান করার সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়েছিল সেই গ্লাসের জলের মধ্যেই ছিল এবং তাই যদি মনে হয়ে থাকে তো সে বিষ আমরাই কেউ তাকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি।

অজিতা—অজিতা! হিরণ্ময় ও অনিল একসঙ্গে যেন চিৎকার করে ওঠে।

আমাকে কথাটা শেষ করতে দাও। তোমরা জান অত্যন্ত বস্তুবাদী লোক আমি, কঠিন সত্য ঘটনাচক্রে যা আজ বীভৎস হয়ে আমাদের সকলের চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তাকে তো আমরা অস্বীকার করতে পারি না। না, না হিরণ্ময়, অনিল—সত্যকে আজ ভয় পেয়ে এড়িয়ে গেলে তো চলবে না বন্ধু। সৌরেশের মৃত্যুর জন্যে আমরাই—আমাদের মধ্যেই একজন-না-একজন কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই দায়ী।

কি তুমি বলছ অজিতা? আমরা! আমরা সৌরেশকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছি? অনিল আবার বলে ওঠে, উত্তেজনায় তার কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে

আসে।

হ্যাঁ, আমাদের মধ্যেই কেউ। আমরা—অর্থাৎ তুমি অনিল, হিরণ্ময়, আমি অজিতা, শিশির, কমলা, সুজিত, ভবানী, বিনয়, মালবিকা আর সৌরেশ—যারা সে-রাত্রে উপস্থিত ছিলাম। ভেবে দেখ সৌরেশ মারা গেছে এবং তীব্র হাইড্রোসায়ানিক বিষের ক্রিয়ায় তার মৃত্যু ঘটেছে—এবং বাইরের কোন লোক-জন যখন সেখানে উপস্থিত ছিল না তখন আমাদের এই ন'জনের মধ্যেই কেউ নিশ্চয় সৌরেশকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছে জলের সঙ্গে সে-রাত্রে।

অজিতার স্বেচ্ছাকৃত উক্তিটা যেন বজ্রকঠোর শোনাল।

সত্যিই তো। ভেবে দেখতে গেলে অজিতার এ অভিযোগ তো মিথ্যা নয়। ঘটনার পরিস্থিতি তো তাই দাঁড়াচ্ছে।

কিরীটী এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। এবারে সে মৃদুকণ্ঠে বলে, যুক্তির দিক দিয়ে আপনার উক্তিকে অস্বীকার করার উপায় নেই ডাঃ রায়। অবশ্যই সর্বাগ্রে ঐ চিন্তাটাই সকলের মনে আসবে। কিন্তু আপনি যে বলছেন একেবারে কোন তৃতীয় ব্যক্তিই উপস্থিত ছিল না সে-রাত্রে, তাও তো সত্য নয়। আপনারা ছাড়া অনিলবাবুর বাড়ির চাকর, ঠাকুর ইত্যাদি—

সে-কথাও যে আমি ভাবিনি কিরীটীবাবু তাও নয়। কিন্তু তারা হাইড্রো-সায়ানিক অ্যাসিড বিষ কোথায় পাবে? আর আমাদের একজনকে মারবার তাদের কিই বা স্বার্থ থাকতে পারে? তবে হ্যাঁ, এমন হতে পারে, তারা হয়ত কারও যন্ত্র হিসাবে এক্ষেত্রে কাজ করেছে—কিন্তু তাহলেও তো শেষ পর্যন্ত সেই একই কথাই গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

অজিতার তীক্ষ্ণ বিচার ও বিশ্লেষণ বুদ্ধি দেখে কিরীটী বিস্মিত না হয়ে পারে না।

প্রথম দর্শনেই অজিতার উপরে তার মনের মধ্যে অজ্ঞাতে এবং কতকটা অকারণেই যে বিরুদ্ধ ভাবটা জেগে উঠেছিল সেটা যেন আর এখন সে অনুভব করছে না।

বাহ্যিক রূপের অন্তরালে অজিতার মধ্যে এমন একটি মানুষ আছে যার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কারও পক্ষেই খুব অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য যে আকৃষ্ট হবে তার সেই আকৃষ্ট হবার দৃষ্টি থাকা একান্ত প্রয়োজন।

একটু আগেও তার মনে হয়েছিল একজন চিত্র-পরিচালক হয়ে ভবানী রায় কেমন করে অজিতাকে বিবাহ করলে—যার দেহের মধ্যে কোথাও একটি মেয়ে হিসাবে পুরুষের মনকে আকর্ষণ করতে পারে এমন কিছুই নেই! এখন মনে হচ্ছে, হয়ত অন্তরের নারী-অজিতাই ভবানী রায়কে মুগ্ধ করেছিল—বাইরের স্বভাবতই পুরুষোচিত অজিতা নয়। অথবা অন্তরে ভবানী রায় পুরুষ হলেও নারী প্রকৃতির, তাই এত সহজেই অজিতার পুরুষপ্রকৃতি তাকে আকর্ষণ করেছিল।

নারী ও পুরুষের ভিন্নমুখী প্রকৃতি এমনিভাবেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি

আকৃষ্ট হয়।

হঠাৎ আবার কিরীটী অজিতাকেই প্রশ্ন করে, আচ্ছা ডাঃ রায়, একমাত্র এক্ষেত্রে পোস্টমর্টেমে আপনাদের বন্ধুর পাকস্থলীতে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড পাওয়া গিয়েছে বলেই কি আপনার ধারণা হয়েছে যে আপনাদের মধ্যেই কেউ সৌরেশবাবুকে হত্যা করেছেন ঐ বিষ দিয়ে জলের সঙ্গে সে-রাত্রে—না এরকম ভাববার অন্য কোন কারণও আছে?

কিরীটীর সোজাসুজি প্রশ্নে অজিতা হঠাৎ যেন কেমন হকচকিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই কোন জবাব দিতে পারে না।

আপনি আমার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পেরেছেন তো ডাঃ রায়?

অ্যাঁ! হ্যাঁ। একটু ইতস্তত করে অজিতা বলে, না, তেমন বিশেষ কিছু কারণ আর নেই অবিশ্যি। কেবল ঘটনা পরিস্থিতি থেকে আমার মনে হয়—

আপনি হয়ত জানেন না, একটা হত্যার ব্যাপারে কেবলমাত্র ঘটনার পরিস্থিতিই তো সব কিছু নয় ডাঃ রায়! অনেক কিছু আমাদের এক্ষেত্রে ভাবতে হবে। কোন স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছবার আগে—যদি অবিশ্যি আপনার অভিমতটাই এ ব্যাপারে circumstantial truth বা axiom বলে ধরে নিই, তাহলেও আমাদের ভেবে দেখতে হবে আপনাদের ন'জনের মধ্যে কার বেশী সুবিধা বা সুযোগ ছিল সৌরেশবাবুর হত্যার ব্যাপারে এবং কার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে ও কার পক্ষে হত্যা করাটা বেশী সম্ভব ছিল—অর্থাৎ chance, probability ও motive! কিন্তু এ সব কিছুরও আগে একটা জিজ্ঞাস্য আমার আছে আপনাদের প্রত্যেককে—সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে কি আপনারা সবাই প্রস্তুত? সত্যকে জীবনে ভালবাসি ও চাই বললেই চলে না ডাঃ রায়, তাকে গ্রহণ করবার মত মনে সাহস থাকা প্রয়োজন। সত্য এক-একসময় এমন কঠোর ও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আমাদের সামনে এসে দেখা দেয়—যখন তাকে গ্রহণ করতে হলে যে নার্ভ থাকার প্রয়োজন, তা অনেকেরই সেই মুহূর্তে লোপ পায়। মানুষ বড় দুর্বল ডাঃ রায়—বড় দুর্বল!

অন্যের কথা আমি বলতে পারি না কিরীটীবাবু, তবে আপনি জানবেন আমি আর আমার স্বামী দুজনেই আমরা স্থির করেছি এই কুৎসিত লজ্জার ব্যাপারের একটা শেষ মীমাংসা আমাদের করতেই হবে—অন্য কেউ আমাদের সাহায্য করুক বা নাই করুক।

আপনাদের সৎসাহসের প্রশংসা না করে আমি পারছি না ডাঃ রায়। তবু একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, একলা আপনার ও আপনার স্বামীর এই ধরনের মনোবৃত্তি হলেই তো চলবে না—আর আর যাঁরা সেদিন এখানে উপস্থিত ছিলেন প্রত্যেকেরই কাছে ঐ সৎসাহসটুকু এক্ষেত্রে আমি আশা করি। এবং শুধুমাত্র আমার চেষ্টাতেই হবে না, আপনাদের প্রত্যেককেই এ ব্যাপারে আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে হবে।

তাই হবে কিরীটীবাবু, আমরা প্রতিজ্ঞা করছি আমরা সকলেই আপনাকে

সাহায্য করব। দৃঢ়কণ্ঠে ডাঃ অজিতা রায় বললে।

বেশ, তাহলে আপনাদের সকলের সঙ্গেই আমার একবার কথা হওয়া সর্বপ্রথম দরকার--মানে আপনারা যে যে সেদিন অনিলবাবুর জন্মতিথি উৎসবে উপস্থিত ছিলেন, প্রত্যেকেই আমার বাড়িতে একটা খোলাখুলি আলোচনার জন্যে আসেন তো বড় খুশি হব। নিশ্চয়ই এতে কারও আপত্তি হবে না!

নিশ্চয়ই না। আমরা সকলেই যাব। কখন যেতে হবে বলুন? অজিতা প্রশ্ন করে।

আগে আমি আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একবার আলাদা করে কথা বলি, তারপর যে কোন একদিন স্থির করা যাবে।

বেশ।

তাহলে আজ আমি এবারে বিদায় নেবো হিরণ্ময়। কাল সন্ধ্যার পর আমার বাড়িতেই আবার দেখা হবে—চলি।

কিরীটী প্রত্যেককে নমস্কার জানিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

কিরীটী চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ কারও মুখে কোন কথা নেই। সমস্ত ঘরের আবহাওয়াটাই যেন হঠাৎ বিশ্রীরকম বিষিয়ে উঠেছে।

ননসেন্স ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে যে দীর্ঘকালের একটা প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, হঠাৎ যেন তার মধ্যে কোথায় একটা চিড় খেয়েছে। আনন্দ-উৎসব-মুখরিত আলোকিত কক্ষের সমস্ত বাতিগুলো আচমকা কে যেন একটা ফুৎকার দিয়ে নিবিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

আলোকহীন কক্ষের মধ্যে হঠাৎ যেন নেমে এসেছে শ্বাসরোধকারী একটা অচ্ছেদ্য নির্মম অন্ধকার। বরফের মত ঠাণ্ডা জমাট। আবছা তরল অন্ধকারের মধ্যে কারা যেন নিঃশব্দে চলাফেরা করছে ছায়ার মত। মাঝে মাঝে তাদের চাপা দীর্ঘশ্বাস অন্ধকারে মর্মরিত হয়ে উঠছে।

অন্ধকারে অনেকগুলো চোখ যেন তীব্র দৃষ্টি দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে লেহন করছে। অস্বস্তিকর—উৎকণ্ঠায় ভরা।

মেঝের উপরে অন্ধকারে পড়ে আছে একটা ঠাণ্ডা প্রাণহীন প্রসারিত বিষ-জর্জরিত দেহ যেন।

সেই দেহকে লক্ষ্য করে অদৃশ্য সংকেত যেন চাপা গর্জনে বলছে, তোমরা—হ্যাঁ, তোমরাই ওকে হত্যা করেছ!

কিন্তু কেন—কেন—কেন বন্ধু হয়ে বন্ধুকে হত্যা করলে?

সহসা আসন ছেড়ে অনিল চৌধুরী উঠে দাঁড়ায়, না না—এ অসহ্য, সহ্য করতে পারছি না আর। আজ দু'দিন থেকে সর্বক্ষণ সৌরেশের মৃত্যু-বিভীষিকা যেন আমাকে তাড়া করে ফিরছে। এ বাড়িতে থাকলে আমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাব—পাগল হয়ে যাব।

অস্থির চঞ্চল পদে অনিল চৌধুরী ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে।

অজিতা কথা বলে, সত্যি হিরণ্ময়, এ যেন আমি ভাবতেই পারছি না। শেষ পর্যন্ত আমরাই কিনা আমাদের একজন প্রিয় বন্ধুকে হত্যা করলাম!

আর্তস্বরে অনিল চৌধুরী চিৎকার করে ওঠে, থাম থাম তোমরা। ও কথা থাক—ও কথা থাক—

কথাটা বলতে বলতে অনিল যেন একেবারে ভেঙে পড়ে। তারপর হঠাৎ পাগলের মতই যেন আবার বলে ওঠে, হ্যাঁ অজিতা হ্যাঁ, মনে হচ্ছে হয়ত এখন তোমার কথাই ঠিক- আমরাই ন'জনের মধ্যে একজন কেউ তাকে হত্যা করেছি। আমি—আমিই হয়ত তাকে হত্যা করেছি! হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমিই সৌরেশকে হত্যা করেছি। আমাকে—আমাকেও তোমরা বিষ দাও, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি বিষ খেয়েই করব।

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে হিরণ্ময় অনিলের একখানা হাত চেপে ধরে, অনিল—অনিল, কি পাগলের মত বকছ।

অজিতাও উঠে এল, চল শোবে চল—তোমার এখন কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন।

না—না, আমি ঘুমোতে পারব না—আমি ঘুমোতে পারব না। চোখ বুজলেই সৌরেশের যন্ত্রণা-কাতর বিষ-জর্জরিত বীভৎস সেই মুখখানা দেখি। ঘুমোব না—আমি ঘুমোব না।

অসহায়ভাবে হিরণ্ময় অজিতার মুখের দিকে তাকায়।

শোন অনিল, এখন কিছুক্ষণ তোমার ঘুমিয়ে থাকা একান্ত প্রয়োজন। আমি একটা ঘুমের ওষুধ তোমাকে খাইয়ে দিয়ে যাচ্ছি, কয়েক ঘণ্টা ঘুমোলেই মন ও দেহ তোমার সুস্থির হবে। স্নেহসিক্ত স্বরে অজিতা বলে।

শেষ পর্যন্ত ঘুমের ওষুধ খাইয়ে—অনিল ঘুমিয়ে পড়লে হিরণ্ময় ও অজিতা অনিলের বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

চার

পরের দিন সকালে হিরণ্ময় ঘুম থেকে উঠে প্রভাতী চা-পান করছে। গেটের সামনে নিচে রাস্তায় একটা ট্যাক্সি এসে থামল।

এত ভোরে ট্যাক্সি নিয়ে আবার কে এল!

চেয়ার ছেড়ে জানলার কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই হিরণ্ময় দেখলে, সৌমিত্র! ট্যাক্সি-চালককে ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছে।

সৌমিত্র—সৌমিত্র এল!

তবে কি ও এ দুঃসংবাদ শুনেছে? পরের দিনই সংবাদপত্রে যখন প্রকাশিত হয়েছে, তখন পড়েছে নিশ্চয়ই এবং সেই কারণেই হয়ত লক্ষ্ণৌ থেকে ছুটে এসেছে।

সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

চিরদিন চঞ্চল প্রকৃতির সৌমিত্র। দুটো তিনটে সিঁড়ি একসঙ্গে সে টপকে টপকে ওঠে।

আস্তে চলা যেন ওর স্বভাববিরুদ্ধ।

আরও আশ্চর্য, ওর স্বভাববিরুদ্ধ গাম্ভীর্য! অত্যন্ত কম কথা বলে।

হাতে একটা অ্যাটাচি কেস, সৌমিত্র এসে কক্ষে প্রবেশ করল। অ্যাটাচি কেসটা ঘরের মেঝেতে নামিয়ে রেখে অদূরে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান হিরণ্ময়ের দিকে তাকিয়ে প্রথম প্রশ্ন করলে, সত্যি—সত্যি সৌরেশ মারা গেছে হিরণ্ময়?

হিরণ্ময় সৌমিত্রের কথার কোন জবাব দিতে পারে না।

জবাব দেবার মত কিই বা আছে!

সৌমিত্র এগিয়ে গিয়ে একটা খালি চেয়ারে উপবেশন করল।—তাহলে সব সত্যি! কিন্তু হঠাৎ জল খেতে খেতে মারা গেল—সৌরেশের তো কোন অসুখ-বিসুখ ছিল না! দিন পনের আগেও তো তার একখানা চিঠি পেয়েছি।

পানীয় জলের মধ্যে বিষ ছিল। মৃদুকণ্ঠে হিরণ্ময় এতক্ষণে কথা বলে।

সৌমিত্র যেন ভূত দেখার মত চমকে ওঠে হিরণ্ময়ের কথায়। বিস্ময়-বিস্ফারিত কণ্ঠে বলে ওঠে, বিষ!

হ্যাঁ, বিষ। হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষ।

সে কি!

পোস্টমর্টেম করে সৌরেশের পাকস্থলীর অজীর্ণ খাদ্যবস্তুর সঙ্গে তাই পাওয়া গিয়েছে।

হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষ! এসব কি বলছ তুমি হিরণ্ময়?

আমরাও কম স্তম্ভিত হইনি সৌমিত্র। কি করে যে পানীয় জলের মধ্যে তার হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষ মিশ্রিত হল এখনও আমাদের সকলেরই তা বোধগম্যের বাইরে। এবং তার চাইতেও আশ্চর্য যে, সেদিনকার উৎসবে আমরা নন্‌সেন্স ক্লাবের সভ্যরা ছাড়া বাইরের কোন তৃতীয় ব্যক্তিই উপস্থিত ছিল না। এ অবস্থায় আর কে সৌরেশের জলের গ্লাসে আমাদের মধ্যে কেউ একজন ছাড়া বিষ মেশাতে পারে বল!

অ্যাঁ? বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যায় সৌমিত্র।

হ্যাঁ, আমাদের মধ্যেই কেউ তাকে বিষ খাইয়ে মেরেছি।

বল কি!

তাছাড়া আর কে হতে পারে? বাড়ির মধ্যে আমরাই দশজন ছিলাম। একজন বিষ খেয়ে মারা গেল—সে কিছু আর ইচ্ছে করে নিজের জলের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে আত্মহত্যা করেনি।

নিশ্চয়ই না; আর সে আত্মহত্যাই বা করতে যাবে কেন? কোন কারণ তো নেই।

কিন্তু তাই যদি না হয়—আমরাই বা কেউ তাকে বিষ দিয়ে হত্যা করতে

যাব কেন ? তার সঙ্গে তো আমাদের কারও কোন শত্রুতাই ছিল না ? বরং আমাদের সকলেরই প্রিয় বন্ধুই ছিল সে।

সৌমিত্র হিরণ্ময়ের প্রশ্নের কোন জবাবই দিতে পারে না।

হিরণ্ময় একটু থেমে আবার বলতে শুরু করে, তবু—তবু আমরাই কেউ না-কেউ তাকে হত্যা করেছি। বিশ্বাসের অযোগ্য—তবু বিশ্বাস করতে হবে, কারণ এতে তো কোন ভুল নেই যে আমাদের ন'জনের বাইরে আর কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল না। তাহলে আর কে তাকে বিষ দেবে! আমরাই আমাদের একজন প্রিয় বন্ধুকে জলের সঙ্গে তীব্র ভয়ংকর বিষ দিয়ে হত্যা করেছি। আমি, শিশির, অনিল, ভবানী, অজিতা, কমলা, মালবিকা, সুজিত, বিনয়—এই ন'জনের মধ্যে একজনই হত্যাকারী। কিন্তু কে—আমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করলাম ? কে—কে ?

সৌমিত্র অবাক হয়ে চেয়ে থাকে হিরণ্ময়ের মুখের দিকে।

* * *

নির্দিষ্ট সান্ধ্য-বৈঠকের আগে কিরীটী প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে দেখা করে কথা বলবে আগে থেকেই স্থির করেছিল।

তাই সর্বাগ্রে পরের দিন সে সকালেই গেল আবার অনিল চৌধুরীর ওখানে।

অনিল চৌধুরী বাড়িতেই ছিলেন, কিরীটীকে নিজের বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন!

বসুন কিরীটীবাবু!

অনিল চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে কিরীটী বলে, একবার আমি এই বাড়িটা ভাল করে ঘুরে দেখতে চাই। আর সেই ঘরটাও দেখতে চাই যে ঘরে সে রাত্রে দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল।

অনিল কি রকম বোবাদৃষ্টিতে যেন কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

চলুন!

দুজনে উঠে দাঁড়ায়।

বাড়িটা দোতলা। দোতলার ওপরে খানপাঁচেক ঘর। প্রত্যেকটি ঘরই বেশ প্রশস্ত।

শেষ প্রান্তে দক্ষিণের ঘরটায় বসে ওদের গান-বাজনা হয়েছিল এবং খাবার আয়োজন হয়েছিল তার পরের ঘরটিতে—অর্থাৎ অনিল চৌধুরীর শয়নকক্ষটি বাদ দিয়ে তৃতীয় ঘরে। চতুর্থ ঘরটি হচ্ছে স্টোর-রুম। তারপরেই দোতলা-তেই রান্নাঘর! সামনের দিকে ও পিছনের দিকে টানা বারান্দা।

কিরীটী একটা কাগজে পেনসিল দিয়ে দোতলার একটা স্কেচ এঁকে কাগজটা অনিল চৌধুরীর দিকে প্রসারিত করে বলে, এই তো আপনার দোতলার মোটামুটি নক্সা মিঃ চৌধুরী ?

অনিল সম্মুখে প্রসারিত নক্সাটার দিকে তাকালে। তারপর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে।

১নং ঘরের মধ্যে বসে সেদিন আপনারা সকলে গান-বাজনা করেছেন, কিরীটী বলতে থাকে, তারপর রাত্রি দশটার পর আপনারা সকলে বারান্দা দিয়ে ২নং ঘরে যান কারণ সেখানেই সে-রাত্রে খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছিল, কেমন তো ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা এবারে বলুন, সে রাত্রে উৎসবে যোগ দিতে আপনারা এখানে কখন কে পৌঁছেছিলেন। অবিশ্য মোটামুটি একটা প্রত্যেকের arrival time দিলেও চলবে। আপনি যখন হোস্ট-ইন-চীফ্, নিশ্চয়ই আশা করতে পারি আপনার মোটামুটি মনে আছে—কখন কে এসে আপনার বন্ধুদের মধ্যে পৌঁছেছিলেন সেদিন !

তা মনে আছে।

বেশ তবে বলুন, আমি নোট করে নিই। কিরীটী একটা নোটবই ও কলমটা বের করে।

সকলের আগে আসে সৌরেশ—ঠিক সন্ধ্যা হয়েছে তখন, তার মিনিট কুড়ি পরে এল হিরণ্ময় ও শিশির, তার কিছুক্ষণ—এই আধ ঘণ্টাটাক হবে পরে এল কমলা ও মালবিকা, রাত বোধ করি গোটা আটেকের সময় আসে ভবানী ও তার স্ত্রী অজিতা, সবার শেষে সুজিত।

আচ্ছা খেতে যাবার আগে পর্যন্ত আপনারা কি ঐ ১নং ঘরেই ছিলেন ? কথাটা ভেবে চিন্তা করে বলবেন। সে-রাত্রে আপনাদের প্রত্যেকের movements —অর্থাৎ গতিবিধি সম্পর্কে যতটা সম্ভব সঠিক খবর চাই আমি।

দেখুন কিরীটীবাবু, আপনার শেষ প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সত্যিই কঠিন। কারণ উৎসবের বাড়ি, সকলেই গান-বাজনা-আনন্দ করছে, তার মধ্যে কখন কে কোথায় ছিল সেটা মনে থাকাও যেমন সম্ভব নয়, লক্ষ্য করাও তেমনি সম্ভবপর নয়। মোটামুটি বলতে পারি—সকলেই দু-একবার ঘর থেকে বোধ হয় তো বের হয়েছে।

আচ্ছা, অন্যের কথা বলবার আগে আপনার নিজের কথা বলুন। আপনি ক'বার ঘর থেকে বাইরে গিয়েছেন ? কোথায় গিয়েছেন এবং কেন গিয়েছেন ? জিনিসটা শ্রুতিকটু হলেও বুঝতে পারছেন বোধ হয়, আপনাদের বন্ধুর রহস্যজনক হত্যার ব্যাপারে একটা মীমাংসায় পৌঁছতে হলে আমাকে এ সব কিছুই ভেবে দেখতে হবে !

আমি চার-পাঁচবার ঘর থেকে বের হয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঠাকুরের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে এসেছি রান্নার কতদূর হল—

এক রান্নাঘর ছাড়া আর আপনি অন্য কোথাও যাননি ?

না।

রান্নাঘরে যাওয়ার সময় বারান্দা দিয়েই প্রত্যেকবার গিয়েছেন, না ঘরের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন ?

ঠিক মনে নেই।

আচ্ছা, খাবার ঘরে আসন পেতে গ্লাসে জল দিয়েছিল কে সে-রাত্রে, মনে আছে ?

হ্যাঁ। আমার চাকর নন্দুর মুখে শুনেছি বঙ্কিম বলে আমার এখানে আর একজন চাকর আছে সে-ই দিয়েছিল।

বঙ্কিমকে যদি অনুগ্রহ করে একবার ডাকেন। তাকে আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

অনিল চৌধুরী তখুনি বঙ্কিমকে ডেকে পাঠাল। একটু পরেই বঙ্কিম ঘরে এসে ঢুকল, বাবু আমাকে ডেকেছেন ?

হ্যাঁ। এই বাবুটি তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চান বঙ্কিম। ইনি যা জানতে চান বল।

কিরীটী বঙ্কিমের দিকে তাকাল। লোকটার বয়স বছর পঁচিশেক হবে। রোগা লিকলিকে পাকানো শুকনো চেহারা। মাথায় ঘন চুল তেল-চক্‌চকে এবং বেশ পরিপাটি করে আঁচড়ানো। পরনে পরিষ্কার মোটা ধুতি ও হাত-কাটা পিরান গায়ে।

ভোঁতা নাক, কুৎকুতে গোল-গোল চক্ষু, পুরু এবং কালো ওষ্ঠ। লোকটা প্রচুর তাম্রকুট সেবন করে বুঝতে কষ্ট হয় না। ঠোঁটের ওপরে বেশ পাকানো একজোড়া পুরু গোঁফ।

তোমার নাম বঙ্কিম ?

আজ্ঞে।

কি জাত তোমরা ?

আজ্ঞে সদগোপ।

বাড়ি কোথায় ?

আজ্ঞে মেদিনীপুর জিলা, পাঁশকুড়া থানা।

কতদিন এখানে কাজ করছ—এই বাবুর বাড়িতে ?

তা প্রায় বছরখানেক হল।

আচ্ছা বঙ্কিম, যে-রাত্রে তোমার বাবুর একজন বন্ধু হঠাৎ জল খেয়ে মারা যান সে-রাত্রের কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে ?

আজ্ঞে।

ওঁদের সকলের সে-ঘরে খেতে যাবার কতক্ষণ আগে তুমি গ্লাসে জল দিয়ে-ছিলে মনে আছে তোমার ?

আজ্ঞে—প্রায় মিনিট পনের-বিশ আগে হবে।

আচ্ছা, গ্লাসে জল ঢেলে দিয়ে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

সেই ঘরের মধ্যেই ছিলাম প্রায় ওনাদের আসা পর্যন্ত, তবে মনে আছে

মিনিট কয়েকের জন্যে রান্নাঘর থেকে নুনের পাত্র আর কাটা লেবুগুলো যে প্লেটে ছিল সেই প্লেটটা আনতে গিয়েছিলাম।

আচ্ছা বঙ্কিম, খাওয়ার জল এ বাড়িতে কিসে থাকে এবং কোথায় কোন্ ঘরে থাকে?

ঐ খাবার ঘরেই একটা ট্যাঙ্ক মত আছে, তাব মধ্যেই জল তোলা থাকে।

জলের গ্লাসগুলো জল ভরবার আগে কোথায় ছিল?

স্টোর ঘরে—একটা দেওয়াল আলমারিতে তোলা ছিল। সন্ধ্যার কিছু পরে সেগুলো আলমারি থেকে বের করে ধুয়ে পরিষ্কার করে স্টোর-ঘরেই এক-পাশে টেবিলের উপরে সব রেখে দিয়েছিলাম।

আচ্ছা স্টোর-ঘরটা সাধারণতঃ তালা দেওয়া থাকে, না খোলাই থাকে?

আজ্ঞে অন্য সময় তো তালা দেওয়াই থাকে, তবে সে-রাত্রে সন্ধ্যার পর থেকে খোলাই ছিল।

আর একটা কথা বঙ্কিম—খাবার ঘর, স্টোর-ঘর বা রান্নাঘরের দিকে বা ওই দিককার বারান্দায় বাবুদের বা দিদিমণিদের সে-রাত্রে খেতে বসবার আগে কাউকে যেতে দেখেছিলে কি?

না। তবে—

বল?

একবার যেন মনে পড়ে, কমলা দিদিমণি রান্নাঘরের সামনে গিয়ে আমার কাছে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল চেয়েছিলেন।

তারপর?

আমি মাংসের কিমাটা ঠাকুরকে তৈরি করতে সাহায্য করছিলাম, তাঁকে তাই বলি—দিদিমণি, আমার হাত জোড়া, স্টোর-ঘরে রেফ্রিজের মধ্যে ঠাণ্ডা জল আছে, পাশেই গ্লাস আছে, জল নিজ হাতে নিয়ে খেতে। দিদিমণি বললেন, তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না, তুমি কাজ কর, জল আমিই নিজে নিয়ে খাচ্ছি। আর একবার শিশিরবাবু এসেছিলেন—মনে পড়ছে এখন, রান্নাঘরে ঠাকুরকে রান্নার কথা জিজ্ঞাসা করতে।

আচ্ছা, তুমি যেতে পার বঙ্কিম।

অনিল চৌধুরীর ওখান থেকে বের হয়ে অনিল চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়েই কিরীটী অতঃপর গেল সুজিত করের ওখানে।

* * *

সুজিত কর।

ঔপন্যাসিক। অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে দ্যুতিমান মধ্যমণির মত বিরাজ করছেন তরুণ ঔপন্যাসিক সুজিত কর বর্তমানে। অবিবাহিত তরুণ, সংসারে বিশেষ কোন ঝামেলা নেই—এক বিধবা মা ও ছোট একটি ভাই।

ইতিমধ্যেই সাহিত্য-আসরে অর্থ সম্মান ও প্রতিপত্তি বেশ জমে উঠেছে

সুজিত করের।

কাঁকুলিয়া রোডে ছোট বাংলো প্যাটার্নের একতলা নিজস্ব বাড়িখানি আশেপাশের প্রতিবেশীদের যথেষ্ট ঈর্ষার উদ্রেক করে।

বেঁটেখাটো মানুষটি, তীক্ষ্ন নাসা, টানা-টানা মেয়েলী ধরনের চক্ষু; পাতলা ওষ্ঠ কিন্তু দৃঢ়তার পরিচয় দেয়; গায়ের বর্ণ ঈষৎ মাজা। সমস্ত চেহারার মধ্যে একটা সুপরিচ্ছন্ন ভব্যতা যেন সুস্পষ্ট।

প্রচুর কথা বলে এবং প্রচুর হাসে লোকটা কথায় কথায়।

এক কথায় আমুদে, আলাপী ও প্রাণপ্রাচুর্যে যেন ভরপুর।

পুরোপুরি সাহিত্যজীবন শুরু করার পূর্বে স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখে জীবিকা অর্জন করত। এখন অবিশ্যি উপন্যাস রচনাকেই একমাত্র জীবিকা-রূপে গ্রহণ করেছে, কারণ তা থেকে প্রচুর অর্থাগম হচ্ছে নিয়মিতভাবে।

বেলা প্রায় তখন বারোটা বেজে গিয়েছে, সুজিত তার নিজের লেখবার ঘরে বসে ঐদিন বেলা তিনটেয় তার যে উপন্যাসটির নাট্যরূপের প্রথম অভিনয় জাতীয় রঙ্গমঞ্চে হবে সেই সর্বজনবিদিত বিখ্যাত উপন্যাস 'জনতা'র পাতাগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিল। ভৃত্য এসে জানাল, অনিলবাবু ও অন্য একজন ভদ্রলোক নিচের ঘরে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন।

অনিল এসেছে! হঠাৎ এ সময়? সঙ্গে কে আবার একজন অপরিচিত ভদ্র-লোক! তাড়াতাড়ি সুজিত নিচে নেমে এল।

ঘরে প্রবেশ করতেই অনিল বলে ওঠে, এই যে সুজিত, ইনি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন—কিরীটী রায়।

নামটা শুনেই যেন সুজিত থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

কিরীটী রায়।

নামটা একেবারেই অপরিচিত নয় সুজিতের কাছে।

কিরীটী সুজিত করের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে নমস্কার জানায়, অসময়ে আপনাকে এসে বিরক্ত করবার জন্যে আমি দুঃখিত ও লজ্জিত সুজিত-বাবু কিন্তু—

কিরীটীর কথা শেষ হল না—অনিলই বাধা দিয়ে তার বক্তব্যটুকু শেষ করে দেয়, তোমাকে জানানো হয়নি সুজিত, সৌরেশের হত্যার ব্যাপারে একটা মীমাংসা করবার জন্যে আমি, হিরণ্ময়, অজিতা সকলে পরামর্শ করে কিরীটীবাবুর শরণাপন্ন হয়েছি।

অনিল চৌধুরীর দিকে কেমন যেন এক অসহায় বোবাদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সুজিত কর কথাটা শুনে। ব্যাপারটা যেন ঠিক এখনও সে হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারছে না।।

অনিল বলে, সৌরেশের সেদিন ওইভাবে আকস্মিক বিষে মৃত্যু আমাদের সকলের উপস্থিতিতে—ব্যাপারটা যে কত বড় লজ্জার ও দুঃখের তা তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে সুজিত। তাই এ ব্যাপারে একটা মীমাংসা হওয়া আমাদের

প্রত্যেকের দিক থেকেই উচিত আমরা সকলে মনে করছি। আজ সন্ধ্যার পরে তাই আমরা সকলে কিরীটীবাবুর ওখানে মিলিত হব স্থির করেছি, কারণ আমাদের সকলের সঙ্গে উনি একটা খোলাখুলি আলোচনা করতে চান।

বেশ তো। সুজিত অনিলের কথার জবাবে 'বেশ তো' বললে বটে—তবে কিন্তু তার কণ্ঠের সুরে কোথাও যেন উৎসাহের তিলমাত্রও প্রকাশ পেল না।

একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন একটা স্বীকারোক্তি।

সুজিতের কণ্ঠের নিরুৎসুক সুরটা কিন্তু কিরীটীর তীক্ষ্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়কে ফাঁকি দিতে পারে না।

আপনি বুঝতেই পারছেন সুজিতবাবু, আপনাদের সকলের সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে এই ব্যাপারে কোন একটা মীমাংসা করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। কিরীটী বলে।

কিন্তু এ ব্যাপারে কিভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি বলুন তো কিরীটীবাবু? পূর্বের মতই নিরুৎসুক কণ্ঠে সুজিত এতক্ষণে কথাটা বলে।

সাহায্য বলতে অবশ্য এক্ষেত্রে আপনারা প্রত্যেকে সে-রাত্রের ঘটনা যিনি যতটুকু জানেন সেইটুকুই আমি অকপটে আপনাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আলাদা আলাদা ভাবে প্রথমে শুনতে চাই, তারপর সকলে মিলে একটা স্পষ্টাস্পষ্টি আলোচনা করে আমরা ভেবে দেখব—কি ভাবে অগ্রসর হলে আমরা সেদিনকার ব্যাপারের একটা মীমাংসায় পৌঁছাতে পারি।

আপনার বক্তব্য ঠিক এখনও আমি বুঝে উঠতে পারছি না কিরীটীবাবু।

আমার কথার মধ্যে তো তেমন দুর্বোধ্য বা অস্পষ্ট কিছুই নেই সুজিতবাবু। আমি জানতে চাইছিলাম—ধরুন, সেদিন উৎসবের রাত্রে মিঃ চৌধুরীর বাসায় পৌঁছবার পর আপনাদের সকলের মুভমেণ্টস সম্পর্কে অর্থাৎ আপনারা ঐ সময়টায় কে কোথায় ছিলেন বা কি করেছেন। তারপর একটু থেমে বলে, আপনিই বলুন না, আপনি কি কোন সময়—আহারে বসবার পূর্ব পর্যন্ত, যে ঘরে আপনারা সকলে গান-বাজনা করছিলেন সেই ঘর থেকে বাইরে অন্য কোথাও গিয়েছিলেন? যদি গিয়ে থাকেন কখন গিয়েছিলেন, কোথায়, কি জন্যে গিয়েছিলেন? বা আপনি অন্য কাউকে সে ঘর থেকে বের হতে দেখেছিলাম কিনা?

কিরীটীর কথা শুনে প্রথমে সুজিত কর কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইল, চোখেমুখে যেন তার সুস্পষ্ট চিন্তার বক্র একটা ছায়া নেমে এসেছে।

কিরীটী আর অনিল চৌধুরীর চারজোড়া চোখের তীক্ষ্ণ ব্যগ্র উৎসুক দৃষ্টি যে তারই মুখের উপরে স্থিরনিবদ্ধ, সুজিত ওদের দিকে না চাইলেও বুঝতে পারছিল।

ভাষাহীন সেই দৃষ্টি যেন তার সর্বাঙ্গে ছুঁচ বিঁধতে থাকে।

আপনার প্রশ্ন আমি বুঝতে পেরেছি মিঃ রায়। কিন্তু সে-রাত্রে গান-বাজনার মধ্যে এত গভীরভাবে আমি ডুবে ছিলাম যে, কে ঘর থেকে গেল বা

এল সেদিকে বড় একটা নজরই আমার দেবার ফুরসৎ হয়নি। আর আমার কথা আমি বলতে পারি, আমি এক সময়ের জন্যেও আহারের পূর্বে ছাড়া সে ঘর ছেড়ে কোথাও যাইনি।

হুঁ। আচ্ছা, এখন আর আপনাকে তাহলে বিরক্ত করব না মিঃ কর। অনুগ্রহ করে সন্ধ্যার পর যদি একবার আমার ওখানে আসেন—

নিশ্চয়ই যাব। আজ আমার 'জনতা'র প্রথম অভিনয়-রজনী। অবশ্য তিনটের শো'তে প্রথম অভিনয়—এরা যখন সকলেই যাবে, আমিও প্রথম অভিনয় হয়ে গেলেই যাব।

বেশ, তাহলে এবারে উঠব। নমস্কার। চলুন অনিলবাবু।

কিরীটীর আহ্বানে অনিল চৌধুরী উঠে দাঁড়ায়।

ওরা দরজা বরাবর যেতেই হঠাৎ, সুজিৎ অনিলকে প্রশ্ন করে, অনিল, থিয়েটারে আজ আসছ তো?

হ্যাঁ। ওরাও তো সকলেই যাবে।

কিরীটীবাবু, আপনিও আসুন না! সকলেই তো ওখানে আসছে। অভিনয় শেষে ওখান থেকেই না হয় সোজা সকলে আমরা আপনার ওখানে যাব। কিরীটীর দিকে চেয়ে সুজিত কর বলে।

তাই আসুন না কিরীটীবাবু? অনিল চৌধুরীও অনুরোধ জানায় কিরীটীকে।

কি ভেবে কিরীটী মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানায়, বেশ তো, যাব।

আমিই না হয় কিরীটীবাবুকে তুলে নিয়ে আসবার জন্যে গাড়ি পাঠাব। সুজিত বলে।

না-না, তার প্রয়োজন হবে না। আমার কয়েকটা কাজ আছে, আমি ঠিক সময়ের থিয়েটারে হাজির হব—ঠিক তিনটের শো'তে, আমিই না হয় মিঃ রায়কে তুলে নিয়ে যাব। অনিল বলে।

বেশ। সুজিত জবাব দেয়।

পাঁচ

সুজিত করের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় নেমে গাড়ির দিকে এগুতে এগুতে কিরীটী একসময় অনিল চৌধুরীকে বললে, আপনাকে আরও একটু কষ্ট দেব অনিলবাবু, আপনাকে নিয়ে এবারে আমরা মালবিকা দেবীর ওখানে একবারটি যেতে চাই। এখন নিশ্চয়ই তাঁকে তাঁর বাড়িতে পাওয়া যাবে?

তা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাঁর কি আর প্রয়োজন আছে কিরীটী-বাবু—সেও যখন আজ থিয়েটারে যাবে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই থিয়েটারে আমাদের সঙ্গে তার দেখা হচ্ছে? অনিল চৌধুরী বলে।

তিনিও থিয়েটারে আসছেন নাকি! সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় কিরীটী অনিলের দিকে কথাটা বলে।

হ্যাঁ। সুজিতের প্রথম বই—সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হচ্ছে, সব বন্ধুরাই সেখানে আজ প্রথম শো'তে উপস্থিত থাকবে।

ওঃ। তাহলে তো কথাই নেই। তবে সেই ভাল। আমিও প্রস্তুত থাকব তাহলে। আপনি কিন্তু আমাকে তুলে নিয়ে যেতে ভুলবেন না।

নিশ্চয়ই না।

এরপর দুজনে পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, কিরীটী তার গাড়িতে উঠে বসে আর অনিল চৌধুরী সামনেই একটা চলমান ট্যাক্সি পেয়ে সেই ট্যাক্সিতে উঠে বসল।

হীরা সিং গাড়ি চালাচ্ছিল। ফাগুনের শেষ। রৌদ্রের তাপ বেশ প্রখর। বেশ গ্রীষ্ম বোধ হয়।

রাস্তাঘাট অনেকটা নির্জন। মাঝে মাঝে চলমান ট্যাক্সি বা প্রাইভেট গাড়ির শব্দ ও এক-আধটা রিক্‌শার ঠুংঠুং আওয়াজ ক্লান্ত রৌদ্র-তপ্ত দ্বিপ্রহরের স্তব্ধতার বুকে যেন সাড়া জাগিয়ে চলেছে।

কিরীটীর চিন্তাধারা যেন মাকড়সার জাল বুনে চলেছে। সৌরেশের ব্যাপারটাই তার সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

সত্যিই অদ্ভুত পরিস্থিতি।

দশজন বন্ধু মিলিত হল—তাদের মধ্যে একজনের জন্মতিথি উৎসবকে কেন্দ্র করে, আনন্দ উচ্ছ্বাস কলহাসির মধ্যে আচমকা নেমে এল ভয়ঙ্কর মৃত্যুর হিমস্পর্শ। একজন মৃত্যুর বিষে ঢলে পড়ল। স্তম্ভিত হতচকিত হল বাকি ন'জন।

এ যেন সেই ছোটবেলায় পড়া হাসিখুশির গল্প! হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময়, একটি কোথা হারিয়ে গেল রইলো বাকি নয়!

কবিতাটা একটু বদলে গিয়েছে এক্ষেত্রে এই যা।

কি হওয়া উচিত কবিতাটা?

হারাধনের দশটি সাথী উৎসবেতে রয়।
একটি তাদের বিষে ম'ল রইলো বাকি নয়।

আহারাদির পর থিয়েটারে যাবার জন্যে একপ্রকার প্রস্তুত হয়েই কিরীটী তার বসবার ঘরে এসে বসল। সময় আর বেশী নেই, প্রায় আড়াইটে বাজে, এখুনি হয়ত অনিল চৌধুরী গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হবে।

সত্যি। অল্পক্ষণের মধ্যেই বাইরে অনিল চৌধুরীর গাড়ির ইলেকট্রিক-হর্নের তীব্র আওয়াজ শোনা গেল। কিরীটী উঠে জানলার ধারে এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, সত্যি তার অনুমান ভুল হয়নি। অনিল চৌধুরীই গাড়ি নিয়ে এসেছে।

কিরীটী চিৎকার করে বললে, আসছি।

কিরীটী জুতোটা পায়ে দিয়ে নিচে নেমে এল। গাড়ির সামনে আসতেই অনিল চৌধুরী গাড়ির সামনের দরজাটা খুলে দেয়, সামনেই আসুন!

গাড়িতে ড্রাইভার নেই, অনিল চৌধুরী নিজেই ড্রাইভ করে এসেছে।

কিরীটী গাড়িতে উঠে বসে মৃদু হেসে বললে, আপনি খুব পাংচুয়াল।

অনিল ততক্ষণ গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে। গাড়িও চলতে শুরু করেছে।

অ্যাকসিলারেটারে পা টিপে গাড়ির স্পীড ওঠাতে ওঠাতে অনিল চৌধুরী বলে, আমাদের বাঙালীদের সময়ানুবর্তিতার বালাই নেই এ দুর্নাম আছে বটে, তাই আমাদের 'ননসেন্স ক্লাবে'র যাবতীয় সব কিছু ননসেন্সের মত হলেও সময়ানুবর্তিতা সম্পর্কে সকলেই আমরা অত্যন্ত মনোযোগী।

ননসেন্স ক্লাব! কিরীটী কথাটা বলে বিস্মিত ও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অনিল চৌধুরীর মুখের দিকে তাকায়।

আপনাকে ঐ ব্যাপারটি এখনও পর্যন্ত বলবার ফুরসৎ হয়নি কিরীটী-বাবু। আমরা দশজনে—মানে আমি, সৌরেশ, হিরণ্ময়, সৌমিত্র, ভবানী, সুজিত, কমলা, মালবিকা, অজিতা আর শিশির সকলে মিলে একটা ননসেন্স ক্লাব গঠন করেছি। প্রথমটায় অবশ্য আমার, হিরণ্ময়, সৌরেশ, সৌমিত্র ও শিশিরের চেষ্টাতেই ক্লাবটার পত্তন হয়, পরে বাকি ওরা একে একে এসে দল ভারী করে।

মানে আপনারা ঐ দশজন ছাড়া বাইরের আর কেউ ক্লাবের সভ্য বা সভ্যা ছিলেন না?

না। আমরাই কজন। একান্ত খেয়ালমাফিক অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে চলে ঐ ক্লাব। কোন নিয়মকানুন নেই, কোন বাঁধাধরা নেই। প্রত্যেকেই আমরা স্বাধীন—কেউ সেখানে আড্ডা দেয়, কেউ খেলে তাস, কেউ গান গায়, কেউ আঁকে ছবি, কেউ করে অভিনয়, কেউ দর্শনশাস্ত্র নিয়ে গলাবাজি করে, আবার কেউ নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। কাজেই নিজেরা ছাড়া বাইরের কেউ এলে যদি ঐ অবাধ স্বাধীনতা আমাদের নষ্ট হয় তাই মেম্বর বলতে আমরাই কজন।

Rather interesting!

হ্যাঁ, মতলবটা উদ্ভব হয়েছিল সৌরেশেরই মাথায় প্রথমে। কথাটা বলতে গিয়ে অনিল চৌধুরীর গলাটা যেন হঠাৎ কেঁপে ওঠে।

কোথায় আপনাদের ক্লাব অনিলবাবু?

লেক টেরেসে একটা ফ্ল্যাট-বাড়ির দুখানা ঘর নিয়ে আমাদের ক্লাব।

প্রখর মধ্যাহ্নের তপ্ত উষ্ণ হাওয়া সমস্ত গায়ের মধ্যে যেন জ্বালা ছড়িয়ে দিচ্ছে। কিরীটী লক্ষ্য করছিল গাড়ি চালানোর ব্যাপারে অনিল চৌধুরী অত্যন্ত স্টেডি, অনর্গল কথা বলে চললেও গাড়ির গতি ও স্টিয়ারিংয়ের উপরে তার সদা সজাগ দৃষ্টির এতটুকু কমতি নেই।

ক্রমে গাড়ি এসে শ্যামবাজার অঞ্চলে জাতীয় নাট্যমঞ্চের সামনে দাঁড়াল। রঙ্গালয়ের সামনে তখন তিলধারণেরও স্থান নেই বললে অত্যুক্তি হয় না।

প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক সুজিত করের বিখ্যাত উপন্যাস 'জনতা'র নাট্যরূপের প্রথম অভিনয় আজ বেলা তিনটেয়। দ্বিতীয় অভিনয় সন্ধ্যা সাড়ে

ছটায়।

শনিবার, দেড়টা-দুটোর মধ্যেই সমস্ত অফিস স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে—ট্রামে বাসে মানুষ যেন বাদুর ঝুলছে।

রঙ্গালয়ের পোর্টিকোর সামনে বড় রাস্তায় গাড়ির পর গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে আর যাত্রী নামিয়ে দিয়ে সরে গিয়ে অন্য গাড়িকে স্থান করে দিচ্ছে।

জাতীয় রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের মধ্যে অতি-আধুনিক সম্প্রদায়ের ভিড়ই সর্বদা বেশী হয়।

প্রথমতঃ সুজিত করের বিখ্যাত উপন্যাস 'জনতা'র নাট্যরূপ; দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘ-কাল অনুপস্থিতির পর বিখ্যাত প্রিয়দর্শন তরুণ অভিনেতা শিশির মল্লিক 'জনতা' নাটকের একটি প্রধান কূট ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। ভিড় তাই একটু অন্যান্য দিনের চাইতে বেশীই।

ইতিমধ্যেই নিচের ক্লাস থেকে শুরু করে ড্রেস-সার্কেল পর্যন্ত ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। লবিতে অগণিত নানা বয়সী, নানা মুখ, নানা বেশের ভিড়। সেন্টের উগ্র ও তীব্র গন্ধে ও মানুষের নিশ্বাসে লবির উত্তপ্ত আর্দ্র বাতাস সুবাসিত ও মন্থর।

কোনমতে ভিড় ঠেলে অনিল চৌধুরীর সঙ্গে লবির একধারে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই কম মেহনত হয় না ওদের।

হাউস ফুল।

হাউস ফুল—পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ বোর্ডটা লবির সামনে টাঙিয়ে দিয়ে গেল একজন কর্মচারী।

অনিল বোধ হয় সুজিতের খোঁজেই এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। সিঁড়িতে সুজিতকে দেখা গেল, তার সঙ্গে মালবিকা।

এই যে অনিল এসেছিস, তোদের অপেক্ষাই করছিলাম! আয়, ওপরে চলে আয়। আসুন কিরীটীবাবু।

অনিল সুজিতের আহ্বানে অগ্রসর হয়, কিরীটী তাকে অনুসরণ করে।

১নং বক্সে ওদের বসবার আয়োজন হয়েছে।

অভিনয় শুরু হতে তখনও মিনিট কুড়ি বাকি। ওরা এসে বক্সের মধ্যে ঢুকল। নিচে প্রেক্ষাগৃহ একেবারে গমগম করছে দর্শকজনের ভিড়ে।

কিরীটী সুজিত করের মুখের দিকে তাকাল। একটা তৃপ্তি ও আনন্দের উজ্জ্বল আভা সুজিত করের সমগ্র মুখখানা ব্যেপে যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সত্যি এ বড় কম তৃপ্তি নয়। নাট্যকারের জীবনে এই দিনটি—এই মুহূর্তটি বয়ে আনে অনাস্বাদিত এক আশা ও আকাঙ্ক্ষার তীব্র মাদকতা। স্বপ্নের—কল্পনার সৃষ্ট চরিত্র সজীব প্রাণবন্ত হয়ে হাজারো চক্ষের সামনে হাসবে, কথা কইবে, গান গাইবে। হয়ত ঘর গড়ে তুলবে, আবার ভাঙবে সেই ঘর। তীব্র হতাশা ও মর্মবেদনায় হয়ত মুষড়ে পড়বে, না হয় সাফল্যে ও গৌরবে বিজয়ী বীরের মত উচ্চশিরে তাকিয়ে থাকবে সকলের মুখের দিকে। অন্যের চোখের

অলক্ষ্যে তিল তিল করে সৌন্দর্য দিয়ে যে কল্পনার মানসী তিলোত্তমাকে গড়ে তুলেছে বিজয়িনী গরবিনী সেই প্রেম-প্রতিমা আমারই চোখের সামনে সজীব প্রাণবন্ত হয়ে এসে দাঁড়াবে !

এ যে কি অনুভূতি, কি বিরাট আনন্দ—ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না।

সুজিত করের মধ্যে নিশ্চয়ই এখন এই মুহূর্তটিতে এই কথাগুলোই তোলপাড় করছে। তার সমস্ত চিন্তাজালকে আচ্ছন্ন মোহগ্রস্ত করে রেখেছে।

অগণিত মানুষের অস্পষ্ট অবোধ্য একটা কলগুঞ্জন প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত কিছুকে যেন মর্মরিত করে তুলছে।

হঠাৎ হিরণ্ময়ের ডাকে কিরীটী ফিরে তাকায়, আসুন কিরীটীবাবু, এদের সকলের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই।

আমাকে সুজিতকে অনিলকে তো চেনেনই, তবু আর একবার বলি—ইনি হচ্ছেন আমাদের বন্ধু, আজকের উৎসবে প্রধান ও শ্রেষ্ঠা—

ও, ডাঃ অজিতা রায়ের সঙ্গেও আগেই তো আলাপ হয়েছে ! কিরীটী মৃদু হেসে বলে।

হ্যাঁ, আর উনি হচ্ছেন চিত্র-পরিচালক ভবানী রায়, ডাঃ অজিতার একান্ত বশংবদ স্বামী। আর এ হচ্ছে সৌমিত্র, আজই লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতায় চারদিনের ছুটিতে এসেছে—বিশেষ করে সুজিতের বইয়ের অভিনয়ের ব্যাপারে, ইউ. পি. গভর্নমেণ্টের অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট। এ হচ্ছে আমাদের আর একজন বান্ধবী মালবিকা রায়, সরকারের দৌলতে অনেকবার জেল-টেল খেটে এখন নার্শারি স্কুল গড়ে তাতেই সর্বদা ব্যস্ত। আর ওই যে—হিরণ্ময় বক্সের রেলিঙের দিকে তাকাল।

সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর দৃষ্টি ও হিরণ্ময়ের স্বর ও দৃষ্টিকে অনুসরণ করে সামনের দিকে ঘুরে স্থির হল। রেলিঙের উপরে ডান হাতখানা রেখে তার উপরে চিবুক ন্যস্ত করে একটি অপূর্ব সুন্দরী তরুণী, নিচের দিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে স্থির হয়ে বসে আছে।

বক্সের মধ্যে যে এতক্ষণে পরিচয়ের পালা চলছে সেদিকে তার বিন্দুমাত্রও খেয়াল নেই যেন।

প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে দিনের বেলা হলেও—জানলা-দরজার উপরে ঘন নীল পর্দা দেওয়া, উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাতিগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে বাইরের আলো এসে না ভিতরে প্রবেশ করে।

কিরীটীর দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ।

বাঁ দিককার মুখের সমস্ত অংশটুকু, চিবুক, গলা ও স্কন্ধ দেখা যাচ্ছে, মাথার পর্যাপ্ত ঢেউ খেলানো কালো চুল এলো খোঁপার আকারে পৃষ্ঠদেশে ভেঙে এলিয়ে পড়েছে।

কানের সোনার তেঁতুল পাতাটি বিস্রস্ত কুন্তলরাশির ঘন আড়াল থেকে যেন ঝিলমিল করছে। ওষ্ঠের খানিকটা দৃষ্টিগোচর হয়। কি অপূর্ব কমনীয়

ঢলঢল গঠন কপাল, কপোল, চিবুক ও কণ্ঠের! স্বর্ণকান্তি গায়ের বর্ণ। পরিধানে লাল রক্তের মত একখানা টক্‌টকে সিল্কের শাড়ি, হাতে ডায়মণ্ড-কাটা চারগাছি করে সোনার চুড়ি।

সব কিছু মিলিয়ে যেন অপূর্ব রূপলাবণ্যে ঢলঢল একটি রক্ত-কোকনদ।

কমলা! হিরণ্ময় মৃদুস্বরে ডাকে।

হিরণ্ময়ের ডাকে কমলা ফিরে তাকাল। পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, আমাকে ডাকছ?

হ্যাঁ। আলাপ করিয়ে দিই—ইনিই কিরীটীবাবু, আর ইনি আমাদের বান্ধবী কমলা ঘোষ।

নমস্কার। কমলার কন্ঠস্বরটিও অপূর্ব, সংগীতের মতই মিষ্টি যেন।

কিরীটীও প্রতিনমস্কার জানায়।

ক্রি-রি রি-রিং! প্রথম সংকেতধ্বনি জানিয়ে বেল বেজে ওঠে।

শো শুরু হবে এবার—তোমরা বস, আমি গ্রীনরুমে শিশিরের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

সুজিত সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল

কমলা কিরীটীর দিকে তাকিয়ে সেই সময় বলছিল, আপনার নামটার সঙ্গে কিন্তু ঢের আগে থাকতেই আমি পরিচিত মিঃ রায়, যদিও আপনাকে চাক্ষুষ এই প্রথম দেখবার সৌভাগ্য হল। আপনার অদ্ভুত শক্তি সম্পর্কে এতদিন ধরে যা শুনেছি, এখন মনে হচ্ছে নামের মধ্যেও যেন অপূর্ব একটা সামঞ্জস্য আছে আর আপনার চেহারার মধ্যে তো আছেই।

কিরীটী কমলার কথায় মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বলে, কমপ্লিমেণ্ট শুনতে অবিশ্যি সকলেরই ভাল লাগে মিস ঘোষ কিন্তু—

না—না, তা নয়। তারপর একটু থেমে বলে, অনেকে বলে—বিশেষ করে আমার দাদা, মানুষের চরিত্রের অনেক কিছুই নাকি তার মুখের চেহারায় ফুটে ওঠে। আচ্ছা, এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন?

তা করি বৈকি।

করেন?

হ্যাঁ।

কমলা মৃদু হাসল।

কমলার হাসিটিও যেন কিরীটীকে মুগ্ধ করে।

ক্রি-রি-রি-রিং! দ্বিতীয় বেল বেজে উঠল।

কমলার কথা শুনছিল বটে কিরীটী, কিন্তু মনে মনে ভাবছিল কমলা সম্পর্কে অন্য একটি কথা।

হিরণ্ময় বললে কমলার পরিচয় দিতে গিয়ে ওর নাম কমলা ঘোষ। কোন্ কমলা ঘোষ? ডাঃ অতুল্য ঘোষের সেই বিখ্যাত বিলাত-আমেরিকা প্রত্যাগত বোন কমলা ঘোষ নয় তো! বর্তমানে দেশের বামপন্থী পলিটিক্যাল গ্রুপের স্বনামধন্য

ব্যক্তি অতুল্য ঘোষ, পি.আর.এস. ডি.-এস. সি ডি. এল বিখ্যাত আইন-ব্যবসায়ীও।

ডাঃ অতুল্য ঘোষকে কিরীটী দু একবার সভায় বক্তৃতামঞ্চে দেখেছে বটে এবং মুখটাও চেনা, কিন্তু তার বোন কমলা ঘোষকে কোনদিনও দেখেনি।

দেখেনি বটে, তবে তার সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছে বহুবার। কিন্তু সে কমলা ঘোষ তো এত অল্প বয়সের হবে না। একে দেখে আজও চব্বিশের কোঠা পার হয়নি বলেই তো মনে হচ্ছে।

ক্রি-রি-রি-রিং! তৃতীয় বেল শোনা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত আলো কমতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে এক-সময় সমস্ত প্রেক্ষাগৃহটি অন্ধকার হয়ে গেল। ঐকতান বাদ্য শোনা যাচ্ছে। রঙ্গমঞ্চের ঘন নীল রঙের জরি বসানো সুদৃশ্য ভেলভেটের পর্দা সরসর করে দুদিকে উত্তোলিত হয়ে—নীলাভ আলোয় স্বপ্নালোকিত রঙ্গমঞ্চ পরিলক্ষিত হল দর্শকজনের দৃষ্টির সম্মুখে।

অভিনয় শুরু হল। এক দৃশ্যেই একটি অঙ্ক।

প্রথম অঙ্কেই নাটক পূর্ণভাবে জমে। অপূর্ব অভিনয় করছে এক শয়তানের দু-মুখী চরিত্রে শিশির মল্লিক।

দর্শকজন মুগ্ধ, নির্বাক। রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনছে ও দেখছে অভিনয়।

ক্রমে প্রথম অঙ্ক শেষ হলো। সুজিত এল বক্সে।

জিজ্ঞাসা করলে, অভিনয় কেমন হচ্ছে? নাটক কেমন লাগছে?

সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করলে।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য।

শিকারে এসেছে একদল বন্ধু। অগ্নিবাণও এসেছে তাদের সঙ্গে। অগ্নি-বাণের ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হয়েছে ওদের বন্ধু প্রখ্যাত তরুণ নট শিশির মল্লিক।

শিকারী দলের সঙ্গে এসেছে তাদের প্রিয় বান্ধবী অরূপা। অরূপার ভূমিকায় যে মেয়েটি অভিনয় করছে তারও অভিনয় অপূর্ব। নামকরা অভিনেত্রী সরমা করছে অরূপার চরিত্রে অভিনয়।

অরূপা বলছে, এই মাঠের মধ্যে এই সময় যদি এক কাপ চা পাওয়া যেত!

অগ্নিবাণ: চমৎকার হত। কিন্তু এখানে আসবার পূর্বে এ কথাটা মনে হয়নি কেন অরূপা।

অরূপা: মনে যখন হয়ইনি খেদ করে এখন আর লাভ কি! কিন্তু সত্যি বলছি অগ্নি, এ সময় যদি কেউ এক কাপ চা আমাকে পান করাতে পারত, বিধাতা পুরুষের মত অকৃপণভাবে তাকে বলতাম—হে সুধী, সন্তুষ্ট হয়েছি তব দাক্ষিণ্যে, লহ বর যাহা ইচ্ছা তব!

অগ্নিবাণ: সত্যি, তবে একটু অপেক্ষা কর।

বলে অগ্নিবাণ স্টেজের মধ্যে গিয়ে একটা ফ্লাস্ক ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে

এল, ফ্লাস্কের মুখটা খুলে গরম চা তার ভিতর থেকে ঢালতে ঢালতে মৃদু হেসে বললে, এনেছি অমৃত দেবী, কর পান।

অরূপা এগিয়ে আসে চায়ের কাপটা নিয়েঃ Simply charming! Simply charming you are, Agniban!

অগ্নিবাণ বাধা দেয়ঃ ক্ষণেক অপেক্ষা কর দেবী, তোমার পিপাসার চাইতে আমার নিজের পিপাসাও এই মুহূর্তে কম নয়—বলতে বলতে নিজে চায়ের বাটিতে যেমন চুমুক দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ টলে স্টেজের উপরে পড়ে গেল দড়াম করে অগ্নিবাণবেশী শিশির। এবং মাটিতে পড়ে শিশিরের সমগ্র শরীরটা দু-চারবার আক্ষেপ করে অস্পষ্ট একটা গোঁ গোঁ শব্দ করে স্থির হয়ে গেল।

ব্যাপারটা এমনি আকস্মিক ও অচিন্তনীয় যে প্রেক্ষাগৃহের দর্শকবৃন্দ তো দূরের কথা—সহ-অভিনেত্রী অরূপা-বেশী সরমাও যেন স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে যায়!

পরক্ষণেই স্থান-কাল-পাত্র ভুলে প্রাণের ভয়ে, জৈবিক নিয়মেই বোধ করি অরূপা-বেশী সরমা আর্ত চিৎকার করে ওঠে, কি—কি হল?

এবং বলতে বলতে ঝুঁকে পড়ে ভূপতিত, অসাড় শিশিরের দেহটার দিকে।

উইংস থেকে স্মারক বলে, কি—কি হল?

দর্শকজন প্রথমটায় বুঝতে পারেনি, ভেবেছিল ব্যাপারটা বুঝি অভিনয়—কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হল না কারো, যবনিকা হঠাৎ ঘড়ঘড় করে নেমে এল অতর্কিতে।

ছয়

অতর্কিতে মধ্যপথে যবনিকা পতনেও দর্শকদের মধ্যে সকলেই বুঝতে পারে না তক্ষুণি যে, ঠিক কি ব্যাপারটা ঘটল!

তারা অনেকেই ধারণা করলে হয়তো মূল অভিনয়ই চলেছে এবং এখানেই হয়তো যবনিকা নেমে আসবার কথা।

ওদিকে মঞ্চের উপরে যবনিকার ওধারে দু'পাশের উইংস থেকে ততক্ষণে অনেকেই ছুটে এসেছে, কি কি হল হঠাৎ শিশিরের?

সরমা পাগলের মতই ভূপতিত শিশিরের নাকে-মুখে হাত দিয়ে দেখছে তখন সত্যি তার কি হল! শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে কিনা!

বুকে হাত দিয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করে, হৃদ্‌যন্ত্র এখনও চলছে কিনা!

না—কোথায়ও প্রাণের কিছুমাত্র সাড়া নেই। সমস্ত দেহটা বেঁকে একেবারে শক্ত লোহার মত কঠিন হয়ে গিয়েছে। বন্ধ ওষ্ঠের দু'পাশ দিয়ে খানিকটা রক্ত মিশ্রিত কালো বর্ণের লালা গড়িয়ে নেমেছে। দুটি হাতই মুষ্টিবদ্ধ। চোখ দুটো ঠেলে বের হয়ে এসেছে। একটা অসহ্য যন্ত্রণার ভয়াবহ

সুস্পষ্ট চিহ্ন।

রঙ্গমঞ্চের ম্যানেজার ও মালিক সত্যহরিবাবু হন্তদন্ত হয়ে মঞ্চের উপরে ছুটে এলেন, কি—কি—ব্যাপার কি ?

এই যে সত্যহরিবাবু, দেখুন তো—দেখুন তো ! শিশিরবাবু বোধ হয় বেঁচে নেই—বাকী কথাগুলো যেন একটা বোবা কান্নায় জড়িয়ে যায় সরমার।

বেঁচে নেই ! বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যান সত্যহরিবাবু, মানে—কি—কি বলছ তোমরা !

দেখুন না, কিছুই বুঝতে পারছি না। অভিনয় করতে করতে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে মুখে দিতেই হঠাৎ সঙ্গে সঙ্গে কেমন ঘুরে পড়ে গেলেন। কোন-মতে সরমা বললে কথাগুলো।

কি সর্বনাশ ! নিচু হয়ে সত্যহরিবাবু ভূপতিত শিশিরের নিস্পন্দ দেহ-টার দিকে তাকালেন।

কিন্তু বুঝতে সত্যহরিবাবুর আদৌ কষ্ট হয় না যে, সত্যিই শিশিরের দেহে তখন আর প্রাণ নেই ! সত্যি সে মৃত !

বিমূঢ় হতবাক্ সত্যহরিবাবু কেমন যেন ফ্যালফ্যাল করে বোকার মতই চেয়ে থাকেন মৃত শিশিরের মুখের দিকে।

কেবলমাত্র এই অল্পবয়সে অভিনেতা হিসাবে শিশরের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বেড়েছিল বলেই যে সত্যহরিবাবু শিশিরকে ভালবাসতেন তা নয়, বৃদ্ধ সত্যহরিবাবু পুত্রাধিক স্নেহ করতেন শিশিরকে।

দীর্ঘকাল অভিনয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে লিপ্ত থেকে থিয়েটারের ব্যবসাটা সত্যহরিবাবুর অস্থি ও মজ্জার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল যেন। কেমন করে থিয়েটার চালাতে হয় তা তিনি অন্ততঃ ভালভাবেই জানতেন। তাঁর অমায়িক সস্নেহ ব্যবহারে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলেই তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত অন্তর থেকে।

সাধারণতঃ এইসব ব্যাপারে লিপ্ত থাকলে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষদের যে সব দোষ দেখা দেয়, তার কোনটাই সত্যহরিবাবুর ছিল না। মদ তিনি স্পর্শ করতেন না, অভিনেত্রীদের সম্পর্কে তাঁর তিলমাত্র আকর্ষণও ছিল না। আর নিয়মিত মাসের প্রথমেই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাহিনা কড়ায়গণ্ডায় চুকিয়ে দিতেন। মিষ্টিমধুর ব্যবহারে তাঁর শাসনের রজ্জুটা বেশ দৃঢ়ই ছিল—তাঁর থিয়েটারের কোথাও এতটুকু দুর্নীতির প্রশ্রয় ছিল না।

কিন্তু এ বিপদের মুখে তাঁকে তো নাভি হারালে চলবে না। মুহূর্তে সমস্ত পরিস্থিতিটা হৃদয়ঙ্গম করে যবনিকার এদিকে বিনীত নমস্কারে এসে দর্শকজনের সামনে দাঁড়ালেন, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, অকস্মাৎ একটি দুর্ঘটনায় আমাদের অভিনয় আজ এইখানেই বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছি।—

একটা গোলমাল শুরু হয়ে যায় দর্শকদের মধ্যে।

আগে আপনারা অনুগ্রহ করে আমার কথাটা শুনুন। আজকের অভিনয়ের

প্রধান চরিত্রে শিশিরবাবু অভিনয় করছিলেন, কিন্তু কোন কারণে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় একান্ত দুঃখের সঙ্গে বাধ্য হয়েই অভিনয় আজকে এইখানেই আমাদের বন্ধ করতে হল। আশা করি—

প্রেক্ষাগৃহ থেকে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জরণ ওঠে: চালাকি পেয়েছ বাবা! টিকিট কেটে এসেছি, টাকা ফেরত দাও।

সত্যহরিবাবু বললেন, দয়া করে আমার কথাগুলো আগে আপনারা শেষ করতে দিন। আপনাদের সকলের টিকিটের পুরোপুরি দামই আমরা ফেরত দেব। কিন্তু আপনাদের সকলের কাছ থেকে আমরা একটু 'সিভিক্ সেন্স' আশা করছি মাত্র। অনুগ্রহ করে গোলমাল না করে, অযথা সোর না তুলে, আপনারা যদি একটিমাত্র দরজাপথে একে একে লাইন দিয়ে টিকিটের কাউণ্টার-পার্টগুলো নিয়ে কাউণ্টারে গিয়ে দাঁড়ান, সকলকেই আমরা টাকা ফেরত দেব।

দর্শকদের মধ্যে একজন বলে ওঠে, না দিলে মাথা ভেঙে দেব না!

আর একজন বলে ওঠে, থিয়েটারে আগুন ধরিয়ে দেব না! হুঁ হুঁ বাবা, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি!

সত্যহরিবাবু বলেন, নিশ্চিন্ত থাকুন আপনারা সকলে, সকলের টাকাই আমরা ফেরত দেব। কেবল প্রার্থনা করছি করজোড়ে, একটু ধৈর্য ধরুন। আজ যাঁদের তাড়াতাড়ি বা অসুবিধা আছে—কাল বা পরেও তাঁরা এসে কাউণ্টারপার্ট দেখালেই টাকা ফেরত পাবেন।

হতভম্ব হয়েই একপ্রকার সুজিত কর বক্সে—যেখানে ওরা সকলে স্তম্ভিত, হতচকিত হয়ে বসেছিল এসে প্রবেশ করল, সর্বনাশ—সর্বনাশ হয়ে গেছে হিরণ্ময়!

কিরীটী এগিয়ে এল, শিশিরবাবু মারা যাননি তো?

সহসা যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হল। কিরীটীর সহজ ও সরল প্রশ্নে সকলেই যেন হঠাৎ অতর্কিত এক প্রচণ্ড আঘাতে স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে।

হ্যাঁ, আপনার অনুমানই ঠিক মিঃ রায়। শিশির—শিশির নেই!

মারা গেছে? আর্তকণ্ঠে অজিতা ও হিরণ্ময় বলে ওঠে।

হ্যাঁ। কোনমতে ঢোক গিলে অতিকষ্টে যেন সুজিত কথাটা উচ্চারণ করে।

কারও মুখে একটি শব্দ পর্যন্ত নেই—কথা তো দূরের কথা। এ কি ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ! আনন্দঘন উজ্জ্বল পাদপ্রদীপের আলোয়, স্বপ্নময় মঞ্চের উপরে অকস্মাৎ কোথা থেকে এল নেমে ঘোর অমানিশার শ্বাসরোধকারী অন্ধকার! বিষ-ফুৎকারে গেল নিবে যেন অকস্মাৎ লক্ষ কোটি হাসির প্রদীপ! কণ্ঠের আনন্দসুর মৃত্যুগরলে নীল হয়ে গেল যেন!

একবার মঞ্চে গিয়ে মৃতদেহটা দেখতে পারি সুজিতবাবু? কিরীটীই সর্বপ্রথম আবার প্রশ্ন করল।

অ্যাঁ! কি বললেন? যেন কতকটা চমকে উঠেই প্রশ্ন করে সুজিত কর কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

একবার স্টেজে গিয়ে শিশিরবাবুর মৃতদেহটা পরীক্ষা করে দেখতে পারি, পুলিস এখানে আসবার পূর্বে ?

আমি নিচে থেকে এখুন জিজ্ঞাসা করে আসছি।

একটু তাড়াতাড়ি। কিরীটী বলে।

হ্যাঁ, আমি যাব আর আসব। দ্রুত বক্স থেকে সুজিত কর নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

শিশির—শিশির মারা গেছে! কান্নায় বক্তার গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। চকিতে কিরীটী পাশে দৃষ্টিপাত করতেই দেখল, কমলা কথা কটি বলতে বলতে রুদ্ধ আবেগে চেয়ারটার উপরে বসে চোখে রুমাল চাপা দিয়েছে।

কেবল কিরীটীই নয়, সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে ক্রন্দনমুখী কমলার প্রতি।

প্রেক্ষাগৃহের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় সকলেই বুঝতে পারে, অদূরে উপবিষ্টা কমলা দুর্দমনীয় কান্নার আবেগ রোধ করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

শিশিরের আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারে সকলে হতভম্ব ও হতচকিত হলেও, কমলার ঐ দুর্দমনীয় কান্নার বেগকে রোধ করবার প্রচেষ্টা সকলেরই দৃষ্টি বুঝি আকর্ষণ করে। মুহূর্তে যেন শিশিরের বেদনাদায়ক মৃত্যুসংবাদের চাইতেও কমলার বর্তমান শোক বিহ্বলতাই সকলকে বেশী ব্যথিত ও বিমূঢ় করে।

দলের মধ্যে প্রত্যেকেই ফ্যালফ্যাল করে কেমন অসহায় এক বোবা দৃষ্টিতে কমলার রোরুদ্যমান, অবনতমুখী দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অজিতাই সর্বাগ্রে কমলার দিকে এগিয়ে যায়। অতি ধীরে কমলার নত মস্তকে একখানা হাত রেখে গভীর স্নেহসিক্ত স্বরে ডাকে, কমলা!

কমলা কোন জবাব দেয় না, কিন্তু তার কান্নার বেগটা যেন আরও একটু বেড়ে যায়।

কমলা, শোন। Don't lose your nerve! এখন বুঝতে পারছি শিশিরকে তুমি ভালবাসতে, যদিও কেউই ইতিপূর্বে সে কথাটা আমরা স্বপ্নেও বুঝতে পারিনি।

ঠিক এমনি সময় সুজিত এসে বক্সে পুনঃপ্রবেশ করে কিরীটীকে বলে, চলুন মিঃ রায়!

হিরণ্ময়, সৌমিত্র, ভবানী ও মালবিকাও ঐ সঙ্গে এগিয়ে এল, আমরাও যাব।

এস। নিরুৎসুক ক্লিষ্ট কণ্ঠে সুজিত বলে।

হিরণ্ময় বলে, অজিতা, তুমি এখানেই কমলার কাছে থাক না হয়—

অজিতা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়, আচ্ছা।

সকলে সুজিত করের পশ্চাদনুসরণ করে।

* * *

প্রেক্ষাগৃহ থেকে দর্শকরা তখন ভিড় করে ঠেলাঠেলি করতে করতে কাউণ্টারের দিকে চলেছে।

গোলমাল বহু কণ্ঠের, নানা সুরের।

রঙ্গমঞ্চের ওপরে সুজিতের সঙ্গে সঙ্গে ওরা সকলে এসে প্রবেশ করল। সত্যহরিবাবু ইতিমধ্যে আবার থানায় ফোন করতে অফিসের দিকে গিয়েছেন।

প্রশস্ত মঞ্চের পাটাতনের উপরে ততক্ষণে অভিনেতা অভিনেত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য—স্মারক, মঞ্চরক্ষক, ওয়েটার, সীফটার সকলেই এসে একে একে পাশাপাশি মৃতদেহকে ঘিরে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।

থমথম করছে চারিদিকে একটা কঠিন হিমশীতল স্তব্ধতা যেন।

ওদের আসতে দেখে সকলে সরে গিয়ে পথ করে দেয়।

ভূপতিত শিশিরের অসাড়, প্রাণহীন, নিশ্চল দেহটার দিকে একবার তাকাল কিরীটী।

একটু আগেও কণ্ঠমাধুর্যে, অভিনয়ের চমৎকারিত্বে, গতিচাতুর্যে যে মানুষটি প্রাণরসে ছিল ভরপুর, শত শত দর্শকের ঔৎসুক্য-ব্যাকুল সপ্রশংস দৃষ্টির সম্মুখে যে মায়াজাল সৃষ্টি করেছিল, মুগ্ধ বিস্ময়ে যার দিকে লোকে তাকিয়ে ছিল—অকস্মাৎ এক অদৃশ্য মায়াবীর যাদুস্পর্শে সে যেন নিজেই সহসা এক অদৃশ্য, অজ্ঞাত এক মায়াজালে জড়িত হয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

মায়ার খেলা তার ফুরিয়েছে। আকুঞ্চিত দেহ পাষাণের মত স্তব্ধ অনড়। বিস্ফারিত আতঙ্কজড়িত চক্ষুতারকা। মুষ্টিবদ্ধ হাত দু'টি ধনুকের মত বেঁকে আছে। পা দুটিরও অবস্থা অনুরূপ।

বদ্ধ ওষ্ঠের পাশ দিয়ে গড়িয়ে এসেছে কালো রক্তমিশ্রিত লালার একটি ক্ষীণ রেখা।

হঠাৎ অর্ধস্ফুট কণ্ঠে কিরীটী-বলে, আবার হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বলেই যেন মনে হচ্ছে!

ঠিক পাশেই দাঁড়িয়েছিল হিরণ্ময়, চকিতে কিরীটীর দিকে দৃষ্টিপাত করে সে বলে, অ্যাঁ, কি—কি বললে?

না, কিছু না।

কিরীটী অতঃপর এগিয়ে গিয়ে ফ্লাস্ক ও তার ঢাকনিটা কুড়িয়ে নিলে। ফ্লাস্কের সবটুকু চা-ই প্রায় মঞ্চের পাটাতনের উপরে গড়িয়ে পড়ে শুকিয়ে গেলেও, তখনও ফ্লাস্কের ভিতরে সামান্য চা একটু অবশিষ্ট ছিল।

ফ্লাস্কের মুখটা এঁটে ঢাকনিটা লাগিয়ে কিরীটী সেটা একপাশে নামিয়ে রাখল।

চলুন—এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই, কিরীটীর কথা শেষ হল না, সত্যহরিবাবু মঞ্চে প্রবেশ করলেন, পুলিসে সংবাদ দিয়েছি। এখুনি তারা এসে পড়বে। কোন জিনিসপত্র যেন না নাড়াচাড়া করা হয়। যেখানকার

যেটি যেন অমনি থাকে।

বলতে বলতে হঠাৎ কিরীটীর দিকে তাকিয়ে সত্যহরিবাবুর চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আরে কে—কিরীটী না? তুমি! তুমি এখানে?

হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি। কিরীটী এগিয়ে এসে সত্যহরিবাবুর পায়ের ধুলো নেয়।

সত্যহরিবাবু কিরীটীর মামার সহাধ্যায়ী এবং বহুদিন ধরে যথেষ্ট পরিচিত কিরীটীর। ইদানীং অবশ্য বছরখানেক দেখা-সাক্ষাৎ হবার কোন সুযোগ হয়নি ওদের।

আপনাকে উপরের বক্স থেকে স্টেজের উপরে দেখেই আমি চিনেছিলাম কাকাবাবু। কিন্তু—

হ্যাঁ, মাত্র দেড় বছর হল জাতীয় রঙ্গমঞ্চটা আমি কিনেছি। কিন্তু সে-সব কথা পরে হবে, এদিকে দেখ—কি দুর্ঘটনা ঘটল!

থানায় খবর দিয়েছেন তো?

হ্যাঁ, এইমাত্র ফোন করে এলাম! শ্যামপুকুর থানার ও-সি নির্মলশিব চৌধুরী আমার যথেষ্ট পরিচিত।

নির্মলশিববাবুকে আমিও চিনি। মৃতদেহ অবশ্য আমি স্পর্শ করিনি, তবে দূর থেকে দেখে যতটা মনে হচ্ছে, কোন তীব্র বিষের ক্রিয়াতেই শিশিরবাবুর মৃত্যু ঘটেছে।

বিষ! বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে কথাটা বললেন সত্যহরিবাবু।

হ্যাঁ, গোপন করে কোন লাভ নেই কাকাবাবু—যদিচ ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখের তবু নিছক একটা দুর্ঘটনা বলেও মনে হচ্ছে না। কিন্তু সে যাই হোক, একটা দুর্ঘটনা যখন ঘটে গিয়েছেই তাকে আমাদের face করতে হবেই। এসময় আপনাকে নার্ভ হারালে তো চলবে না কাকাবাবু।

তোমার কথার মাথা-মুণ্ডু কিছুই যে আমি বুঝতে পারছি না কিরীটী! একবার বলছ বিষের ক্রিয়ায় শিশিরের মৃত্যু ঘটেছে, আবার বলছ নিছক দুর্ঘটনাও নয়—

কাকাবাবু—কারণ আপনি কতটুকু শিশিরবাবুর সম্পর্কে জানেন জানি না, আমি একটু আগে পর্যন্ত ওঁর সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি তাতে করে মনে হয় শিশিরবাবুর এভাবে আত্মহত্যার কোন কারণই ছিল না। অবশ্য জোর করে এই মুহূর্তে সে-সম্পর্কে কিছু বলাও যায় না---সেও পরের, তদন্তসাপেক্ষ---তবে আমার যতদূর মনে হয় এটা একেবারেই আত্মহত্যা নয়।

কি বলছ তুমি!

ঠিক বলছি, ওঁকে বোধ হয় হত্যা করাই হয়েছে—চায়ের সঙ্গে আগে থাকতে বিষ মিশিয়ে দিয়ে। অভিনয়ের মধ্যে ঐ বিশেষ দৃশ্যটিতে চা-পানের ব্যাপার ছিল। খুব সম্ভব—অবশ্য সেটাও আমার অনুমান, শিশিরবাবু সাধারণত এ ও জায়গা হতে নিশ্চয়ই বোধ হয় চা পান করতেন না; সেই জন্যই

বোধ হয় চা তিনি ফ্লাস্ক করে সর্বেদা নিয়ে আসতেন, তাই নয় কি ?

হ্যাঁ। শিশিরের ও বিষয়ে একটা নীতি ছিল। বাইরে থেকে কখনও বড় একটা ও চা পান করত না। থিয়েটারে এসেও কখনও সে এখানকার চা পান করত না। এবং সর্বদাই তাই ঐ ফ্লাস্কে করে চা ভর্তি করে নিয়ে আসত। কথাটা বললেন সত্যহরিবাবু।

তবেই দেখুন। অনুমানটা নেহাত আমার একেবারে মিথ্যা হয়নি। বিষ-প্রয়োগকারী শিশিরবাবুর ঐ বিশেষ অভ্যাসটির সঙ্গে বেশ ভাল করেই পরিচিত ছিল বলেই সুযোগটা সে নিয়েছে।

বল কি কিরীটী ?

ঠিক তাই কাকাবাবু। এবং আমার এ অনুমান যদি মিথ্যা না হয়, বিষপ্রয়োগকারী এ কথাও জানত আজকের অভিনয়ের মধ্যে চা-পানের একটি বিশেষ পর্ব আছে। প্রখর চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান সেই লোকটি যিনি এই অপূর্ব সুযোগটি নিজের কাজে লাগিয়েছেন। আজকের অভিনয়ের মধ্যে চা-পানের সেই সুযোগটুকু নিয়ে নিঃশব্দে অসাধারণ চাতুর্যের সঙ্গে সে তার কাজটুকু হাসিল করে নিয়েছে।

কিন্তু—

ভাবছেন কি করে তা সম্ভব হল ?

হ্যাঁ! মানে—

আমার ধারণা শিশিরবাবুর বাড়ি থেকে যখন নিয়মিত এখানে অভিনয় করতে আসবার পূর্বে চা তৈরী করে ফ্লাস্কে ভর্তি করে নিয়ে আসেন, সেই মুহূর্ত থেকে চা-পানের পূর্ব পর্যন্ত কোন একসময় নিশ্চয়ই ফ্লাস্কের চায়ে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল সবার অলক্ষ্যে হত্যাকারী।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে কিরীটী! শিশিরের সাজঘর সম্পূর্ণ আলাদা। তাছাড়া একজন নেপালী দারোয়ান আছে—রণবীর। সর্বদা সে শিশিরের সাজঘরের দরজায় অভিনয় হতে শুরু করে শেষ হওয়া পর্যন্ত পাহারা দেয়। অভিনয়ের সময় শিশিরের কঠিন আদেশ থাকত কোন কারণেই কেউ তার সঙ্গে সে ঘরে গিয়ে দেখা করতে পারবে না বা কোনরকম বিরক্ত করতে পারবে না।

যে লোক এতখানি কৌশলে কাউকে হত্যা করতে পারে, একটা নেপালী দারোয়ানের চোখকে তার পক্ষে ফাঁকি দেওয়া বিশেষ কিছুই তো কঠিন ব্যাপার নয় কাকাবাবু এবং তার অকাট্য প্রমাণ তো এখনও আমাদের চোখের সামনে, মাটিতে পড়ে ঐ শিশিরবাবুর বিষপ্রয়োগে নিষ্প্রাণ দেহটাই। বলতে বলতে কিরীটী সহসা যেন উৎকর্ণ হয়ে উঠে বলে, ঐ বোধ হয় নির্মলশিববাবু এসে গেলেন। তাঁর জুতোর শব্দ আমি চিনি।

সত্যি সত্যিই স্টেজের উইংসের পাশ থেকে ভারী মচমচ জুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

এবং একটু পরেই সদলবলে শ্যামপুকুর থানা ইনচার্জ নির্মলশিববাবু রঙ্গমঞ্চে এসে প্রবেশ করলেন, ব্যাপার কি! অ্যাঁ কি ব্যাপার—কি আশ্চর্য, বলি ব্যাপারটা কি!

কথার মধ্যে বারংবার অহেতুকভাবে 'কি আশ্চর্য' বলাটা নির্মলশিববাবুর একটা চিরকেলে মুদ্রাদোষ।

মোটাসোটা নাদুসনুদুস নাড়ুগোপাল প্যাটার্নের চেহারাখানি নির্মলশিববাবুর। মনে হয় যেন দেহের আগে তাঁর ভুঁড়ি চলে।

তবে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করতে গেলে বলতে হয়, তারও আগে নির্মলশিববাবুর আরও কিছু চলে অর্থাৎ আগে চলে নির্মলশিববাবুর বিশেষ আকারের জুতোজোড়া! নির্মলশিবের দেহের অনুপাতে পদযুগল কিঞ্চিৎ ছোটই বলতে হবে, কতকটা চৈনিক প্যাটার্নের। তবে চৈনিক প্যাটার্নের জুতোর পরিবর্তে নির্মলশিবের জুতোটা বরং পদযুগল থেকে একটু বড়ই অর্থাৎ পায়ের সাইজ থেকে কিছু বড় সাইজের জুতো পরাটা নির্মলশিবের একটা অভ্যাস!

বলি ব্যাপারটা কি! কি আশ্চর্য!

নমস্কার, নির্মলশিববাবু!

কিরীটীর কণ্ঠস্বরে চমকে নির্মলশিব চোখ তুলে কিরীটীকে সামনে দেখে বলে উঠলেন, কি আশ্চর্য, কিরীটী রায়!

হ্যাঁ, ঘটনাচক্রে।

ঘটনাচক্রে! কি আশ্চর্য!

কিরীটীই অতঃপর সত্যহরিবাবুর অনুরোধে নির্মলশিবকে আনুপূর্বিক সমগ্র ঘটনাটি বললে।

সমস্ত শুনে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে নির্মলশিব বললেন, কি আশ্চর্য! এরা দেখছি আমাদের একটা দিনও সুস্থির থাককে দেবে না। খালি মারামারি, দাঙ্গা, চুরি, খুন জখম। কি আশ্চর্য! দেশসুদ্ধ এমন ক্রিমিন্যাল মাইনডেড হয়ে উঠল কেন বলুন তো কিরীটীবাবু? কি আশ্চর্য! এরা ভেবেছে কি? এরা সাপের পাঁচ পা দেখেছে নাকি? ওহে ম্যানেজারবাবু, কি আশ্চর্য! দাঁড় করিয়েই রাখবেন নাকি? একটা চেয়ার-ফেয়ার দিন না মশাই। দেখছেন তো, কি আশ্চর্য! মোটাসোটা মানুষ—এতটা পথ ঘোড়-দৌড় করে আনালেন, হাঁপিয়ে পড়েছি যে!

সত্যহরিবাবু তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার এনে রঙ্গমঞ্চের ঠিক মধ্যস্থলে পেতে দিলেন, বসুন স্যার। বসুন।

চেয়ারটা টেনে আরাম করে বসতে বসতে নির্মলশিব বললেন, কি আশ্চর্য! খুন?

তারপরে সঙ্গের অ্যাসিস্টেণ্ট ননী দত্তকে ডেকে বললেন, ওহে ননী, কি আশ্চর্য! দাঁড়িয়ে রইলে কেন like a স্ট্যাচু? শুরু করে দাও হে তোমাদের

জবানবন্দি। এন্‌কোয়ারিটা যত তাড়াতাড়ি পার সেরে নাও।

এই যে স্যার নিই। তরুণ অফিসার ননী দত্ত তৎপর হয়ে ওঠে।

একে একে জবানবন্দি নেওয়া শুরু হয়।

আপনার কাজ আপনি তাহলে করুন নির্মলশিববাবু, আমি চলি। এই সময়ে কিরীটী বলে ওঠে।

কি আশ্চর্য! এর মধ্যেই যাবেন নাকি?

হ্যাঁ। একটা বিশেষ কাজ আছে! কাল সকালে আসবো'খন আপনার ওখানে।

কি আশ্চর্য! তা বেশ। কি আশ্চর্য! তুমি আবার হাঁ করে থেমে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ননী? সেরে নাও হে। চটপট সেরে নাও।

কিরীটী হিরণ্ময় প্রভৃতিকে নিয়ে মঞ্চ থেকে বের হয়ে এল।

একমাত্র সুজিত করই কিছুক্ষণের জন্য রঙ্গালয়ে থেকে গেল। অভিনয় শুরু হবার আগে থেকেই সে মঞ্চের মধ্যে ছিল! তাছাড়া সে অভিনেতা শিশিরের বিশেষ বন্ধু, অভিনয়ের পূর্বেও কয়েকবার সে নাকি শিশিরের প্রাইভেট ঘরে যাতায়াত করেছে, উভয়ের সঙ্গে কথাবার্তাও হয়েছে।

নির্মলশিবের নির্দেশেই সুজিত করকে থাকতে হল।

বাইরে এসে কিরীটী বললে, আজকে সন্ধ্যার পর আমার ওখানে যে সকলে মিলে আলোচনা হবার কথা ছিল, সেটা আপাতত কাল সকাল পর্যন্ত মুলতুবী থাক।

শিশিরের অভাবনীয় আকস্মিক মৃত্যুতে সকলেই যেন মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। কে কি বলবে কিছুই যেন কেউ বুঝে উঠতে পারছিল না। সকলেরই বোধশক্তি যেন কেমন অসাড় হয়ে গিয়েছে। কিরীটীর কথায় ওরা যেন একান্তভাবে নিজ নিজ অজ্ঞাতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

তবে একটা কথা, কাল দুপুরের দিকে যদি আপনাদের কারও কোন আপত্তি না থাকে তাহলে আপনাদের 'নন্‌সেন্স ক্লাবে'ও তো আমরা সকলে গিয়ে মিট করতে পারি। কি বলেন আপনারা?

বেশ, তাই হবে। আমরা সকলেই সেখানে আসব, কিন্তু আপনি কি আমাদের ক্লাবের ঠিকানা জানেন মিঃ রায়? কিরীটীকে প্রশ্ন করে অনিল চৌধুরী!

না। ভেবেছিলাম জেনে নেব। বলুন ঠিকানাটা।

তার প্রয়োজন নেই কিরীটী। আমিই তোমার ওখানে যাব। সেখান থেকে তোমায় সঙ্গে নিয়ে একত্রে যাওয়া যাবে। বললে হিরণ্ময়।

বেশ। বেলা দুটোর সময় পাংচুয়ালী আমরা সকলে তাহলে নন্‌সেন্স ক্লাবেই মিট করব। কথাগুলো বলে কিরীটী সকলের মুখের দিকে তাকায়, কি বলেন আপনারা?

তাই হবে। জবাব দেয় অনিল চৌধুরী অন্য সকলের হয়েই।

সাত

কিরীটী ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খানিকটা এগিয়ে এসে হাতীবাগানের মোড় থেকে হাত-ইশারায় একটা চলমান ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসল, টালীগঞ্জ চালাও।

থিয়েটারের সামনে রাস্তায় ও গলির মধ্যে তখনও বহিরাগত দর্শকজনের ভিড় এতটুকু কমেনি। টিকিটঘরের কাউণ্টারের সামনে দর্শকদের ঠেলাঠেলি, চেঁচামেচি সমানে চলেছে। এর উপরে দ্বিতীয় অভিনয় শুরু হবারও খুব বেশী আর সময় বাকি নেই, নবাগত দর্শকদলেরও ভিড় জমতে শুরু হয়েছে তখন একটু একটু করে।

ট্যাক্সিচালক কোনমতে যানবাহন ও অগণিত মানুষের ভিড় বাঁচিয়ে গ্রে স্ট্রীট ধরে অ্যাভিনুতে এসে পড়ল।

ইতিমধ্যেই বেলাশেষের ম্লান ধূসর ছায়া মহানগরীর উপর ঘনিয়ে এসেছে। রাস্তার দুধারে ইলেক্‌ট্রিক বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে।

গাড়ির পিছনের ব্যাকে আরাম করে গা এলিয়ে, চক্ষু মুদ্রিত করে কিরীটী নিজেকে চিন্তাস্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

আশ্চর্য রহস্য যেন ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে একজন মাত্র কয়েকদিন পূর্বে— উৎসবভোজের আনন্দকলহাসির মধ্যে সহসা তীব্র বিষপ্রয়োগে নিহত হয়েছে, সপ্তাহকাল না গত হতেই আর একজন অন্তরতম বন্ধু অভিনয়ের আনন্দমুহূর্তে ঠিক একই ভাবে বিষের ক্রিয়ায় নিহত হল। এবং হয়ত একই প্রকারের বিষের ক্রিয়ায়— হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড!

একজন বিষ পান করলে পানীয় জলের সঙ্গে, দ্বিতীয়জন পান করলে বিষ চায়ের সঙ্গে।

দুজনেই পান করলে বিষ নিজেদের অজ্ঞাতে, নিষ্ঠুর চক্রীর চক্রান্তে। প্রথম দিনেও অন্যান্য সকল বন্ধু-বান্ধবীরা উপস্থিত ছিল। আজও সকলেই ছিল উপস্থিত।

আশ্চর্য মিল দুটি ঘটনার মধ্যে।

একটি অদৃশ্য হাত যেন অলক্ষ্য থেকে তীব্র কালকূট পরিবেশন করলে। অমোঘ মৃত্যুবাণে অবধারিত মৃত্যুও ঘটে গেল মুহূর্তে। অথচ হত্যাকারীর কোন নিদর্শনই পাওয়া গেল না।

একবার পড়ে রইল একটা ভগ্ন, শূন্য, কাচের গ্লাস; দ্বিতীয়বারে পড়ে রইল শূন্য একটি কাঁচের পেয়ালা।

স্থান নির্বাচনও চমৎকার। একবার ভোজনকক্ষ, দ্বিতীয়বার রঙ্গমঞ্চ।

আবার হঠাৎ কিরীটীর সেই কবিতাটি মনে পড়েঃ

হারাধনের নয়টি ছেলে কাটকে গেল কাঠ
একটি কেটে দুখান হল রইল বাকী আট !

* * *

কবিতাটি একটু ঘুরিয়ে এবং বদলে দিতে হবে—

একত্রে নয়টি বন্ধু গেল থিয়েটারে,
একটি চায়ের বিষে মল—আটটি ফেরে ঘরে।

তারপর ?

প্রথম দশটিতে আটটি পুরুষ বন্ধু ও দুটি বান্ধবী নন্‌সেন্স ক্লাবটি গড়ে তুলেছিল, পরে এল তাদের মধ্যে আরও একটি নারী। হল তিনটি নারী, বাকী সকলে পুরুষ। এবং কিছুকাল আগে পর্যন্ত সকলেই ছিল অবিবাহিত।

সহসা মীনকেতুর ফুলশরে জর্জরিত হল ওদের মধ্যে দুজন। সুসম্পন্ন হল মাল্যদান, হৃদয় বিনিময়।

বাকি রইল আটজন। ছটি পুরুষ, দুটি নারী।

হিরণ্ময় কিরীটীর যথেষ্ট না হলেও বেশ পরিচিত বন্ধুমানুষ।

সাধারণ গৃহস্থঘরের শিক্ষিত, উদারমনোধর্মী, সুশ্রী যুবক ঐ হিরণ্ময়। জীবন যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত নয়, আশাবাদী বটে তবে স্বপ্নবিলাসীও নয়। বর্তমানে কোন এক বেসরকারী কলেজে প্রফেসারী করে।

অনিল চৌধুরী শিক্ষিত, রূপবান, ধনীর একমাত্র সন্তান। মনে প্রাণে শিল্পী, সেন্টিমেন্টাল সহজে ধৈর্য হারায়; স্বপ্নবিলাসী তো বটেই, খেয়ালীও।

সুজিত কর নিজ বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। ঔপন্যাসিক হিসাবে বাজার এবং বিশেষ করে সাহিত্যিক মহলে সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। আত্ম-সচেতন এবং প্রতিষ্ঠা ও সুনামের ভ্যানিটিও মনে মনে প্রচুর আছে। স্থিরমস্তিষ্ক ও আদপেই খেয়ালী নয়।

সৌমিত্র তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দৃঢ়চেতা। জীবনে শিল্পটাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে। সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আত্মসচেতন। কিছুটা অস্থির ও চঞ্চল প্রকৃতির হলেও বিজ্ঞানের সাধনা করে।

ভবানী রায় চিত্রপরিচালক। জীবনের বেসাতিতে ঠকবার ছেলে নয়—সাচ্চা জহুরী, জহর চেনে। তাই অজিতার মত নারীরত্নের অধিকারী। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভাবুক ও ভাববিলাসী নয়।

বিনয় মুখোপাধ্যায় সংবাদপত্রসেবী, চিরদুঃখবাদীর দলে। কিছুটা ভাববিলাসী, আজ অবশ্য জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বাকি রইল তিন নারী—মালবিকা, কমলা আর অজিতা। অজিতাকে বাদ দিলে থাকে দুজন—কমলা আর মালবিকা।

সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির দুটি নারী।

মালবিকার যৌবন আছে কিন্তু রূপ নেই। কমলার যৌবন যে শুধু আছেই

তাই নয়, চোখ ঝলসানো রূপও আছে। রূপের যেন অন্ত নেই। পুরুষ চিরদিন নারীর রূপে মুগ্ধ হয়েছে, তৃষ্ণাতুর হয়ে উঠেছে। এবং চিরদিন কামনা করেছে নারীর দেহ—রক্তমাংসের লোভনীয় দেহটা।

সে দেহের অধিকারী অবশ্য মালবিকা ও কমলা দুজনেই, তথাপি তাদের মধ্যেও পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাবেই বত মান। মালবিকা কৃশ। কমলা কৃশও নয় এবং মেদবাহুল্যে অশোভনীয়ও নয়।

সহজ ভাবে বিচার করে দেখতে গেলে যে কোন পুরুষই মালবিকার চাইতে কমলাকেই বেশী কামনা করবে।

তবু মালবিকা কমলার মতোই একজন নারী।

কমলা যেন মনে হয় তার রূপ-যৌবন সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবেই আত্মসচেতন। নিজেকে সে প্রতি মুহূর্তে ব্যক্ত ও উদঘাটিত করে, যাচাই করে নিতেই যেন চায়।

মালবিকা সেটা চাইলেও (কারণ প্রত্যেক নারীই মনে প্রাণে সেটা চায়) হাবে-ভাবে কথায়-বার্তায় সেটা প্রকাশ করতে মনে হয় যেন ভয় পায়।

ভালবাসা বা কামনার কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচাই করতে গেলে যে তার সত্যিকারের বড় ফাঁকটাই বিশ্রী উলঙ্গভাবে ধরা পড়ে যাবে একথা মুখে সে স্বীকার করতে দুঃসাহসী না হলেও সেই ভয়েই যে সে সর্বদা সশঙ্কিত ও বিশেষভাবেই আত্মসচেতন বুঝতে কষ্ট হয় না।

হঠাৎ কিরীটীর সম্বিৎ ফিরে আসে ড্রাইভারের ডাকে। রসা রোড ধরে টালীগঞ্জ ব্রীজের তলা দিলে ট্যাক্সি তখন চলেছে।

বাবুজী, আব্ কিধার যায়েঙ্গে ?

সিধা চল।

নন্‌সেন্স ক্লাব।

পরের দিন দ্বিপ্রহরে নন্‌সেন্স ক্লাবে হিরণ্ময়ের সঙ্গে পূর্বদিনের পরামর্শ অনুযায়ী কিরীটী যখন এসে উপস্থিত হল, সকলেই তখন ক্লাবঘরে এসে জড় হয়েছে একমাত্র ওরা দুজন বাদে।

কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই প্রথমে অদূরে একটা বইয়ের আলমারির মাথায় পাশাপাশি বসানো কতকগুলো পাথরের তৈরি বানরের মূর্তির প্রতি নজর পড়তেই কিরীটী যেন থমকে দাঁড়িয়ে যায় এবং আপন মনেই যেন বলে, আশ্চর্য !

ঘরের মধ্যে সকলেই তখন উপস্থিত, তবু, হিরণ্ময়ই পাশ থেকে কিরীটীকে সম্বোধন করে বলে, এই আমাদের নন্‌সেন্স ক্লাব কিরীটী।

কিরীটীর দৃষ্টি তখনও অদূরে আলমারির মাথায় পাশাপাশি রক্ষিত কালো পাথরের তৈরি বানরের মূর্তিগুলোর প্রতি স্থিরনিবদ্ধ।

কিরীটী এবারে নিজেই এগিয়ে গিয়ে আলমারির সামনে দাঁড়াল। কালো

পাথরের তৈরি বাঁদরের মূর্তিগুলো গুনে দেখলে। আটটা মূর্তি।

এগুলো, মানে বাঁদরের মূর্তিগুলো—what do they indicate হিরণ্ময়? এখানে এগুলো রাখা হয়েছে কেন?

হিরণ্ময় মৃদু হেসে বলে, নন্‌সেন্স ক্লাবের দশটি বাঁদর—আমাদের প্রতিভূ। বলতে বলতে হঠাৎ হিরণ্ময় থেমে গিয়ে অর্ধস্ফুট স্বরে বলে, আশ্চর্য!

আশ্চর্য কি?

মানে মাত্র আটটা রয়েছে দেখছি! বাকি দুটো মূর্তি?

হিরণ্ময় ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ দণ্ডায়মান অন্যান্য সকলের মুখের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, তোমরা—তোমাদের কারও চোখে পড়েনি? অনিল, সুজিত, সৌমিত্র?

এতক্ষণে ঘরের মধ্যে উপস্থিত অন্যান্য সকলেরও সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল।

সকলের চোখেমুখেই একটা বিস্ময়ের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি।

সকলেই প্রায় একসঙ্গে বলে ওঠে, কই না তো?

আশ্চর্য!

দশটি মূর্তির মধ্যে দুটি মূর্তি উধাও হয়ে গেল।

কিরীটীর সক্রিয় চিন্তাশীল মনের মধ্যে কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার চলেছে তখন। হিরণ্ময়ের হিসাবে আরও দুটি পাথরের মূর্তি ছিল অর্থাৎ এগারটি বন্ধু অথচ প্রতিভূ বা স্মারক দশটি মূর্তি রাখা ছিল ঐ আলমারির উপরে। দশটি কালো পাথরের তৈরী বাঁদরের মূর্তি! বন্ধুদের মধ্যে আজ রহস্যজনকভাবে দুটি বন্ধু নিহত আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দশটি মূর্তির মধ্যে থেকে দুটি মূর্তি নিখোঁজ। কিন্তু এগারোটা না হয়ে দশটা কেন?

কিন্তু কথা হচ্ছে, এও কি খুনীরই কারসাজি?

সত্যি যদি তা হয়, খুনী যে শুধু অদ্ভুত করিতকর্মা তাই নয়, রহস্য ও কৌতুক-প্রিয় তো বটেই, রসিকও বটে।

এবং এর মধ্যে থেকে আরও একটা গুরুতর সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে, আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই pre-planned—পূর্ব-পরিকল্পিত। খুনী যেন দাবার ছক পেতে নিয়ে খেলতে শুরু করেছে।

আচ্ছা, তোমরা তো এগারোজন—তবে দশটি মূর্তি ছিল কেন? এতক্ষণে প্রশ্নটা করে কিরীটীই হিরণ্ময়ের মুখের দিকে তাকায়।

প্রথমে আমরা দশজনই ছিলাম, পরে কমলা আসে। হিরণ্ময় বলে।

ও। আচ্ছা হিরণ্ময়, বুঝতে পারছি না হঠাৎ ও-ধরণের মূর্তি কেন তোমরা তৈরি করতে গিয়েছিলে? মানে—

পরিকল্পনাটা অবশ্য সৌরেশেরই। সে হঠাৎ একদিন প্রস্তাব করে, আমাদের নন্‌সেন্স ক্লাবের সভ্য ও সভ্যাদের একটা বিশেষ চিহ্ন ক্লাবঘরে থাকা

প্রয়োজন, অথচ সাধারণ যেমনটি হয় অর্থাৎ ফটো হবে না। প্রথমটায় তার প্রস্তাবে অনেক তর্কাতর্কি, হৈ-হুল্লোড় হয়, অবশেষে ঠিক হয় আমাদের প্রত্যেকের অর্থাৎ দশজনের একটি করে মিনিয়েচার বাস্ট তৈরি করে ক্লাবঘরে আমরা রাখব। এতে অজিতা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বলে হ্যাঁ, তা হতে পারে তবে সে বাস্টগুলো আমাদের হুবহু ঠিক প্রতিকৃতি হবে না, অন্য কিছুর প্রতিকৃতি—যা থেকে বোঝা যাবে আমরা, নন্‌সেন্স ক্লাবের সভ্যরা, সত্যিই আবোলতাবোল, নন্‌সেন্স। অতএব মূর্তিগুলো হোক বাঁদরের। এতেও অনেকে প্রতিবাদ তোলে। তখন অজিতা বলে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা কি ছিলেন শুনি? বাঁদর-জাতীয়েরই কোন বংশাবলম্বী হতে আমরা যে উদ্ভূত হয়েছি অনেক মনীষীরাই তো সে কথা বলে গিয়েছেন। এবং শুধু তাই নয়, আমরা বর্তমান যুগের মনুষ্যজাতি আসলে বাঁদর ছাড়া আর কি? গাছে গাছে এবং ডালে ডালে আমরা লাফাই না বটে, তবে ঘরের মধ্যে দিবারাত্রই তো লাফাচ্ছি। ওরা কাঁচা ফলমূল খায়, আমরা সিদ্ধ করে। ওরাও দাঁত খিঁচোয়, আমরাও খিঁচুই। আসলে আমরা ওদেরই সহধর্মী। ওদের মতো মারামারি, খাওয়াখাওয়ি করি, আবার প্রয়োজনে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজও করি। শেষ পর্যন্ত অজিতা তার প্রস্তাবটিই carried out করিয়ে নিলে এবং ঐ মূর্তিগুলো তৈরি হয়ে এল।

আচ্ছা সর্বশেষ, মানে আজকের আগে সর্বশেষ আপনারা এখানে কবে এসেছিলেন? কিরীটী প্রশ্ন করে হিরণ্ময়কেই—কিন্তু সকলের মুখের দিকেই চেয়ে।

সর্বশেষ আমরা মিলিত হয়েছিলাম অনিলের জন্মদিন উৎসবের আগের রাত্রে। জবাব দেয় হিরণ্ময়।

আমি সকলকেই প্রশ্ন করছি, তারপর আপনারা কেউ আর ক্লাবে আসেননি?

সকলেই অসম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নাড়ে, অর্থাৎ কেউ আর আসেনি।

ক্লাবের রক্ষণাবেক্ষণের ভার কারও হাতে থাকত না? দ্বিতীয় প্রশ্ন করে কিরীটী।

না। ক্লাবের যাবতীয় কাজ ভাগ ভাগ করে আমাদের দশজন সভ্যের উপরেই অর্পিত ছিল। কেউ ঘর ঝাঁট দেবে, কেউ পরিষ্কার করবে, কেউ সাজাবে-গুছোবে, কেউ বা চা তৈরি করবে ইত্যাদি। এবং যখনই আমরা মিলিত হয়েছি সকলে মিলেই কাজ করেছি। জবাব দেয় অনিল।

বাকি সময় তাহলে ঘরে তালা দেওয়াই থাকত?

হ্যাঁ। নিয়ম ছিল প্রতি শনিবার ও বুধবার আর ছুটিছাটার দিন সকলে এখানে এসে মিলিত হব। সেই কারণেই অন্যান্য দিন তালা দেওয়াই থাকত।

আচ্ছা যে যে দিন সকলে আপনারা আসতেন, একই সময়ে নিশ্চয়ই সকলে এসে উপস্থিত হতে পারতেন না?

না। তবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সকলে এসে উপস্থিত হতাম। হিরণ্ময় বলে।

কিন্তু কে যে আপনাদের মধ্যে আগে আসবেন তা যখন ঠিক ছিল না, তখন ক্লাবঘরের তালা খোলা সম্পর্কে আপনাদের কি ব্যবস্থা ছিল?

তালা মাত্র একটি হলেও দশটি চাবি ছিল এবং একমাত্র কমলা ছাড়া প্রত্যেকের কাছেই আমাদের একটি করে চাবি থাকত। তাই কেউই আগে এলেও তার অসুবিধা হত না ঘরে প্রবেশ করার। জবাব দিল ডাঃ অজিতা রায়।

হুঁ। তালা একটি কিন্তু চাবি ছিল দশটি—প্রত্যেক সভ্যের কাছে এক-একটি করে। মৃদুস্বরে কতকটা যেন আত্মগতভাবেই কথাগুলো কিরীটী উচ্চারণ করে।

তাহলে তো—একটু থেমে হঠাৎ কিরীটী বলে, দেখছি আপনাদের মধ্যে যে কেউই যখন খুশি এসে তাহলে এ-ঘরের তালা খুলতে পারতেন! আর শুধু তাই নয়, আপনাদের মধ্যে যখন নিয়ম ছিল সকলকে একত্রে এখানে এনে সর্বদা মিলিত হতে হবে তখন যে কারও পক্ষেই যে কোন সময়েই এখানে এসে প্রবেশ করাটা দুঃসাধ্য ছিল না। কি বলেন আপনারা? Am I not right?

কিরীটীর প্রশ্নটা যেন নিক্ষিপ্ত একটা তীক্ষ্ণ শরের মতোই উপস্থিত সকলের মর্মস্থলে গিয়ে একেবারে বিদ্ধ করেছে। সকলের চোখেই বোবা, অসহায় দৃষ্টি।

কারও মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। নির্বাক, স্তম্ভিত যেন সকলেই। নির্মম কঠোর পরিস্থিতি।

যুগপৎ সকলের প্রতি একবার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিদা বুলিয়ে কিরীটী এবারে বললে, হিরণ্ময়, নির্মম ও কঠোর হলেও এবারে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—সত্য যা তা দিনের সূর্যালোকের মতোই এবারে আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছে। সৌরেশ ও শিশিরবাবুর মৃত্যুর জন্যে তোমাদের মধ্যেই এক-জন দায়ী।

সহসা কক্ষমধ্যে যেন বজ্রপাত হল।

কিরীটীর নির্মম কঠোর কণ্ঠ আবার শোনা গেল, হ্যাঁ। তোমাদের মধ্যেই একজন—বলতে বাধ্য হচ্ছি—খুনী, দুটি বন্ধুর হত্যাকারী।

অর্ধস্ফুট একটা চিৎকার একই সঙ্গে সকলের কণ্ঠ থেকে যেন বের হয়ে এল।

মুহূর্তে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি বারেকের জন্যে দৃষ্টিপাত করে।

প্রতিজোড়া চোখেই একটা আশঙ্কা, ভয় ও সংশয়ের সুস্পষ্ট আভাস যেন ফুটে উঠেছে।

প্রত্যেকের মনে একই প্রশ্ন জেগে ওঠে, কে? আমি না ও—কে? কে আমাদের মধ্যে খুনী?

কে আমরা হত্যা করেছি? আমাদের মধ্যে কার হাত বন্ধুহত্যার রক্তে

কলঙ্কিত ?

ও না আমি ? কে—কে—কে ?

আপনাদের মধ্যেই একজন খুনী, হত্যাকারী—সন্দেহমাত্রও নেই তাতে, কিরীটী আবার বলে ওঠে, কিন্তু এখনও আমি বলছি, মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলা—it's a dangerous game ! এ আগুন নিয়ে খেলা—এ পাপের সীমা নেই। এ পাপকে ঢেকে রাখা যায় না, কেউ কোনদিন পারবে না। মৃত্যু তার পদচিহ্ন রেখে যায়। Never a crime, a murder could be perfect ! তাই এখনও বলছি, আপনাদের মধ্যে যে যা জানেন—tell me frankly, tell me the truth !

তবু কারও মুখে কোন কথা নেই।

নির্বাক, প্রস্তরমূর্তির মতোই যেন সকলে দাঁড়িয়ে থাকে।

বোবা, ভীত, সশঙ্কিত।

তাছাড়া একটা জিনিস আপনারা ভেবে দেখছেন না ! আপনাদের মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে যে-ই হত্যা করে থাকুন, আমার মতে তাঁর সুনিশ্চিত মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। যে এমন নৃশংসভাবে বন্ধুর ছদ্মবেশে বন্ধুকে হত্যা করতে পারে—he is nothing but a maniac, উন্মাদ ! তার স্থান আমাদের মতো মানুষের সমাজে নয়—পাগলা-গারদে। If he still remains at large—সে যে আরও কি ভয়ঙ্কর কাজ করবে তা কেউই বলতে পারে না। সভ্যতা, মনুষ্যত্ব, শিক্ষা ও সমাজের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে আমি আপনাদের সকলকে আবারও সবিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি, অমন ভয়ঙ্কর প্রকৃতির এক রক্তপায়ীকে এমনি করে পালিয়ে যেতে দেবেন না। তাকে ধরিয়ে দিন। তার ভয়ঙ্কর পৈশাচিকতাকে উদঘাটিত করুন। সে মানুষের সমাজে বাসের অযোগ্য, তাকে ধরিয়ে দেওয়া আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য।—সমাজের প্রতি, মনুষ্যত্বের প্রতি কর্তব্য। দয়া বা অনুকম্পা আমরা কাকে করব—মানুষকে, কিন্তু মানুষ-বেশী বিকৃতমস্তিষ্ক কোন পিশাচকে নিশ্চয়ই নয় !

কিরীটীর কথাগুলো আবেগে, উত্তেজনায় ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু যাদের লক্ষ্য করে সে কথাগুলো বলে তারা কিন্তু সকলেই নীরব তখনও। প্রস্তরমূর্তির মতো স্থির, অকম্পিত। প্রস্তরকঠিন একটা স্তব্ধতা যেন কক্ষের বাতাসকে সীসের মতোই ভারী করে তুলেছে।

নিচের রাস্তা দিয়ে একটা মোটরগাড়ি বোধ হয় চলে গেল, তার ইলেকট্রিক হর্নের আওয়াজ ও বিলীয়মান ইঞ্জিনের শব্দ কক্ষের স্তব্ধতার মধ্যে যেন একটা ঢেউ জাগিয়ে গেল।

হিরণ্ময় ! কিরীটীর কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, আজকের মত আমি বিদায় নিচ্ছি ভাই। কিন্তু যাবার পূর্বে আবার বলে যাই, এ অন্যায় এ পাগলামিকে তোমরা সহ্য করো না। নিজেদের মধ্যে একটা খোলাখুলি আলোচনা করে দেখ। তারপর যা জানাবার আমাকে জানিও। এবং যাবার

পূর্বে আর একটা কথা বলে যাই, চেষ্টা করলেও তোমরা হত্যাকারীকে ন্যায় ও আইনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। যে হাতে হত্যাকারী তার বন্ধুর মুখে পানীয়ের সঙ্গে তীব্র হলাহল, কালকুট তুলে দিয়েছে, সেই কালকূট নিজের মুখে একদিন তাকে তুলে নিতে হবে সেই হাতেই। আচ্ছা, আজ আমি চলি। Good night to everybody!

কিরীটী কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

আট

কিরীটীর জুতোর শব্দ ক্রমে সিঁড়িপথে মিলিয়ে গেল।

একটা গোলাকার, সুদৃশ্য কারুকার্যখচিত দেওয়াল-ঘড়ি টক্ টক্ করে শব্দ করে চলেছে ঘরের দেওয়ালে।

দেওয়ালের গায়ে একটা কুৎসিত, পেটমোটা, কালো টিকটিকি নিঃশব্দে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে কিছু দূরে—দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট টিকটিকিকে বোধ হয় লক্ষ্য করে করে।

আর একটা চাপা অস্পষ্ট অঁ-অঁ গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। দক্ষিণ দিককার দেওয়ালে খানিকটা মাকড়সার জাল বিস্তৃত হয়েছে, সেই জালের মধ্যে একটা মাছি আটকা পড়েছে, মাছিটার হাত-পা ও দুটি ডানা সব জড়িয়ে গিয়েছে মাকড়সার জালে। মুক্তির জন্যে বন্দী সেই মাছিটাই মরণগুঞ্জন তুলেছে। অল্প দূরে দেখা যাচ্ছে তার, কালো একটা মাকড়সা নিঃশব্দে বাঁকা বাঁকা রোমশ পা গুলি নিয়ে এগিয়ে চলেছে জালে বদ্ধ মাছিটাকে গ্রাস করতে।

হঠাৎ একটা চাপা কান্নার শব্দে সকলের সম্বিৎ যেন ফিরে এল।

একটা সোফার ওপরে বসে কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে কমলা।

অজিতা এগিয়ে গিয়ে কমলার ঠিক পাশটিতে বসল, ডান হাতখানি নিঃশব্দে অবনত কমলার পিঠের ওপরে ন্যস্ত করলে, কমলা, কি—কি হয়েছে ভাই?

সহসা সৌমিত্র যেন বোমার মতই ফেটে পড়ে, this is simply inhuman torture! না, না, এ সহ্য করা অসম্ভব। Hang Kiriti Roy!

সৌমিত্র? ডাকলে হিরণ্ময়।

না না হিরু, এ অসহ্য। তার এই 'সারমন' simply unbearable! সে ভেবেছে কি? আমি সত্যিই ভেবে পাচ্ছি না হিরু, তাকে তোমরা এর মধ্যে টেনে আনলে কেন? Really what a d sgrace! পুলিস যখন সমস্ত ব্যাপারটা নিজ হাতে নিয়েছে তারাই যা করবার করুক। না না, সত্যি তার এ ঔদ্ধত্য কিছুতেই আমি সহ্য করতে পারছি না। Really it's

a torture !

উত্তেজনায়, আবেগে সৌমিত্রের কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে।

উত্তেজিত হয়ো না সৌমিত্র। হিরণ্ময় বলে, একটু আগে কিরীটীবাবু যা বলে গেলেন, একবার ভেবে দেখ দেখি আসলে তিনি এমন কি অন্যায় কথা বলেছেন! শিশিরের মৃত্যুর কথা না হয় ছেড়েই দাও, কিন্তু সৌরেশের মৃত্যুর ব্যাপারটা? সেদিন রাত্রে অনিলের বাড়ির সেই উৎসবে এবং ভোজনের সময় আমরা ছাড়া তো আর কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল না। সেক্ষেত্রে আমাদের ওপরেই কি সাধারণ একজন বাইরের লোকের সন্দেহ পড়বে না? আরও একটা কথা ভুলো না যে সেই সন্দেহেই পুলিসও আমাদের একপ্রকার নজরবন্দী করেই কি রাখেনি?

হিরু ঠিকই বলেছে সৌমিত্র, অনিল চৌধুরী এবারে বলে, সত্যি রাগারাগি বা উত্তেজনার ব্যাপার নয়। ঘটনা-পরিস্থিতি আজ এমন বিশ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আজ তাকে এড়াতে চাইলেই এড়ানো যায় না বা যাচ্ছে না। কিরীটীবাবু ঠিকই বলেছেন, আমাদের সকলেরই এখন সর্বাগ্রে ঠাণ্ডা হয়ে আগাগোড়া ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন।

কি তুমি বলতে চাও অনিল, প্রতিবাদ জানায় সুজিত কর, তুমিও কি তাহলে মনে কর যে, আমাদের দুজন অন্তরতম প্রিয় বন্ধুর হত্যাকারী আমাদের মধ্যেই কেউ একজন?

না, এতটা নিশ্চয় করে কিছুই বলতে চাই না সুজিত, অনিল জবাবে বলে, আমি শুধু বলতে চাই ঘটনাপরম্পরায় যে পরিস্থিতির বর্তমানে উদ্ভব হয়েছে তাতে করে এখন একমাত্র আমাদের পরস্পরের খোলাখুলি আলোচনা ছাড়া মীমাংসার আর কোন পথই দেখতে পাচ্ছি না। তাই বলছিলাম—

সৌমিত্র আবার অধৈর্য কণ্ঠে বলে ওঠে, কিসের মীমাংসা? আমি হলফ করে বলতে পারি কেউ আমাদের মধ্যে সৌরেশ ও শিশিরকে বিষ খাইয়ে হত্যা করিনি। It is simply absurd, পাগলের প্রলাপোক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। ছিঃ ছিঃ, কি জঘন্য!

তবু—তবু আমরা পুলিসের নজরবন্দী, সন্দেহের তালিকাভুক্ত। গম্ভীর, কঠিন স্বরে হিরণ্ময় বলে।

হিরু ঠিকই বলেছে, অজিতা বলে, সন্দেহের কালো মেঘ যখন আমাদের ওপরে ছায়া ফেলেছেই প্রতিকার একটা তার করতেই হবে আমাদের। হ্যাঁ, এ সন্দেহ থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

বেশ, তবে এক কাজ কর সবাই।

কি বল?

আমি বলছিলাম অজিতা, হিরণ্ময় ও অনিল সকলেরই মত যখন তাই, আমরা সকলেই আলাদা আলাদা করে এক-একটা নিজস্ব অর্থাৎ ব্যক্তিগত জবানবন্দী লিখে একত্রে কিরীটীবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?

প্রস্তাবটা করলে সুজিত কর।

চমৎকার আইডিয়া। হিরণ্ময় সুজিতকে সমর্থন করে বলে ওঠে।

দেখা গেল সুজিতের প্রস্তাবে কারোরই অমত নেই, এমন কি সকলেই যেন এতে অনেকটা স্বস্তিবোধও করে। কারণ মুখোমুখি কথা বলার চাইতে এ অনেকটা ভাল।

ঠিক হল বাড়ি গিয়েই সকলে রাত্রে যে যার জবানবন্দি লিখে খামে ভরে খামের মুখ এঁটে পরের দিন সকালে হিরণ্ময়ের হাতে দেবে। হিরণ্ময় খাম-গুলো একত্রে নিয়ে গিয়ে কিরীটীবাবুকে দিয়ে আসবে।

রাত্রি বারোটা।

হিরণ্ময় একাকী তার শয়নকক্ষে রাইটিং টেবিলের সামনে বসে রাইটিং প্যাডের ওপরে একমনে লিখে চলেছে তার জবানবন্দি ঃ

কিরীটী,

আমি স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে আমার এই জবানবন্দি লিখছি, আমি হিরণ্ময় চৌধুরী যতটুকু সৌরেশ ও শিশিরের মৃত্যু সম্পর্কে জানি অকপটে জানাচ্ছি। তোমায় জানিয়েছি, 'নন্‌সেন্স ক্লাবে'র গোড়াপত্তনের বহুদিন আগে থেকেই আমার, সৌরেশ, অনিল ও সৌমিত্রের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। সৌরেশের বন্ধু ছিল চিত্রপরিচালক ভবানী রায়—আমাদের ডাঃ অজিতার স্বামী। আবার ভবানীর বন্ধু ছিল সৌমিত্র ও শিশির। ক্রমে আমাদের সকলেরই পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়। এবং আমরা সকলে মিলে 'ননসেন্স ক্লাব'টি গড়ে তুলি। একটা কথা কি জান, মনের দিক দিয়ে এক জায়গায় আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা অদ্ভুত যেন মিল ছিল, এবং সেটা হচ্ছে আমরা সকলেই ছিলাম বেশ কিছুটা বোহিমিয়ান টাইপের। কিছুটা বেপরোয়া, ভাবনা-চিন্তাহীন। আমাদের পরস্পরের অন্তরঙ্গতা ও সৌহৃদ্য জমে ওঠবার সেটাই হয়তো মুখ্য কারণ ছিল। যাক, যা বলছিলাম। একটা কথা আজ তোমার কাছে অস্বীকার করতে পারব না ভাই—অবশ্য এটা একান্তভাবেই আমার ব্যক্তিগত অভিমত যে, যখনই পুরুষ বন্ধুদের মধ্যে কোন নারীর পদার্পণ ঘটেছে বন্ধুত্বের সহজ সাবলীলতা যেন হঠাৎ একটা ঘূর্ণি রচনা করেছে। আমার মতে আমাদের মধ্যেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মালবিকা সম্পর্কে আমার নিজস্ব (?) একটা ধারণা আছে। অন্যান্য সকলে—মানে আমার অন্যান্য বন্ধুরা যে যাই ভাবুক, আমি তাকে মনে মনে কোনও দিনই যেন ঠিক সহজভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। তার অর্থাৎ মালবিকার সহজ সৌজন্যতা, শিক্ষা ও সুসংস্কৃত মনোবৃত্তি সব কিছুকে ছাপিয়ে অতি সূক্ষ্মভাবে তার মনের মধ্যে কেন যেন আমার বরাবর মনে হয়েছে (অবিশ্যি আমার ভুলও হতে পারে), একটা idiotic vanity আছে। এবং সেটা হচ্ছে তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা পুরুষমাত্রেই তার প্রতি আকৃষ্ট হবে, অথচ আমার তো মনে হয়

সত্যিকারের পুরুষমনোভাবাপন্ন যে পুরুষ এমন কেউই মালবিকার মত মেয়েকে সত্যিকারের ভালবাসতে পারে না। একথা অবিশ্যি ঠিক, পুরুষ-মাত্রেই নারীর দেহকে আকাঙ্ক্ষা করে সত্য, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা ও ভালবাসার মধ্যে অনেকটা ফাঁক আছে। তবু একটা কথা আজ অস্বীকার করব না, আমিও একদিন প্রেম নিবেদন করে মালবিকাকে পত্র দিয়েছিলাম। কিন্তু পত্র দেবার পরই ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে নিজের কাছে যেন নিজেরই মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল এবং ক্ষণেকের সেই ভ্রান্তির জন্য আজও আমার লজ্জার অবধি নেই।

এমন কি আজ যখনই ঐ ক্ষণিকের মোহের বশে ঐভাবে মালবিকাকে চিঠি লেখার কথাটা মনে হয়, মর্মান্তিক এক লজ্জার পীড়া যেন অনুভব করি – এমন কি ঐ ভাবে চিঠিতে তার কাছে সেদিন প্রেম নিবেদন করবার পর কত-দিন এ কথাও ভেবেছি, মালবিকার কাছে আর একটা চিঠি লিখে ক্ষমাভিক্ষা চেয়ে নেব, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে, এতদিন পরে আবার ও সম্পর্কে চিঠি লিখলে মালবিকা হয়তো মনে মনে ভাববে সে আমার পত্রের কোন জবাব দেয়নি বলেই বুঝি লজ্জায় পড়ে এবং দ্রাক্ষা ফল অম্ল এই নীতিকে মেনে নিয়ে নিজের দুর্বলতার সাফাই গাইছি। সে আরও লজ্জা—তাই চিঠি লিখব লিখব করেও আর দ্বিতীয় পত্র তাকে আজ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। মনে মনে সে আমার সম্পর্কে কি ভেবে রেখেছে তা সে-ই জানে। জানবার আজ আর কোন স্পৃহাও আমার নেই। কারণ আমার দিক থেকে আমি সম্পূর্ণভাবেই আত্মসচেতন ও নিষ্পাপ। ভুল মানুষের জীবনে ঘটেই, আমারও একদিন ঘটেছিল, এবং সেকথা জানাতে আজ বিন্দুমাত্রও আমার লজ্জাবোধ নেই কারণ ক্ষণিকের ভুলে যে পদস্খলন আমার ঘটেছিল, যে মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল; অল্পক্ষণের জন্যে হলেও তা থেকে আমি আজ সম্পূর্ণ মুক্ত। আর ক্ষণিকের হলেও সেটা আমার ভুল বা মোহ, তাই তোমায় কথাটা অসংকোচে জানালাম। এই গেল মালবিকার সম্পর্কে আমার কথা। এবং আর আর বান্ধবী, অর্থাৎ কমলা ও অজিতা—অজিতাকে কোনদিন আমার নারী বলেই মনে হয়নি, বরং আমাদেরই একজন বলে সর্বদা মনে হয়েছে। কমলা মাত্র বছর দুয়েক আমাদের ক্লাবে আসছে এবং জানি আমাদেরই বন্ধুদের মধ্যে একজনকে সে ভালবাসে এবং যতদূর মনে হয় কমলাও তাকে ভালবাসত জেনেই কমলা সম্পর্কে মনের মধ্যে আমার কোথাও সামান্যতম দুর্বলতাও জাগেনি। অন্যান্য বন্ধুদের কমলা সম্পর্কে মনোভাবটা (আমার মতে) স্পষ্ট না হলেও মালবিকা সম্পর্কে আশ্চর্যভাবে যে তাদের প্রায় সকলেরই—একমাত্র ভবানী ছাড়া—দুর্বলতা ছিল, কথায়বার্তায় না হলেও হাবেভাবে সেটা অনেক সময় যেন বেশ স্পষ্ট হয়েই উঠত। তবে ও-সম্পর্কে আমাদের পুরুষবন্ধুদের মধ্যে পরস্পরের কোন আলোচনাই কোনদিন হয়নি আজ পর্যন্ত। মালবিকার সঙ্গে হয়েছে কিনা তাও জানি না, আমারই মতো তারা কেউ কখনও তাকে পত্র লিখেছে কিনা

তাও অবিশ্যি জানি না। একটা কথা এখানে অবান্তর হলেও বলে রাখি, চিরদিনই আমার মনটা একটু সন্দিগ্ধ প্রকৃতির। মালবিকাকে আমি সন্দেহ করি—খুনী হিসাবে নয়, ওর ওই idiotic vanityর জন্যে, কারণ ওই ধরনের ভ্যানিটি যে সব মেয়েদের মনে থাকে—আমার মতে,—তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত জীবনে unsuccessful হয় এবং ক্রমশঃ তাদের মনে একটা বিচিত্র complex-এর সৃষ্টি হয় যে complex-এর জন্যেই তারা অন্যের সুখের সংসারে আগুন ধরিয়ে দেয়। ইচ্ছে করে অবশ্য নয়, নিছক ঐ complex-এর তাড়নাতেই। ক্ষুধার্ত মন তাদের—এমন একটা সময় আসে যখন যা হাতের কাছে পায়, তার ভালমন্দ ফলাফলটা বিচার না করেই গরুর মত গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করে। তবু বলতে সংকোচ নেই আমার, মালবিকাকে মনে মনে আজও আমি শ্রদ্ধা করি। তা যদি না করতাম, কোনদিন হয়ত আমার সেই ভুল ভাঙবার পর তাকে এ জীবনে ক্ষমা করতে তো পারতামই না, সহ্য করতেও পারতাম কিনা সন্দেহ। কিন্তু থাক সে-সব কথা। এবার আসল বক্তব্যে আসি।

অনিলের জন্মতিথি উৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা যে রাত্রে অনিলের গৃহে মিলিত হই, সেই রাত্রের কথাই বলব। রাত্রে সকলে মিলে গান-বাজনা যখন হচ্ছিল তখন সেই গান-বাজনার আসর থেকে শিশিরকে একবার আমি উঠে যেতে দেখেছি এবং সুজিতকেও একবার উঠে যেতে দেখেছিলাম। তারপর আহারে বসবার কিছুক্ষণ পূর্বে কমলা একবার রান্নাঘরের দিকে গিয়েছিল মনে পড়ছে যেন। অবশ্য গৃহকর্তা অনিল দু-চারবার আসর থেকে উঠে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে এসেছে। শিশির, সুজিত ও কমলা গানের আসর ছেড়ে ঘরের বাইরে গিয়েছে বটে কিন্তু বাইরে কোথায় কি জন্যে তারা গিয়েছে, কেন গিয়েছে, ও সম্পর্কে কোন কিছুই তোমাকে আমি বলতে পারব না, কারণ ও সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না। আহারের সময় সৌরেশের এক পাশে আমি ছিলাম, অন্য পাশে ছিল শিশির সে কথা তোমাকে আগেই জানিয়েছি। ঘটনার পরিস্থিতিকে নিয়ে আলোচনা করলে স্বভাবতঃই সকলের মনে একটা কথার উদয় হবে, সৌরেশের মৃত্যুর ব্যাপারে কোন বাইরের লোক নয়, আমরাই বন্ধু ও বান্ধবীদের মধ্যে কেউ-না-কেউ একজন দায়ী এবং যে কথাটা অস্বীকার করা যাচ্ছে না। তবু কেন যেন ভাই আমার মনে হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কারও পক্ষেই ঐরূপ নৃশংসভাবে আমাদেরই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হত্যা করাটা যেন সম্ভবপর নয়। প্রথমে ধর, যে দুজন আমরা সে রাত্রে সৌরেশের দুপাশে ছিলাম—আমি ও শিশির। আমি জানি, আমি হত্যা করিনি সৌরেশকে। শিশির একটু বদমেজাজী চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতির হলেও তাকে এত নীচ ও জঘন্য চরিত্রের মনে করতে পারছি না। সব চাইতে একটা বড় কথা সৌরেশকে হত্যা আমি বা শিশির করতে যাবই বা কেন? কিই-বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে আমাদের সৌরেশকে হত্যা করবার? আমাদের দুজনের কথা বাদ দিলে থাকে

ভবানী, সুজিত, বিনয়, কমলা, অজিতা ও মালবিকা। ওদেরও কারও কোন সৌরেশকে হত্যা করবার কারণ থাকতে পারে বলেও তো আমার মনে হয় না। তারপর ধর শিশিরের মৃত্যু। সৌরেশ নিহত হবার পরের দিন সকালের দিকে একবার মাত্র দেখা হয়েছিল শিশিরের সঙ্গে। এবং সেইদিন সকালে শিশিরের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার ব্যাপারটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই সেটা বিশেষ ভাবেই আমায় উল্লেখ করতে হচ্ছে। সকাল তখন প্রায় বেলা দশটা হবে, সৌরেশের ব্যাপারে মনটা খুব বিষণ্ণ হয়ে ছিল বলে ঘরের মধ্যেই বসে ছিলাম। শিশির এসে কক্ষে প্রবেশ করল। অসুস্থ থাকার জন্যে দীর্ঘকাল রঙ্গমঞ্চেও অনুপস্থিত থাকার পর আবার সে সুজিতের নাটক 'জনতার'র প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। রিহার্সেল নিয়ে কিছুদিন যাবৎ খুব ব্যস্ত ছিল বলে—বিশেষ ইদানীং—একটা দেখা-সাক্ষাৎ হত না ওর সঙ্গে।

শিশিরের চেহারার দিকে চেয়ে কিন্তু চমকে উঠলাম। এক দিন ও এক রাত্রের মধ্যেই তার দেহ ও মনের ওপর দিয়ে যেন একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গিয়েছে বলে মনে হল।

চোখের কোলে পড়েছে কালি, মাথার চুল উস্কখুস্ক।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম, শিশির! কি রে, ব্যাপার কি? এ কি তোর চেহারা হয়েছে? অসুখবিসুখ হয়নি তো?

সৌরেশের মৃত্যুর কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না হিরু। একটা ছায়ার মতই যেন সে সর্বক্ষণ আমাকে তাড়া করে ফিরছে!

কি যা-তা বলছিস তুই শিশির! তোকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে। কাল সারারাত বুঝি রিহার্সেল দিয়েছিস? ঘুমোসনি? এক কাপ চা খাবি?

না, শোন্। অনেক রাত্রে কাল থিয়েটার থেকে রিহার্সেল দিয়ে ফিরছিলাম—এও জানি হিরু, তুই আমার কথা বিশ্বাস করবি না, কিন্তু আমি তোর গা ছুঁয়ে শপথ করে বলছি হিরু—Believe me, বিশ্বাস কর, আমি—আমি তাকে স্পষ্ট দেখেছি।

কি বলছিস তুই শিশির! কাকে? কাকে? কাকে দেখেছিস?

সৌরেশকে। হ্যাঁ, আমি দেখেছি তাকে। তার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই রূপ নিয়ে আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

কিরীটী, তোমাকে এখানে একটা কথা শিশির সম্পর্কে বলা প্রয়োজন। পর-লোক ও পরলোক-তত্ত্ব নিয়ে ইদানীং শিশির খুব বেশী পড়াশুনা করত। এবং প্রায়ই সে বলত, আমাদের এই দশজন বন্ধুদের মধ্যে যে-ই আগে মারা যাক, সে যেন বাকি বন্ধুদের দেখা দেয়, অন্ততঃ আর কেউ দেখা না দিলেও সে দেবে—সকলকেই একথা সে প্রায়ই বলত। তার বন্ধুত্ব ও বন্ধুপ্রীতি যে সামান্য নয়, মৃত্যুর পরেও সে কথা প্রমাণ করে দেবে। তার বন্ধুপ্রীতির মধ্যে সত্যির যদি কোন ফাঁকি না থেকে থাকে, মৃত্যুর পর সে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন বন্ধুদের সে দেখা দেবেই, কেউ যেন তাকে দেখে না ভয় পায়

কারণ মৃত্যুর পরও সে তাদের বন্ধুই তো থাকবে। যা হোক, আমি বললাম, পরলোক-তত্ত্ব নিয়ে বুঝি ইদানীং বেশী করে মাথা ঘামাচ্ছিস, শিশির ?

কাতর মিনতিভরা কণ্ঠে শিশির বলে ওঠে, ঠাট্টা করিস নে ভাই। আমার কথা বিশ্বাস কর্, তাকে আমি দেখেছি। হাঁটতে হাঁটতে থিয়েটার থেকে বের হয়ে সোজা আমি স্ট্র্যাণ্ড রোডে গঙ্গার ধারে চলে গিয়েছিলাম। রাত তখন গোটা বারো সাড়ে বারো হবে। নির্জন রাস্তা, দূরে চৌরঙ্গীর আলোকমালা দেখা যায়। স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে হাঁটছি।

প্রশ্ন করলাম, অত রাত্রে আবার স্ট্র্যাণ্ড রোডে গিয়েছিলি কেন ?

তাতে সে জবাব দিলে, ইচ্ছা করে তো যাইনি ভাই। একটা অদৃশ্য শক্তি যেন থিয়েটার থেকে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে রিহার্সেল দিয়ে বের হবার পর ওই দিকেই আমাকে টেনে নিয়ে চলছিল। আমি স্পষ্ট অনুভব করেছি a tremendous force was pushing me ahead and ahead! একটা হাতছানি যেন আমায় ডাকছিল, আয়! আয়! আয়!

একটু থেমে আবার শিশির বলতে লাগল। আকাশে মেঘ করেছিল। চারিদিকের নির্জনতা কেমন যেন মধ্যরাত্রির অন্ধকারে থমথম করছিল। হঠাৎ সামনের অন্ধকারে দেখলাম—অস্পষ্ট একটা জ্যোতি, ঘষা কাঁচের আড়াল থেকে আলো যেমন চাপা একটা দ্যুতি মাত্র বিকীর্ণ করে, ঠিক তেমনি একটা অস্পষ্ট কুয়াশার মত কি যেন আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। সহসা অদ্ভুত একটা ঠাণ্ডা হাওয়া যেন চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে বলে মনে হল। আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। কুয়াশার মত অস্পষ্ট সেই জিনিসটা ক্রমে একটু একটু করে যেন আমার চোখের সামনে আকার নিতে লাগল। আকার নিতে লাগল আমারই চোখের সামনে, আমার পরিপূর্ণ দৃষ্টির সামনে। ঠিক অবিকল সেই মূর্তি! অবিকল—হুবহু। সৌরেশ! এখনও ভাবলে সর্বাঙ্গ আমার রোমাঞ্চিত হচ্ছে। নির্বাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্থাণুর মতই সেই অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

তারপর ? রুদ্ধনিশ্বাসে প্রশ্ন করলাম।

তারপর সেই মূর্তি যেন অস্পষ্টভাবে কি আমায় বলতে চাইলে। চিৎকার করে বললাম, যদি সত্যিই তুই সৌরেশ আমাদের বন্ধু হোস, তবে কথা বল্—সাড়া দে ভাই!

মূর্তি আবার যেন কি বললে, কিছু বুঝতে পারলাম না। আবার চিৎকার করে উঠলাম, সৌরেশ! সত্যিই কি ভাই তুই এসেছিস ? যদি তাই হয় ভাই, তবে কথা বল্! সত্যি করে বল্, কে তোকে মারলে ? আমাদের মধ্যেই কি কেউ ? আমরাই কি তোকে কেউ হত্যা করেছি ভাই ? বল্—বল্, জবাব দে ভাই—জবাব দে।

ছায়ামূর্তি এবারেও কি যেন অস্পষ্টভাবে বলল। কেবল ক্ষীণ একটা কথা বুঝতে পারলাম, বিষ! তারপর যেন বললে, শিশির, সাবধান!

বাকি কথাটা আর শুনতে পেলাম না। সহসা মনে হল ছায়ামূর্তি যেন ক্রমে তরল হয়ে বায়ুর মতই গলে গলে একটু একটু করে বায়ুতরঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে।

চিৎকার করে উঠলাম আবার, সৌরেশ—সৌরেশ, দাঁড়া—দাঁড়া!

একটা হিমের মত ঠাণ্ডা হাওয়া যেন সহসা আমার সর্বাঙ্গে একটা ঝাপটা দিয়ে বয়ে গেল।

তারপর—তারপর আর আমার মনে নেই।

জ্ঞান ফিরে এলে দেখি রাস্তার ওপরে পড়ে আছি। বুঝলাম জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।

যাক, বাড়ি ফিরে এলাম রাত প্রায় চারটের সময়। সকাল সাড়ে নটা পর্যন্ত ব্যাপারটা কেবল ভেবেছি। শেষে মনে হল তোকেই সবার আগে জানাব, তারপর প্রয়োজন হলে অন্যসব বন্ধুদেরও ননসেন্স ক্লাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে কথাটা একদিন বলব।

আমি বললাম, এখন এসব কথা কাউকে বলে প্রয়োজন নেই। পরে ভেবে-চিন্তে যা হয় করা যাবে।

কিরীটী, পরে আমি আর শিশির ঠিক করেছিলাম গত পরশু থিয়েটারের পর আমরা যখন তোমাকে কেন্দ্র করে সৌরেশের মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করব তখন ঐ কথাগুলো সকলকে বলা হবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, তার আগেই হতভাগ্য শিশিরকে মৃত্যুবরণ করতে হল।

এখন কি মনে হচ্ছে জান? সৌরেশের আত্মা বোধ হয় শিশিরকে সত্যি সত্যিই সাবধান করতেই এসেছিল এবং একথাও বলে গিয়েছে সে যে, বিষ-প্রয়োগেই তার মৃত্যু ঘটেছে।

ব্যাপারটায় প্রথমে তত গুরুত্ব আরোপ করিনি, কিন্তু শিশিরের আকস্মিকভাবে বিষ-প্রয়োগে মৃত্যুর পর কথাগুলো মনের মধ্যে এসে কেবলই ভিড় করছে।

যদিচ আগাগোড়া সমগ্র ব্যাপারটার মধ্যে একটা অবিশ্বাসের ধোঁয়া জড়িয়ে আছে তথাপি কথাগুলো তোমায় না জানিয়ে পারলাম না।

এবং যদিচ প্রেতাত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে আজও মনের মধ্যে আমার কোন বিশ্বাসই নেই এবং মৃত্যুর পর প্রেতলোকে বায়বীয় দেহধারী কোন আত্মার অস্তিত্ব সত্যিই আছে কিনা সে সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহ আমার আছে, তথাপি কেন যেন মনে হচ্ছে, বিশ্বাস অবিশ্বাসের গণ্ডিটা পার হয়ে মানুষের বোধ-শক্তিকে ডিঙিয়ে, তর্কের বাইরে এমন অনেক কিছুই হয়ত আছে, স্থূলভাবে যাকে ধরা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, দেখাও হয়ত যায় না। তবে এও মনে হয়, আত্মা যদি সত্যিই অবিনশ্বর, গীতার শ্লোকে যে বলেছে, আত্মার মৃত্যু নেই বা বাসাংসি জীর্ণানি, কেবল পরিত্যাগ মাত্র, তাহলে আত্মার আবির্ভাব ব্যাপারটা একেবারেই হয়ত অসম্ভব নাও হতে পারে।

শিশির চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তুমি আমার ওখানে এসেছিলে।

বলাই বাহুল্য, তারপর আর শিশিরের সঙ্গে আমার কোন কথাবার্তাই হয়নি। দেখাও হয়নি।

আর একটা কথা, নন্‌সেন্স ক্লাব থেকে আমাদের দশজন বন্ধুর প্রতীক দশটি পাথরের বানরের মূর্তি থেকে দুটির অন্তর্ধান সম্পর্কে আমি এখনও অন্ধকারেই আছি। ব্যাপারটা এখনও যেন কেমন আমার অদ্ভুত বিচিত্র এবং গোলমেলে ঠেকছে।

ঐ সঙ্গে আরও একটা কথা মনে পড়ছে, আমাদের নন্‌সেন্স ক্লাবের সভ্য ও সভ্যাদের কাছে ছাড়া অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির কাছেই যখন দরজার তালার চাবি ছিল না, তখন আমাদের মধ্যে কোন একজন ছাড়া আর কারও পক্ষে ক্লাব-ঘর থেকে মূর্তি অপসারণের ক্ষমতা বা সম্ভাবনা কি করেই বা থাকতে পারে!

এখন মনে হচ্ছে সত্য কথা বলতে কি, আমাদের মধ্যেই হয়ত নিশ্চয়ই কেউ একজন দুটি বন্ধুকে আমরা হত্যা করেছি।

মর্মান্তিক ও দুঃসহনীয় লজ্জা ও কলঙ্কের ব্যাপার সেটা হলেও মন বলছে তাই—তাই। আবার ভাই অনুরোধ জানাচ্ছি, তুমি খুঁজে বের করে দাও। বলে দাও ভাই আমাদের মধ্যে কে হত্যাকারী? কে—কে? ইতি—

হিরণ্ময়

নয়

নিজের জবানবন্দি লিখছিল ঔপন্যাসিক সুজিত কর নিজের শয়নকক্ষে, শয্যার উপরে শুয়ে শুয়ে একটা রাইটিং প্যাডের ওপরে।

ঘরের বৈদ্যুতিক বাতিটা নিভানো। শিয়রের সামনে ছোট্ট টেবিলটার উপরে জ্বলছে একটা মোমবাতি। একটা প্রজাপতি মোমবাতির শিখাটার চারপাশে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

সুজিত কর লিখছিল ঃ

জীবনে ভাবতে পারিনি কোনদিন, অন্তরঙ্গ প্রিয়তম দুটি বন্ধুর হত্যার অপরাধে দশের সামনে দাঁড়িয়ে এমনি করে একদিন সত্য ও মিথ্যাকে যাচাই করবার জন্যে জবানবন্দি লিখতে হবে।

লজ্জা! এর চাইতে বেশী লজ্জা, অপমান বা মর্মবেদনা আর কি কিছু হতে পারে!

এই কি প্রীতি! এই কি ভালবাসা! এই কি স্নেহ!

মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা, সৌহৃদ্য বা প্রীতির বন্ধন স্বার্থের মানদন্ডে চাপালে কি এমনি করেই সবটুকু ফাঁকি তার ধরা পড়বে চিরদিন!

ভাবতে পারছি না—সত্যিই ভাবতে পারছি না, বন্ধুর হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত আমি আজ! সন্দেহের কালো রাহু এতদিনের বন্ধুত্ব ও প্রীতির গৌরবকে পূর্ণগ্রাস করেছে। চন্দ্র বা সূর্যকে রাহুর গ্রাস থেকে মুক্ত করে

—শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন আশীর্বাদ । কিন্তু আমি ! এ কালো রাহুর হাত থেকে মুক্তির তো কোন পথই দেখতে পাচ্ছি না ।

কি ভয়ংকর – কি ভয়ংকর ! বন্ধু হয়ে বন্ধুকে হত্যা করেছি ! একটি নয় দু -দুটিকে, তীব্র বিষপ্রয়োগে । সত্যিই কি হত্যা করেছি ! সত্যিই কি এই হাত দুটি বন্ধু-হত্যার রক্তে কলঙ্কিত করেছি !

না, না—করিনি । তোমরা বিশ্বাস কর । বিশ্বাস কর ।

কিন্তু কে বিশ্বাস করবে আজ আমার কথা !

কেউ না । কেউ না । সবাই আঙুল তুলে দেখাচ্ছে আমার দিকে– ঐ হত্যা-কারী, বন্ধুর হত্যাকারী !

ভাই সৌরেশ ! ভাই শিশির !

তোমরা তো জান, তোমাদের আমি হত্যা করিনি ।

তৃষ্ণার পানীয়ের মধ্যে তীব্র হলাহল, কালকূট মিশিয়ে দিইনি !

শিশির তুমি তো বলতে মৃত্যুর পর যেখানেই তুমি থাক না কেন, ডাকলেই সাড়া দেবে—এস ভাই, তোমায় আমি ডাকছি এস ! একবার এসে বলে যাও—বলে যাও ভাই । সকলকে বলে যাও—এ মিথ্যা, এ মিথ্যা, এ মিথ্যা ।

আমরা জানি, পৃথিবীও জানুক, এ মিথ্যা—এ মিথ্যা ।

* * *

কিরীটীবাবু, আপনাকে আমি ভাল করে চিনিও না, তবে নাম আপনার শুনেছি, ক্রাইম-ঘটিত ব্যাপারে আপনি বহুবার অসাধ্যসাধন করেছেন এও শুনেছি, সকলেরই যখন মত হয়েছে প্রত্যেককে প্রত্যেকের জবানবন্দি পৃথক পৃথক ভাবে পেশ করতে হবে, আমারটাও আমি দিতে বাধ্য । হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেব, আমার যতটুকু বলবার গোপন কিছুই করব না, অকপটে সব– সব বলব ।

বিশ্বাস করা-না-করা অবশ্য আপনার বিচার ও যুক্তি ।

এক্ষেত্রে যদি সাফাই গেয়ে বলিই সৌরেশ বা শিশির দুজনের একজনকেও আমি হত্যা করিনি, তার মূল্যই বা কি আছে ? বিশেষ করে অকাট্যভাবেই দৃঢ়কণ্ঠে যখন আপনি আমাদের সকলের সামনেই জানিয়ে গেলেন, শিশির ও সৌরেশের হত্যার জন্যে আমরা—বন্ধুরাই দায়ী !

আমাদের বাকি ন'জনের মধ্যেই একজন দুটি বন্ধুর হত্যাপরাধে অপরাধী— হত্যাকারী, Murderer ! কথাটা সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস্য বা অসত্য যে নয় সে কথা বেশ ভালভাবে আপনি জানেন বলেই বা কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পেয়েছেন বলেই না কথাটা ঐভাবে জোরের সঙ্গে বলে যেতে পেরেছেন ! এখন মনে হচ্ছে হয়ত আপনার কথা মিথ্যা নয়—মিথ্যা নয় ।

সত্যিই, হয়ত আমাদের মধ্যেই কেউ একজন শিশির ও সৌরেশের হত্যার জন্যে সত্য সত্যই দায়ী ।

* * *

সুজিত এই পর্যন্ত লিখেছে হঠাৎ এমন সময় মনে হল কে যেন ঠিক তার পাশেই বড় রকমের একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল।

ক্ষণেকের জন্যে মোমবাতির শিখাটা যেন কেঁপে উঠল।

স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে সুজিত নিঃশ্বাসের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গেই ও নিজের অজ্ঞাতেই যেন চমকে মুখ তুলে পাশে তাকালে।

কই, কেউ তো নেই—আশেপাশে কেউ তো নেই!

শূন্য ঘর। একাকী সে শুয়ে শুয়ে জবানবন্দিটা লিখছে।

তারপরই মনে হল, আশ্চর্য—আশ্চর্য! কে যেন এই ঘরের মধ্যে এসেছে। নিঃশব্দে তার শয্যার একেবারে পাশ ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে।

মোমবাতির মৃদু আলোয় সমগ্র কক্ষখানি জুড়ে অদ্ভুত একটা আলোছায়া যেন রচনা করেছে।

আবার শুনতে পেল সুজিত তেমনি একটা দীর্ঘশ্বাস। এবারে আরও স্পষ্ট।

কে? কে? কে?

আবার তাকাল সুজিত কক্ষের চতুস্পার্শে।

কেউ—কেউ তো নেই! তবে?

অথচ সে দু-দুবার স্পষ্ট দীর্ঘশ্বাস পড়তে শুনেছে।

মোমবাতির শিখাটা আবার কেঁপে উঠল এবং সহসা দপ করে যেন একটা হিম শীতল হাওয়ার ঝাপ্‌টা লেগে নিভে গেল—ঘরের একটিমাত্র আলো সেই মামবাতিটা। নিশ্ছিদ্র আঁধারে মুহূর্তে সমস্ত কক্ষখানি যেন জমাট বেঁধে উঠল।

হ্যাঁ, কোন ভুল নেই। নিশ্চয়ই কেউ ঘরের মধ্যে এই মুহূর্তে এসেছে ঠাণ্ডা হাওয়ায়।

সমস্ত ঘরটাই যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে।

মনে হয় সত্যি যেন কেউ এসে দাঁড়াল ঠিক তার পাশটিতে।

আপনা থেকেই চক্ষু দুটি বুজিয়ে নেয় সুজিত।

কেউ তার পাশে দাঁড়িয়ে, বায়ুর মত হালকা—আলোর মত স্বচ্ছ। স্পষ্ট অনুভব করছে সুজিত, তবু—তবু যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে, স্পর্শাতীত।

একটা অশরীরী, শীতল, বায়বীয় উপস্থিতি, যাকে ওর সমগ্র চেতনা ও অনুভূতি দিয়ে অনুভব করছে. অন্ধকার কক্ষমধ্যে যেন তারই আশেপাশে কোথাও এসে দাঁড়িয়েছে।

তার শ্বাস প্রশ্বাসের ক্ষীণ শব্দও শুনতে পাচ্ছে।

কে? কে তুমি? তুমি যে-ই হও আমি তোমাকে অনুনয় করছি, কুয়াশার মত অস্পষ্ট, ধরা ছোঁয়ার বাইরে না থেকে আমার দৃষ্টির সামনে নিজেকে পরিস্ফুট কর।

মনে মনে অনুচ্চারিত ভাবে কথাগুলো বলে সুজিত।

ঠিক সেই মুহূর্তে—আশ্চর্য, ঘষা কাচের অন্তরাল থেকে অস্পষ্ট আলোয় আভা যেমন বোঝা যায় ঠিক তেমনি কি যেন একটা বস্তু ধীরে ধীরে সুজিতের চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

আকার নিচ্ছে। হ্যাঁ। ধীরে ধীরে তরল আব্ছা সেই দ্যুতি যেন সুস্পষ্ট একটা আকার নিচ্ছে। ধীরে ধীরে—একটু একটু করে।

সুজিত! বহুদূর থেকে যেন অস্পষ্ট একটা অনৈসর্গিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল!

আবার শোনা গেল কণ্ঠস্বর—সুজিত! আমায় চিনতে পারছ না বন্ধু! বিষ! বিষ!

কে—কে তুমি? এবারে আর্ত চাপা কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে সুজিত।

সাবধান!

পরক্ষণেই যেন একটা ঠাণ্ডা হিমশীতল হাওয়ার ঝাপটা সুজিতকে ঠেলে খোলা জানলাপথে বের হয়ে গেল।

চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে খাট থেকে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেল সুজিত।

* * *

জ্ঞান ফিরে দেখলে শয্যার ওপরে ও শুয়ে, মা তারমাথার কাছে বসে চোখে-মুখে জল দিচ্ছেন।

চোখ মেলে তাকাল সুজিত।

এখন কি একটু সুস্থ বোধ করছিস বাবা?

মা!

একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর্ বাবা।

সে চলে গেছে মা?

কে? কে চলে গেছে?

সে যে এসেছিল!

কে আবার এসেছিল? ঘুমোবার চেষ্টা কর দেখি। কেবল রাত জেগে লিখবি—মানুষের শরীর তো!

ক্লান্তিভরে সুজিত পাশ ফিরে শোয়।

মাথাটা যেন লোহার মত ভারী।

চোখ বুজে পড়ে থাকে সুজিত নিঃশব্দে।

* * *

পরের দিন ভোরবেলা।

সুজিত তার অর্ধসমাপ্ত জবানবন্দিটা আবার লিখছে:

সৌরেশ আর শিশির যে আমাদের মধ্যে নেই একথা যেন এখনও বিশ্বাস করতে মন চায় না। এখনও যেন মনে হয় 'নন্সেন্স ক্লাবে' গেলেই বুঝি ওদের দুজনের সঙ্গে দেখা হবে।

সৌরেশের আকস্মিক মৃত্যুতে আমি সত্যিই যেন বোবা হয়ে গিয়েছি। তার

মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করে পাকস্থলীর মধ্যে তীব্র হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষ নাকি পাওয়া গিয়েছে! নিশ্চয়ই জলপান করার সঙ্গে সঙ্গেই যখন তার মৃত্যু হল, সেই পানীয় জলের মধ্যেই ঐ বিষ কেউ মিশিয়ে দিয়েছিল!

কিন্তু কে দিল?

সৌরেশের সঙ্গে তো কারও শত্রুতা ছিল না।

সকলেই তো আমরা সৌরেশকে ভালবাসতাম। আমরা ছাড়া সে রাত্রে সেখানে অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তিই যখন উপস্থিত ছিল না, তখন আমাদেরই মধ্যে অবশ্য কেউ একজন তাকে বিষ দিয়ে হত্যা করেছি।

কে? হিরণ্ময়, শিশির, ভবানী, বিনয়, কমলা, অজিতা না মালবিকা?

আমি জানি আমি নয়।

তবে কে?

শিশিরও যখন একই ভাবে মৃত, তখন বোঝা যাচ্ছে শিশিরও নয়।

তবে কে?

আর কে-ই বা দিল আর কখনই বা ওর জলের গ্লাসে বিষ মেশানো হল?

আমি তো আগাগোড়াই যে ঘরে গান-বাজনা হচ্ছিল সেই ঘরেই ছিলাম, মাত্র একবার বাথরুমে গিয়েছিলাম। বাথরুম থেকে যখন ফিরে আসি হঠাৎ যেন মনে হয়েছিল কে একজন বারান্দা দিয়ে চট্ করে যে ঘরে আমাদের খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেই ঘরে ঢুকে গেল। পিছন থেকে ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি কে ঘরে গিয়ে ঢুকল। তাছাড়া ও ব্যাপারে মনোযোগ দেবার মত তখন তো কোন কারণও ছিল না। ফিরে এসে আবার হৈ-হট্টগোলের মধ্যে ভিড়ে যাওয়ার জন্য কারও দিকে আমার নজর দেবার মতও ফুরসুৎ হয়নি। আর কেউ ঘর ছেড়ে গিয়েছিল কিনা লক্ষ্যও করিনি।

তারপর শিশির!

সৌরেশের মৃত্যুর পরই শিশিরের মৃত্যুর বাপারটা এত দ্রুত, এত আকস্মিক —এখনও যেন ভাবতে পারছি না।

দীর্ঘদিন রঙ্গমঞ্চ থেকে অনুপস্থিত থাকবার পর আমার 'জনতা' উপন্যাসের নাট্যরূপে শিশির আমার নাটকের প্রধান চরিত্র অগ্নিবাণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সম্মত হয়েছিল—সে কেবল আমারই বিশেষ অনুরোধ না এড়াতে পেরে।

অদ্ভুত অভিনয়-প্রতিভা ছিল শিশিরের।

প্রথম নাটক আমার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবে আর তার প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে শিশিরের মত একজন অভিনেতা যার যশোপ্রভা ইতিমধ্যেই চতুর্দিকে সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল, যার আবির্ভাব নাট্যজগতে অভিনয়ের দিক থেকে একটা নূতনত্বের দাবি নিয়ে দর্শকসাধারণকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল, সেই শিশির নাটকের প্রধান ভূমিকায় পাদপ্রদীপের আলোয় এসে দাঁড়াবে—এ যে আমার কত বড় সৌভাগ্য ও আনন্দ তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না।

'জনতা'র রিহার্সেল শুরু হবার দিন থেকেই থিয়েটারে ও শিশিরের কাছে

আমি ঘন ঘন যেতাম।

নাটকের চরিত্রের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে প্রায়ই আমাদের মধ্যে আলোচনা হত। শিশিরের নিজের দিক থেকেও সে কি উৎসাহ, কি উদ্দীপনাই না অনুভব করেছি!

* * *

সৌরেশ ছিল শিশির ও অনিলের পরম বন্ধু।

আমরা সকলেই সকলের প্রিয় বন্ধু হলেও ওরা তিনজন, অনিল, সৌরেশ ও শিশির ছিল যেন অভিন্নহৃদয়।

সৌরেশের আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারটা শিশিরকে নিদারুণ আঘাত হেনেছিল। দেহের কোন একটু বিশেষ অংশে বৈদ্যুতিক তরঙ্গঘাতে যেমন সেই বিশেষ অঙ্গটি মুহূর্তের জন্যে অসাড় হয়ে যায়, সৌরেশের মৃত্যুও যেন শিশিরকে তেমনি অসাড় করে দিয়েছিল।

যে শিশিরকে আমরা কখনও একটি মুহূর্ত চুপ করে থাকতে দেখিনি, বাকপটু রহস্যপ্রিয় সদালাপী ও মিষ্টভাষী দেখেছি, সেই শিশিরই যেন সৌরেশের মৃত্যুতে হঠাৎ একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিল।

'জনতা' নাটকের গানের সুর সংযোজনা করেছিল সৌরেশ, শিশিরেরই একান্ত অনুরোধে।

কত বড় আশা নিয়েই না 'জনতা' নাটকটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পরিশ্রম করছিল শিশির।

রিহার্সেল শুরু হবার পরে শিশির প্রায়ই বলত, এত বড় যোগাযোগ জীবনে আমার কখনও আসবে কিনা জানি না আর। সুজিত লিখেছে নাটক, সৌরেশ দিয়েছে সুর—আমি করব অভিনয় প্রধান ভূমিকায়। আমাদের দেশে ভাল নাটক হয় না, ভাল অভিনয় হয় না, আমাদের রঙ্গমঞ্চের চিরদিনের এ আক্ষেপ এবারে 'জনতা' মুছে দেবে একেবারে দেখো তোমরা সবাই।

শুধু শিশির অনিল সৌরেশ নয়, প্রত্যেকেরই আমাদের ঐ বিশ্বাস মনে ছিল, তাই আমরা ঐ শুভ দিনটির আশায় ব্যাকুল প্রতীক্ষায় দিন গুনছি প্রত্যেকেই।

কিন্তু সহসা বিনামেঘে হল বজ্রাঘাত।

কোথা থেকে কি হয়ে গেল সৌরেশ বিষপ্রয়োগে নিহত হল।

শিশিরের মন ওই আঘাতে একেবারে ভেঙে যেন গুঁড়িয়ে গেল।

একদিন তো স্পষ্টই বললে, সৌরেশ আমার মনটা একেবারে ভেঙে দিয়ে গিয়েছে, মনে হচ্ছে কিছুই আর বুঝি হবে না। সত্যি বলছি, প্রাচীরপত্র না পড়লেও ম্যানেজারবাবু এই নাটকের পিছনে এত টাকা না খরচ করলে, বন্ধ করেই দিতাম এ নাটক। কিন্তু উপায় নেই, ভদ্রলোকের বহু লোকসান হয়ে যাবে। তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরে ভাল নাটকের অভাবে থিয়েটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক, আশা নিয়ে বসতবাটিটুকু পর্যন্ত বন্ধক দিয়ে এই 'জনতা' নাটক

মঞ্চস্থ করবার আয়োজন করেছেন। এ অবস্থায় নাটক বন্ধ হলে তাঁর পক্ষে এটা হবে চরম আঘাত।

* * *

অভিনয় আরম্ভ হবে সাড়ে তিনটেয়, দুটোর সময় শিশিরের ওখানে গেলাম। দেখি শিশিরের শোবার ঘরে দুটো সোফার উপরে মুখোমুখি বসে কমল আর শিশির গভীরভাবে কি আলোচনা করছে।

কিছুদিন ধরে শিশির ও কমলার মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতাটুকু কারোরই আমাদের নজর এড়ায়নি। তবে শিশির ও কমলার ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা যদিও সকলেরই আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছিল, কেউ আমরা এ সম্পর্কে কোন আলোচনা তো করিইনি, এমন কি ও সম্পর্কে শিশির বা কমলাকে কেউ আমরা কোনদিন প্রশ্নও করিনি।

তবে এটাও ঠিক, অজিতা ও ভবানীর মিলনানুষ্ঠানের মত আর একটি মিলনানুষ্ঠানের প্রতীক্ষায় ছিলাম আমরা সকলেই।

যাই হোক, শিশির ও কমলাকে ঘরের মধ্যে ঐ সময় নির্জনে আলোচনারত দেখে চট্ করে ঘরের মধ্যে সোজাসুজি গিয়ে প্রবেশ করতে কেমন যেন সংকোচ অনুভব করলাম।

গলার সাড়া দেব ভাবচি, হঠাৎ কমলার একটা কথা কানে এল। কমলা শিশিরকে বলছে, অভিনয় করতে করতে তুমি কি জীবনটাকেও রঙ্গমঞ্চ বলে মনে কর শিশির?

কথাটা কি একেবারে মিথ্যে, কমলা?

একেবারে মিথ্যে কিনা জানি না। তবে এটাও ঠিক জেনো, রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে সাজঘর বলে একটা ঘর আছে—

আমি তো তোমায় অনেকদিনই বলেছি কমলা, আমি অভিনেতা, সাধারণের সমাজ জীবন ও অভিনেতার সমাজ-জীবন এক নয়। তাছাড়া ও ধরনের মনোবৃত্তি—

থাক। কথা বাড়িয়ে লাভ হবে না। তোমারও অভিনয়ের সময় হয়ে এসেছে—but we must have an open discussion, খোলাখুলি একটা আলোচনার প্রয়োজন। আজ রাত্রে নন্‌সেন্স ক্লাবে আমাদের সকলের মিলিত হবার কথা, ফেরার পথে আমার বাড়িতে একবার আসবে কি?

চেষ্টা করব।

বেশ। তবে এখন উঠলাম।

চললে?

হ্যাঁ।

অভিনয় দেখতে যাবে না আজ?

নিশ্চয়ই যাব। তোমার অভিনয় দেখব না? অভিনেতা—এত বড় নামকরা অভিনেতা তুমি, বিশেষ করে তোমার আজকের—, বাকি কথাগুলো শেষ না

করেই কমলা ঘর থেকে বের হয়ে এল এবং কতকটা যেন ঝড়ের মতই মাথা নিচু করে, আমায় পাশ কাটিয়ে কোন দিকে দৃকপাত না করে সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

বুঝলাম, ও আমাকে দেখতেও পেল না।

একান্ত কৌতূহলের বশেই ওদের আলোচনায় কান না দিয়ে থাকতে পারিনি, মানুষের স্বাভাবিক ঐ বৃত্তিটা থেকে কেউ বোধ হয় মুক্তি পায় না।

যা হোক, আর দেরি না করে সোজা গিয়ে এবারে শিশিরের ঘরে ঢুকলাম।

মুহ্যমানের মত শিশির তখনও সোফাটার উপরে বসে ছিল। আমার পদ-শব্দে মুখ না তুলেই বোধ হয় কমলাই আবার ফিরে এসেছে ভেবে বলে ওঠে, শোন কমলা—, কিন্তু পরক্ষণেই চোখ তুলে আমায় দেখতে পেয়ে শিশির যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে যায়। মৃদু হেসে বলে, ও তুমি ? আমি ভেবেছিলাম—বোস সুজিত।

ব্যাপার কি বল তো! কমলাকে দেখলাম হনহন করে চলে গেল!

She is really mysterious!

মনে হল, কমলা যেন বেশ একটু চটেছে—love-play নাকি ? কথাটা তাহলে একেবারে মিথ্যে নয় ?

এই প্রথম শিশিরকে আমি কমলা সম্পর্কে ঠাট্টা করলাম।

হ্যাঁ, love-playই বটে। বলব'খন তোমায় সব কথা রাত্রে। তারপর হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, চল, ওঠা যাক। আজ একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

* * *

এক নন্‌সেন্স ক্লাব ছাড়া শিশির বাইরে কখনও কোনদিন চা পান করত না। অথচ ও ছিল চিরদিন দুর্দান্ত রকমের চা-পায়ী।

বাড়ি থেকে সর্বদা বড় একটা ফ্লাস্কে করে ও চা তৈরি করে ফ্লাস্কটা নিজের সঙ্গে সঙ্গেই রাখত। ফ্লাস্কটি যেন ওর দেহেরই একটি অঙ্গবিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এ নিয়ে আমরা বন্ধুরা কত দিন কত ঠাট্টাই না করেছি শিশিরকে। প্রত্যুত্তরে শিশির কেবল মুচকি হাসত।

'জনতা' নাটকের মধ্যে একটা দৃশ্যে ইচ্ছা করেই আমি শিশিরের ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা যোগ করে দিয়েছিলাম। এবং বলেছিলাম, তোর চা-প্রীতি ও ফ্লাস্কটি চিরস্মরণীয় হয়ে যাক আমার 'জনতা' নাটকে।

শিশির উঠে দাঁড়িয়ে ভৃত্যকে ডাকল, ভোলা—ভোলা!

ভোলা এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

চায়ের ফ্লাস্কটা দিয়ে যা। চা তৈরি করে রেখেছিস তো!

হ্যাঁ।

একটু পরে ভোলা চা-ভর্তি ফ্লাস্কটা নিয়ে এল।

ফ্লাস্কটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে, জুতোটা পায়ে দিতে দিতে শিশির বলল, চল।

আমার গাড়িতে চেপেই আমরা থিয়েটারের দিকে রওনা হলাম। গাড়িতে শিশির বিশেষ কোন কথাবার্তাই বলেনি। চুপচাপ ব্যাক সীটে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজেই রইল। শিশির নিশ্চয়ই কিছু ভাবছিল। আমিও তাকে বিরক্ত করলাম না।

কি ভাবছিল সে?

হায় রে! একবারও যদি জানতাম তার শেষের মুহূর্তটি অত নিকটে ঘনিয়ে এসেছে, নিশ্চয়ই তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, কি সে ভাবছে? অত কাছাকাছি থেকেও তার শেষ মুহূর্তে তাকে কোন প্রশ্নই করলাম না কেন?

গাড়ি যথাসময়েই থিয়েটারের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছল। গাড়ি থেকে নেমে আমি আর শিশির সোজা তার নির্দিষ্ট সাজঘরের দিকে গেলাম।

প্রধান অভিনেতা হিসাবে শিশিরের জন্যে থিয়েটারে পৃথক একটি সাজঘর নির্দিষ্ট ছিল। নেপালী দারোয়ানটা শিশিরের সাজঘরের দোরগোড়ার টুলের ওপরে বসেছিল। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম জানাল।

অভিনয়ের সময়ে কেউ শিশিরের সঙ্গে দেখা করে বা তাকে কোন রকম বিরক্ত করে শিশির আদপেই সেটা পছন্দ করত না, তাই ঐ নেপালী দারোয়ান-টির ব্যবস্থা করেছিলেন স্বয়ং ম্যানেজারবাবু।

ছোট ঘরখানি, একটি কাউচ ও একটা সিঙ্গল বেড্ একপাশে বিশ্রামের জন্যে; একটি আলমারি, যার মধ্যে অভিনয়ের প্রয়োজনীয় এবং নিজস্ব সাজ-সজ্জাগুলো শিশিরের থাকত।

ছোট একটি ড্রেসিং টেবিল, টেবিলের ওপরে রূপসজ্জার জন্যে প্রয়োজনীয় পাউডার, জিঙ্কঅকসাইড, রং, স্পিরিট, গাম, ব্রাশ ইত্যাদি সাজানো।

একপাশে স্ট্যাণ্ডের ওপরে ডোমে ঢাকা উজ্জ্বল একটি বৈদ্যুতিক বাতি।

ঐ ঘরে শিশির তার রূপসজ্জা নিজেই চিরদিন করে থাকে তার রুচি ও পছন্দমত। সমরেশ বলে একটি ছেলে তাকে সাহায্য করে।

ঘরে প্রবেশ করে কাউচটা দেখিয়ে শিশির আমায় বলে, বোস্ সুজিত।

সমরেশ ঐ সময় কক্ষে এসে প্রবেশ করল, মেক্-আপ এবারে করবেন তো স্যার?

গোড়ায় তো আমার নাটকে প্রবেশ নেই, সেই প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে, তাই না?

হ্যাঁ।

একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে, একগাল ধোঁয়া উদ্গীরণ করে ড্রেসিং টেবিলটার সামনে ছোট একটা রিভলভিং টুলের উপরে বসে আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে শিশির বললে, তুমি তো পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাস করো না সুজিত?

কি জানি কেন—তবে মনে হয়, which I cannot see, cannot feel

cannot touch—I don't believe! না।···কিন্তু কেন বল তো?

হয়ত তোমার কথা মিথ্যা নয় সুজিত। একটু চুপ করে থেকে বলে মৃদু শান্ত কণ্ঠে শিশির, কিন্তু এ কথাটা তো তুমি অস্বীকার করতে পার না, মনোলোক ও স্বপ্ন বলে কিছু একটা আছে। সেই স্বপ্নের মন নিয়েও তো আমরা—যা তুমি বললে তাকে দেখতে পারি, অনুভব করতে পারি, বিশ্বাসও করতে পারি!

তা হয়ত পারি।

তাহলে জান সেই অনুভূতি আর বিশ্বাস দিয়েই সৌরেশকে যেন আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি, আমি স্পষ্ট তার উপস্থিতি টের পাই। সে যেন সর্বক্ষণ আমার কাছে কাছেই আছে, অত্যন্ত কাছে—

ঠিক ঐ সময় ঘরের মধ্যে দেওয়াল-সংলগ্ন ছোট একটি ঘণ্টি রিং রিং করে বেজে উঠল, শুরু হবার প্রথম সংকেত।

আর মাত্র ১৫ মিনিট সময় আছে অভিনয় শুরু হবার—সকলে প্রস্তুত হও, সংকেত জানিয়ে দিল।

তোমার মেক্-আপ শুরু কর শিশির। আমি একবার ওদিকটা দেখে আসি ওরা সব এসে পেঁছিল কিনা।

সকলের জন্য একটা ভাল বক্স আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা ছিল।

প্রথমেই বক্সে গেলাম। মালবিকা, অজিতা, ভবানী, কমলা, বিনয় ইতি-মধ্যেই এসে গিয়েছে। আসেনি কেবল হিরণ্ময়, অনিল ও কিরীটীবাবু।

তারাও ঠিক সময়ে এসে পেঁছে গেল।

সকলকে বসিয়ে আর একবার শিশিরের সাজঘরের দিকে গেলাম।

আমার সম্পর্কে দারোয়ানটাকে স্পেশাল পারমিশন দেওয়া ছিল, সোজা ভিতরে প্রবেশ করতে যাব, শুনলাম অনুচ্চ স্বরে শিশির তার অভিনয়েরই কোন একটা অংশ বলে যাচ্ছে—

> পাবে না, তুমি তাকে পাবে না। আর ভালবাসার কথা বলছ, এক-দিন সত্যিই তুমি হয়তো ভাল আমায় বেসেছিলে, কিন্তু তোমার মনের গোপন কুৎসিত হিংসার আগুনে সে ভালবাসা পুড়ে আজ ছাই—ছাই হয়ে গিয়েছে। ভালবাসার কণ্ঠে যে দাবি, সে জোর করে ছিনিয়ে নেয় না, আপনা হতেই তার দু'হাত পাওয়ার গৌরবে ভরে ওঠে···

সত্যি, সামান্য কথাগুলো কি চমৎকার ভাবে উচ্চারণ করছে শিশির! অজ্ঞাতেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম দোরগোড়ায়।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি মেক-আপ শেষ হয়ে গিয়েছে, একাকী ঘরে টুলটার উপরে বসে আপন মনে কথাগুলো বলছে শিশির।

পদশব্দে চমকে ফিরে তাকাল, কে?

কণ্ঠে সুস্পষ্ট বিরক্তির সুর।

কিন্তু চোখোচোখি হতেই আমাকে দেখে বিরক্তির ভাবটা যেন অপসারিত হল, বললে, তুমি! ওরা সব এসেছে ?

হ্যাঁ।

কমলা ? কমলা এসেছে ?

হ্যাঁ। সেও এসেছে।

ঘরের ছোট ঘণ্টিটা আবার বেজে উঠল, রিং রিং রিং।

দ্বিতীয় সংকেত ঃ এবারে ১০ মিনিটের মধ্যে যবনিকা উত্তোলিত হবে।

হাউস একেবারে প্যাক্‌ড্‌-আপ। আর শুধু এই শো-ই নয়, দ্বিতীয় শো-এরও সমস্ত টিকিটই প্রায় বিক্রি হয়ে গিয়েছে—বলতে বলতে হঠাৎ কেমন যেন আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল, সবাই আজ আমরা উপস্থিত হয়েছি একমাত্র সৌরেশ ছাড়া, যদি সে থাকত—

সেও আছে। মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করে শিশির।

চমকে শিশিরের মুখের দিকে তাকালাম।

শিশির বললে, সুজিত, তোমার মত ভাই আমার যদি কলমের জোর থাকত, যদি আমিও শেক্সপীয়ার বা গিরিশ ঘোষ হতে পারতাম, রচনা করতাম একটা নাটক পরলোকতত্ত্ব নিয়ে, অবিনশ্বর আত্মার কাহিনী নিয়ে, আমার মনের সমস্ত কল্পনা. মনের সত্যকারের সমস্ত অনুভূতি নিয়ে রচনা করতাম এমন একটি কাহিনী—

শিশিরের কথাটা শেষ হল না ; প্রধানা অভিনেত্রী সরমা এসে শিশিরের কক্ষে প্রবেশ করল। সরমার সঙ্গে পূর্বেই আমার পরিচয় হবার সুযোগ হয়েছিল।

সরমা মেয়েটি অভিনেত্রী হলেও তার মধ্যে একটা সহজ সুন্দর ভব্যতা ও আভিজাত্য ছিল, কথায়বার্তায়, চালচলনে ব্যবহারে একটা শিক্ষা ও রুচির শালীনতা সরমাকে যেন শ্রীমণ্ডিতা করে তুলেছিল। আমাকে ঘরের মধ্যে দেখে সরমা বললে, এই যে সুজিতবাবু, আপনি এখানে! অভিনয় দেখবেন না ?

হ্যাঁ, দেখব।

ঠিক এমনি সময় শেষ সংকেত শোনা গেল ঃ রিং রিং রিং।

আমি চললাম ভাই -I wish both of you good luck and success!

ঘর থেকে আমি বের হয়ে আসতে আসতে শুনলাম, সরমা শিশিরকে বলছে, বড্ড nervous বোধ করছি শিশির!

সরমার কথাটা কানে আসতেই যেন চমকে উঠলাম।

ইতিপূর্বে সরমাকে কখনও 'তুমি' বলে অমন সহজভাবে শিশিরকে তো কই সম্বোধন করতে শুনিনি। কেমন খটকা লাগল মনে। চিন্তা করতে করতেই সোজা বক্সের দিকে চলে গেলাম।

সরমার প্রথম appearance প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে।

বক্সে এসে দেখি যবনিকা উঠেছে, অভিনয় শুরু হয়ে গিয়েছে।

* * *

সরমা সম্পর্কে শিশিরের কোন দুর্বলতা আছে ঘুণাক্ষরেও তো কোনদিন টের পাইনি—দীর্ঘ প্রায় কুড়িদিন ধরে নিয়মিত রিহার্সেলে সেই প্রথম দিনটি থেকে এখানে যাতায়াত করছি, বরাবরই দেখেছি শিশিরকে সরমা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে, 'আপনি' ছাড়া কখনও সম্বোধন করে না।

চকিতে মনের মধ্যে একটা কথা এসে উদয় হল।

মনে পড়ল, আজই কিছুক্ষণ আগে শিশিরের বাড়িতে তার কক্ষে বসে কমলার উচ্চারিত কথাগুলো।

এতক্ষণে যেন মনে হচ্ছে কমলার কথাগুলোর কোন একটা হদিস পেয়েছি।

কমলার দিকে নিজের অজ্ঞাতেই চোখ পড়ল, কমলা অভিনয় দেখছে বটে তবে তার মনটা বোঝা যায় বিক্ষিপ্ত।

আহা! বেচারী কমলা!

সত্যিই শিশিরের এ খুব অন্যায়।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, শোনবার আমার তো হতে পারে। একটা কথা শুনেই চট্ করে একটা মতামত গড়ে তোলা ঠিক উচিত হচ্ছে না কারও সম্পর্কে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে সরমার appearance, সরমা কি এখনও শিশিরের সাজ-ঘরেই আছে!

নিজের অজ্ঞাতেই যেন কতকটা সাজঘরের দিকে অগ্রসর হলাম।

পরের গোপন কথা লুকিয়ে শোনা নিকৃষ্ট চরিত্রের পরিচয়। কিন্তু কমলা ও শিশির দুজনেই তো আমাদের বন্ধু! কমলা পাকাপোক্তভাবে নন্‌সেন্স ক্লাবের একজন সভ্যা না হলেও তাকে তো আমরা আমাদেরই একজন বলে মনে করি। নিয়মিত ক্লাবে সে হাজিরাও দেয়।

পায়ে পায়ে সাজঘরের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছি, হঠাৎ দেখি সরমা শিশিরের ঘর থেকে বেশ যেন দ্রুতপদেই বের হয়ে এল!

উইংসের আলো সরমার চোখেমুখে এসে পড়েছে, মনে হল চাপা একটা উত্তেজনায় সরমার সমস্ত মুখটা যেন লাল হয়ে উঠেছে।

শিশিরের ঘরের দিকে আর গেলাম না।

ফিরে এলাম বক্সে।

প্রথম অঙ্কের পরে একবার শিশিরের ঘরে গিয়ে নাটক সম্পর্কে দু-একটা কথা হয়েছিল কিন্তু সে সময় তাকে বিশেষ গম্ভীর ও চিন্তান্বিত বলেই মনে হয়েছিল।

* * *

আর জীবিত শিশিরের সঙ্গে দেখা হয়নি!

দেখলাম আবার তাকে—মৃত। সরমা তার মৃতদেহটা দু'হাতে আঁকড়ে

ধরে ব্যাকুল স্বরে ডাকছে, শিশির—শিশির !

* * *

নন্‌সেন্স ক্লাবের পাথরের মূর্তি কি করে দুটো চুরি গেল কিছুই জানি না। সৌরেশের ও শিশিরের মৃত্যুর পর আজই দ্বিপ্রহরে প্রথম ক্লাবে গিয়েছি।

এবং ঘরে ঢুকে প্রথমে ওদিকে নজরও পড়েনি।

মূর্তির সম্পর্কে কথা উঠতেই প্রথমে ওদিকে দৃষ্টি পড়ে।

কিরীটীবাবু, আমি যা জানি সবই লিখলাম।

আর আমার বলবার কিছুই নেই। নমস্কার—

সুজিত কর

॥ দশ ॥

ঐ রাত্রেই জবানবন্দি লিখছিল ডাঃ অজিতা রায় তার নিজের। হাসপাতালে তার নাইট ডিউটি ছিল।

হাসপাতালেরই একটা ওয়ার্ডে, টেবিল-ল্যাম্পের মৃদু আলোয় টেবিলে বসে নিজের রাইটিং প্যাড্‌টায়। অজিতা লিখছিল ঃ

কিরীটীবাবু,

আমি স্বেচ্ছায় এবং একান্ত বিশদভাবেই যতটুকু আমাদের বন্ধু সৌরেশ ও শিশিরের মৃত্যু সম্পর্কে জানি লিখে আপনাকে জানাচ্ছি।

অস্বীকার করব না, আজ নন্‌সেন্স ক্লাবে অত্যন্ত কঠোর হলেও—অবশ্যম্ভাবীকে যেভাবে আপনি ব্যক্ত করেছেন, সত্যকে যেভাবে উদ্ঘাটিত করবার জন্যে আমাদের সকলকেই কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন, আপনাকে মনে মনে সেজন্যে প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না।

আপনার মতই আমিও বিশ্বাস করি, আমাদের মধ্যে একজন-না-একজন আমাদের দু'জন প্রিয় বন্ধুকে নিশ্চয়ই হত্যা করেছি তীব্র হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড্‌ বিষপ্রয়োগে।

হ্যাঁ, তিলমাত্রও আমার সন্দেহ নেই, আমাদের কেউ-না-কেউ ওদের—শিশির ও সৌরেশকে হত্যা করছি। হত্যা যে করেছি তা ঠিকই, কিন্তু এই কথাটাই ভাবতে পারছি না এ কাজ আমরা কেউ কি করে করলাম! কি করে বন্ধুহত্যার রক্তে হাত কলঙ্কিত করলাম!

আর কেউ না হোক, আমি এবং আমার স্বামী ভবানী (ভবানীকে অবিশ্যি ভাল করেই আমি চিনি) এ নৃশংস পাশবিক হত্যাকাণ্ডের একটা মীমাংসা করতে চাই-ই।

হিরণ্ময় সত্যিই বন্ধুর কাজ করেছে, আপনাকে এ ব্যাপারে মীমাংসার জন্যে ডেকে এনে। এবং আপনার সঙ্গে সামান্য দুদিনের কথাবার্তা ও আলাপে বুঝতে পেরেছি, যদি কেউ এ ব্যাপারে মীমাংসা করে দিতে পারেন তো সে একমাত্র আপনি পারবেন। আপনিই একমাত্র পারবেন আমাদের এ কলঙ্ক

থেকে মুক্তি দিতে।

সত্য প্রকাশ পাক। চরম দণ্ড হত্যাকারীর হোক।

বন্ধুত্বের মুখোশ মুখে এঁটে এত বড় নৃশংস কাজ যে করতে পারে তার উপযুক্ত স্থান মানুষের সমাজে নয়, সত্যিই আপনি বলেছেন—নির্জন অন্ধকার কারাগৃহে।

আমি আরও ভেবে অবাক হচ্ছি কিরীটীবাবু, দু'জন বন্ধুকে খুন করবার পরও এখনও সে আমাদের মধ্যে আছে কি করে!

* * *

সৌরেশ যে মারা গিয়েছে সে রাত্রে, আমিই প্রথমে সেটা বলি। জলপান করবার সঙ্গে সঙ্গেই বেচারা টলে পড়ে গেল, মরণাধিক যন্ত্রণায় তার হাত-পা ও শরীরের সে আক্ষেপ ও অস্ফুট গোঙানি এখনও আমার স্পষ্ট মনে জাগে।

তীব্র ভয়ঙ্কর বিষ, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড!

শরীরের যাবতীয় ভিসারা, বিশেষ করে গলনালী, স্টমাক ও হার্ট যেন পুড়ে ঝলসে গলে যায়। দেহরূপী একটা সচল মেসিনকে যেন ভয়ঙ্কর একটা আঘাত হেনে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় ঐ বিষ অতি দ্রুত এবং মুহূর্তে। যেটুকু সময় তাকে যন্ত্রণাভোগ করতে হয়—সে যে কি যন্ত্রণা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।

হত্যাই করবে একজন বন্ধুকে যদি সে মনস্থ করেছিল তবে এভাবে দারুণ যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা না করে মাথায় গুলি করে মেরে ফেললে না কেন!

* * *

যাক সে কথা। আমার কথা আমি বলতে পারি মিঃ রায়, সে রাত্রে যতক্ষণ গান-বাজনা চলছিল একবারও আমি ঘর থেকে বের হইনি। এবং ঐ সময়টা কেউ ঘর থেকে বের হয়েছিল কিনা তাও আমার নজরে পড়েনি।

আমার স্বামী বরাবর আমার পাশেই ছিল, মাঝে মাঝে কেবল তাকে মালবিকার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে দেখেছি। তারপর গান-বাজনা শেষ হয়ে গেল, একত্রে সকলে খাবার ঘরে গেলাম।

সৌরেশ চিরদিনই আমাদের বন্ধুদের মধ্যে বেশী একটু স্ফূর্তিবাজ ছিল। সে রাত্রে তাকে যেন আরও বেশী জোভীয়াল মুডে দেখেছিলাম।

বেচারা! জলের গ্লাসটা মুখের সামনে তোলার সময়ও জানত না, মৃত্যুগরল সে ঠোঁটের কাছে তুলে ধরেছে!

কিন্তু একটা খট্‌কা আমার লাগে মিঃ রায়, ঠিক সৌরেশের গ্লাসেই কী করে হত্যাকারী হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড মিশিয়ে দিল!

ভৃত্য জলের গ্লাসগুলো পরিবেশন করেছে, অন্য কেউই যখন জলপান করে মরেনি তখন তো একথা ঠিকই, কেবল একটা জলের গ্লাসেই হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষ মেশানো ছিল, অন্য গ্লাসগুলোতে বিষ মেশানো ছিল না।

এক্ষেত্রে সৌরেশ সেই গ্লাসের জল না পান করে অন্য কেউও তো আমরা

পান করতে পারতাম !

তবে কী খুনী আমাদের সকলকেই মারবার চেষ্টা করেছিল ?

তাই যদি হয় তবে তো শিশির ও সৌরেশকে দিয়েই এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড শেষ হবে না, আমাদের সকলকেই সে একের পর এক হত্যা করবে !

উঃ, কি ভয়ংকর !

না—না, মিঃ রায় ! হত্যাকারীকে আপনি যত শীঘ্র পারেন ধরিয়ে দিন।

আবার একটা পৈশাচিত হত্যাকাণ্ড হবার আগে তাকে যে করেই হোক ধরতে হবে আমাদের।

ভাবতে পারছি না—সত্যিই এখনও ভাবতে পারছি না কিরীটীবাবু, কী এমন কারণ থাকতে পারে বন্ধুকে হত্যা করবার !

এক-দুদিনের পরিচয় তো আমাদের পরস্পরের নয়—দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আমাদের।

এতকাল পরে কী এমন ঘটল, যাতে করে আমরা এভাবে হত্যা শুরু করলাম !

* * *

আর শিশির—Poor romantic actor ! অভিনয়ের প্রতি শিক্ষিত সমাজের চিরদিনের একটা অশ্রদ্ধা ! অভিনয় শিল্পকলাকে চিরদিন আমরা সযতনে যেন এড়িয়ে বাঁচিয়ে চলেছি আমাদের সহজ জীবনযাত্রা থেকে।

বিশেষ করে যারা অভিনয় করে তাদের আমরা সগোত্র ও সগোষ্ঠী কোন দিনও ভাবিনি।

এ আক্ষেপ শিশিরের বরাবর ছিল। সে বলত—যে কোন উঁচুদরের আর্টের সমপর্যায়ে পড়ে অভিনয় এবং বিদেশে অভিনয়-শিল্পীকে স্বীকৃতিও দিয়েছে অথচ আজও আমাদের দেশে আমরা অভিনয়-শিল্পকে ও শিল্পীদের অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখেছি—এটা আমাদেরই শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গীর অমার্জনীয় ত্রুটি। নিঃসন্দেহে অভিনয় দেখব আমরা, ভাল হলে প্রশংসা করব, মন্দ হলে করব নিন্দা ও তীব্র সমালোচনা—কিন্তু অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে সর্বদা বর্জন করে চলব। এর কারণ শিক্ষিত ও ভদ্র ব্যক্তিদের এদিকে দৃষ্টির অভাব। আমি দেখাব অভিনয়ের ব্যাপারে শিক্ষা, রুচি ও নিষ্ঠা থাকলে অভিনয়কে কত সুন্দর ও প্রাণবন্ত করে তোলা যায় এবং স্বীকৃতিও সে পায়।

সত্যি মিঃ রায়, এ গর্ব শিশির করতে পারত। তার সে নিষ্ঠা ও সাধনা ছিল।

তাই বারবার মনে হচ্ছে আজ এত বড় একটা প্রচেষ্টা, এত বড় একটা নিষ্ঠাকে কি ভাবে হত্যা করা হল !

শুধু কি শিশিরই ? সৌরেশও বটে। তার মত সুরশিল্পী ও শিশিরের মত একজন উজ্জ্বল, উদীয়মান অভিনেতাকে হত্যা করে দেশের যে কত বড় ক্ষতি করা হল একবারও কি শয়তানটা ভাবলে না ?

* * *

শিশিরের মৃত্যুর ব্যাপারে আপনাকে আমি কিছুই বেশী আর বলতে পারব না, তার কারণ ঐদিন রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সময়টুকু ছাড়া তাকে আর আমি জীবিত দেখিনি। স্টেজে সকলে যখন আপনারা গেলেন, আমি যাইনি। কমলার কাছেই ছিলাম—সে তো আপনিও জানেন।

বেচারী কমলা! সত্যিই বোধ হয় সে ভালবাসত শিশিরকে। যদিও নন্‌সেন্স ক্লাবের সে এখনও একজন সভ্য হয়নি তবু তাকে আমরা আমাদেরই বলে জেনেছি।

তার কথা ভেবে মনে আমার এতটুকুও যেন শান্তি নেই।

জানি না সে এত বড় আঘাতটা কেমন করে সহ্য করবে!

বড় কোমল, বড় সেণ্টিমেণ্টাল সে।

আর লেখবার কিছুই নেই। এ ছাড়া যদি আর কিছু আপনার জিজ্ঞাস্য থাকে আমাকে, যে কোন সময় জিজ্ঞাসা করলেই জবাব পাবেন। নমস্কার—ইতি

অজিতা রায়

॥ এগার ॥

রাত্রি শেষ হয়ে এল।

ভবানীর রাত্রে আজ স্টুডিওতে সুটিং ছিল। এবং কথা ছিল, সুটিং শেষে ভবানী সোজা হস্‌পিটালেই যাবে, সেখান থেকে সে ও অজিতা একত্রে দুজনে বাড়ি ফিরবে।

কথা ছিল যদিও সারারাত সুটিং চলবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাত দুটোয় সুটিং বন্ধ করতে হল।

প্রধান নারীচরিত্রে যে নামকরা অভিনেত্রীটি অভিনয় করছিল, হঠাৎ তিনি সেটের উপরেই পা স্লিপ করে পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত পাওয়ায় সুটিং বাধ্য হয়েই ভবানীকে বন্ধ করতে হল।

ডাইরেকটার্স রুমে এসে ভবানী বসল।

ঐ দিন সন্ধ্যায় নন্‌সেন্স ক্লাবের ঘটনার পর থেকেই ভবানীর মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল। প্রথম থেকেই সুটিংয়ে যেন তার মন আজ বসছিল না।

ঘটনাচক্রে সুটিং বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মনে মনে অনেকটা যেন ও স্বস্তি অনুভবই করলে। শরীর ও মন দুটোই যেন বড্ড ক্লান্ত মনে হয়।

এক কাপ চায়ের প্রয়োজন। স্টুডিওর ভৃত্য মহেশকে ডেকে এক কাপ চা দিতে বলে, নিজের ঘরে চেয়ারটার ওপর বসে গা-টা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল ভবানী।

হঠাৎ মনে পড়ে, অজিতা বলে দিয়েছে সময় পেলে জবানবন্দিটা লিখে রাখতে। ভবানী লিখছিল।

জবানবন্দি।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়—বন্ধু সৌরেশ ও শিশিরের কথা।

সৌরেশ আর শিশির নেই। কত দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব! কিরীটীবাবু বললেন, আমাদের বন্ধুদের মধ্যেই কেউ নাকি দুটি বন্ধু—সৌরেশ ও শিশিরকে হত্যা করেছি।

আমরা কেউ হত্যা করেছি। অজিতারও তাই বিশ্বাস। সে তো আসবার সময় স্পষ্টই তাই বললে আমায়।

তারও তাই স্থির বিশ্বাস।

সত্যিই কি তাই! কিন্তু কে? আমি? অজিতা, হিরণ্ময়, অনিল, কমলা, মালবিকা, বিনয়, সৌমিত্র—কে? কে হত্যা করলাম সৌরেশ আর শিশিরকে? কে—কে?

আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি অজিতার একটা অদ্ভুত intuition আছে, অনেক ব্যাপারে এমনভাবে জোর গলায় ও ভবিষ্যৎবাণী করেছে—পরে দেখেছি আদপেই যেটা মিথ্যা হয়নি।

তাই মনে মনে সৌরেশ ও শিশিরের হত্যার ব্যাপারে একটা আশঙ্কা থাকলেও, মনে হচ্ছে যেন আশঙ্কাটা অমূলক নয়।

আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না! অনিল যে নতুন বাগানবাড়িটা দমদমায় কিনেছে সেখানে সকলে একদিন মিলে আবার সমস্ত ব্যাপারটা খোলাখুলি আলোচনা করলে কেমন হয়? কিরীটীবাবু, আপনার এ সম্পর্কে কি মত?

অবশ্য একটা কাজ করতে হবে, আপনিও সেখানে উপস্থিত থাকবেন—তবে নিজের সত্যিকারের পরিচয়ে নয়।

অবশ্য কি পরিচয়ে বা কি বেশে আপনি সেখানে উপস্থিত থাকলে ভাল হয়, সেটা আপনিই ভেবে দেখবেন।

কারণ সে ব্যাপারে আপনাকে উপদেশ দিতে যাওয়াটা ধৃষ্টতা বলে মনে করি। যা হোক, এ ব্যাপারে আপনার মতামত আমাকে জানাবেন, তারপর আমি আর আমার স্ত্রী অজিতা সব ব্যবস্থা করব।

* * *

সৌরেশের মৃত্যুর দিন অর্থাৎ অনিলের জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসবের রাত্রে আমি একবারও গান-বাজনার আসর ছেড়ে অন্য কোথায়ও যাইনি।

মালবিকার সঙ্গেই বসে ফিল্ম এবং সুটিং সম্পর্কে কথাবার্তা বলছিলাম।

তবে হ্যাঁ, লক্ষ্য করেছি বার দুই অনিল ভিতরে গিয়েছে, একবার কমলাও ভিতরে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে মনে পড়ে।

আর ঠিক খেতে যাবার আগে—বোধ হয় মিনিট পনের আগে হবে, সুজিত ভিতরের দিকে গিয়েছিল একবার।

সুজিত ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় অনিলের আহ্বানে আমরা সকলে খাবার ঘরে যাই। গিয়ে দেখি আসন পাতা হয়েছে, পাতের ধারে জলভর্তি সব

কাচের গ্লাসও পরিবেশন করা হয়ে গিয়েছে।

একটা ছোট্ট ব্যাপার খেতে বসবার ঠিক আগেই আমার নজরে পড়েছিল—অবশ্য কোনরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ ব্যাপারটা সেদিন আমার না করলেও, আজ মনে হচ্ছে সেটা আপনার কাছে হয়ত বলা উচিত।

ব্যাপারটা এমন বিশেষ কিছুই নয়, তবু বলছি।

আসনে সকলে বসতে যাবে এমন সময় শিশির সৌরেশকে যেন পাশের আসনটায় একপ্রকার ঠেলেই বসিয়ে দিয়ে নিজে বসে পড়ল—যে আসনটায় সৌরেশ বসতে যাচ্ছিল।

হয়ত ব্যাপারটা কিছুই নয়, তবু বললাম এইজন্যে যে বরাবরই দেখেছি—কোথায় ও কোন ভোজনের সময় যখনই আমরা একত্র হয়েছি, সৌরেশ শিশিরকে ঠেলে দিয়ে নিজে শিশির যে আসনে বসতে গিয়েছে সেই আসনটা বা চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়েছে।

এবং ওদের ওই বসবার সময় ঠেলাঠেলি দেখে আমরা সকলেই প্রতিবার ঠাট্টা-তামাশা করলেও, ব্যাপারটা আমাদের কাছে পুরাতন হয়ে গিয়েছিল।

ইদানীং তাই ও ব্যাপারে আমরা মনোযোগ দিতাম না কেউ।

কিন্তু সে রাত্রে ঠিক উল্টোটিই ঘটল, শিশিরই সৌরেশকে সরিয়ে তার আসনে বসল।

আজ তাই মনে হয়, মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় হাতই যেন সেদিন তাকে অমনি করে গ্লাসভর্তি বিষাক্ত পানীয়ের সামনে ঠেলে দিয়েছিল।

আর একটা কথা, শিশির এবং সৌরেশের বরাবর অভ্যাস ছিল দরজার পাশ ঘেঁষে অর্থাৎ পরিবেশনকারী পরিবেশনের সময় যে দরজা দিয়ে যাতায়াত করবে সেইখানেই বসা! শিশির আর সৌরেশ ও-সম্পর্কে বলত, পরিবেশনের সময় সবার আগে নাকি ওদের পাতে আহার্য পড়া চাই। অন্যের পাতে খাবার পড়বে আর ততক্ষণ হাঁ করে ওরা বসে থাকবে সেটা নাকি অসহ্য অত্যাচার!

* * *

শিশিরের মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই বলতে পারব না।

সেদিন অনিলের বাড়িতে সৌরেশের মৃত্যুর পর আর জীবিত তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

যা জানতাম সবই অকপটে লিখে জানালাম আপনাকে কিরীটীবাবু। আর যদি কিছু আপনার জানবার থাকে, কোন দ্বিধা না করে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, দরজা আমার খোলাই রইল আপনার জন্যে। এখানে মানে স্টুডিওতেও আসতে পারেন, বাড়িতেও যেতে পারেন। মোট কথা আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত জানবেন। নমস্কার।

ভবদীয়, ভবানী রায়

বিখ্যাত দৈনিক কাগজ 'রাজপথে'র সম্পাদক বিনয় মুখোপাধ্যায়ের

অফিস।

দোতলা বাড়ির দক্ষিণ কোণে প্রশস্ত একখানি কক্ষ।

সাংবাদিক মহলে বিনয়ের প্রতিষ্ঠা ও সম্মান আজ সুবিস্তৃত।

বেঁটেখাটো পাতলা চেহারার লোকটি, হরতনের মত মুখখানা, সরু ছাঁটাই করা গোঁফ, দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো। নিটোল একটি মেয়েলী ঢঙ যেন চোখেমুখে ছড়িয়ে আছে। মাথায় কোঁকড়া চুল, মধ্যিখানে সিঁথি।

সুদীর্ঘ পনের বছর ধরে সাংবাদিক জীবন চলেছে বিনয়ের। সংবাদ-সম্পাদক হিসাবে বহু কাগজে কাজ করে করে বছর দুই হবে 'রাজপথে' সে সুযোগ পেয়েছে।

সাধারণ গৃহস্থঘরের ছেলে। অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সাধনায় আজ সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেলেও, মানুষ সে এতটুকুও বদলায়নি। বিনয়ের মিষ্ট, সদালাপী ব্যবহারের জন্য সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। বয়স চল্লিশের কোঠার মাঝামাঝি হলেও স্বাস্থ্যটি সুন্দর এবং বয়সের অনুপাতে যৌবন এখনও যেন অটুট আছে বলেই মনে হয়। বিবাহ করেনি।

সংসারে আপনার বলতে একমাত্র বিধবা মা।

ইদানীং কিছুদিন হল 'রাজপথে'র দৌলতে একটি চমৎকার শহরের প্রান্তে দোতলা বাড়ি ও একটা গাড়ি ব্যবহারের জন্যে পেয়েছে।

অবস্থাটা একটু সচ্ছল হবার সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা (ভাগ্যবানেদের প্রতি ঈর্ষাকাতর এক শ্রেণীর লোক যেমন) বলে বেড়ায় বিনয় নাকি আজকাল মদ্য-পান করে ; এমন কি তার অফিস-ঘরে লেখবার টেবিলের উপরেও নাকি আজ-কাল ছোট একটি লাল তরল পদার্থ ভর্তি বেঁটে বোতল ও একটি পেগ্ গ্লাস দেখা যায়।

ঈর্ষাকাতর ব্যক্তিরা যাই বলুক না কেন, আজ নতুন নয়, দীর্ঘ এগার বছরের অভ্যাস ওটি বিনয়ের। তবে পয়সার সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে মাত্রাধিক্য হয়নি—হয়েছে শ্রেণীর আভিজাত্য বৃদ্ধি। দেশী ও ক্যানেডিয়ান থেকে এখন এসে দাঁড়িয়েছে স্কচে।

বিনয় মদ্যপান করলেও আজ পর্যন্ত তাকে বড় কেউ একটা বে-সামাল হতে দেখেনি।

শান্তশিষ্ট, সদালাপী, নিরহংকার বিনয়কে দেখে এবং তার মেয়েলী ঢঙের মুখখানাতে সামান্য হাসির একটা দীপ্তি টেনে এনে চিবিয়ে চিবিয়ে মেয়েলী কণ্ঠের কথাবার্তা শুনে কারও বোঝবার সাধ্য নেই কাগজের উপরে তার ঝরনা কলম যখন চলতে শুরু করে—কী মর্মস্পর্শী, তীক্ষ্ণ ভাষা ফুটে বের হয়!

অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কী নির্মম কশাঘাত!

প্রতিটি অক্ষর যেন আগুনের মতই জ্বলতে থাকে।

কর্তৃপক্ষ বিনয়ের উপরে এতটুকুও সন্তুষ্ট নয়, কিন্তু বিনয়ের

সর্বজনীনতাকে সম্ভ্রমের সঙ্গে ভয় করে তারা—তাই মনে মনে তাদের যাই থাক না কেন, মুখে কোন কথা বলবার দুঃসাহস বা দুর্মতি হয় না।

তবে কর্তৃপক্ষের বুদ্ধিটাও যে ভোঁতা নয় তার প্রমাণ, নামে এবং কাগজে-কলমে বিনয় মুখোপাধ্যায়ই কাগজের সম্পাদক হলেও বেশীর ভাগ সম্পাদকীয় সহকারী সম্পাদকদের দ্বারা লিখিত হয়ে থাকে প্রয়োজনবোধে।

প্রথম প্রথম এর বিরুদ্ধে বিনয়ের মন রুখে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু পরে সে ভেবে দেখলে, বর্তমান যুগে বেঁচে থাকতে হলে ওই নীতিকে অবহেলা করা চলে না।

অর্থ যাদের আছে—সোজা কথায় কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যবসার আসল চাবিকাঠি অর্থাৎ অর্থের ব্যাপারটা যাদের হাতে ঘোরে, তারা নেপথ্যে থাকলেও সব কিছুর আসল কর্তা বা পরিচালক তারাই।

তাদের হুকুমনামা ব্যতিরেকে কারও ইচ্ছামত এক পাও অগ্রসর হবার ক্ষমতা নেই। এবং তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই সেটা অনধিকারচর্চা, বিদ্রোহ। অতএব নিঃশব্দে ছাঁটাই। রাষ্ট্র থেকে শুরু করে সর্বত্রই দেশের যে কোন প্রতিষ্ঠানেই যখন এই একই নীতির প্রচলন, তখন বেঁচে থাকতে হলে তাকে অবনত মস্তকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ কোথায়!

তাছাড়া বুদ্ধি, প্রতিভা ও সামর্থ্যকে রুপোর চাকতির বিনিময়ে বিকিয়ে দিয়ে এত সহজেই যখন আরাম স্বাচ্ছন্দ্য যশ সব কিছুই মিলছে!

বিনয় ঐ নীতিটা মেনে নিয়েছিল, দীর্ঘদিন ধরে কেবলমাত্র প্রতিভা ও সামর্থ্যের মূলধন নিয়ে যুদ্ধ করে করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে এবং দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের কঠিন নিষ্পেষণে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়েই। তবে সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মত মধ্যে মধ্যে যে বিনয় গর্জে উঠত না তা নয়, কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত হয়ে যেত ওপরওয়ালার হুমকি শুনে।

ধীরপদে কর্তৃপক্ষের ঘর থেকে বের হয়ে এসে ড্রয়ার থেকে বোতলটা বের করে বসত।

* * *

সে রাত্রে বিনয় লিখছিল তার জবানবন্দি।

কিরীটীবাবু,

আপনি সত্যান্বেষী—এও নিশ্চয় জানেন, সত্যকে অন্বেষণ করা মানেই অন্যের অপ্রিয় হওয়া ও বিরাগভাজন হওয়া। হিরন্ময় আপনার পরিচিত ও বন্ধু। তার অনুরোধেই শুনলাম এ ব্যাপারে আপনি হস্তক্ষেপ করেছেন। অজিতা, ভবানী ও অনিলও শুনলাম আপনাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছে। আমিও আপনাকে জানাচ্ছি—সুস্বাগতম্! আমাদের মধ্যে কেউ যদি সত্যিই আমাদের দুজন বন্ধুকে খুন করে থাকি, তাকে আমাদের প্রত্যেকেরই জানা প্রয়োজন। কে আমাদের মধ্যে খুনী—আমরা সকলেই তার পরিচয় চাই, তার স্বরূপ জানতে চাই।

আপনার সঙ্গে পূর্বে মৌখিক পরিচয় না থাকলেও, আপনার তদন্তের সঙ্গে

আমি বিশেষভাবেই পরিচিত।

এবং আপনি যখন আমাদের বন্ধু ও বান্ধবীদের মধ্যে একজনকেই সন্দেহ করেছেন, তখন আমাদের মধ্যেই যে একজন কেউ খুনী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লজ্জার ও পরিতাপের বিষয় হলেও এমন একটা ব্যাপারকে চেপে রাখা আমাদের কারও দিক থেকেই ক্ষমার যোগ্য নিশ্চয়ই নয়।

* * *

অনিলের জন্মতিথি উৎসবের রাত্রে আমি একটু দেরি করেই পৌছেছিলাম। দেরি হয়ে গেল সৌমিত্রের জন্যে। কিছু ফুল কিনতে সন্ধ্যার দিকে মার্কেটে গিয়েছি, হঠাৎ স্টলের সামনে সৌমিত্রের সঙ্গে দেখা।

সে বললে, ঐ দিনই নাকি দ্বিপ্রহরে সে পাটনা থেকে লক্ষ্ণৌ হয়ে কি একটা জরুরী কাজে কলকাতায় এসেছে এবং বললে, দু-চার দিনের মধ্যেই নাকি কর্ম-স্থলে আবার ফিরে যাবে।

আমি প্রশ্ন করলাম, অনিলের জন্মতিথি উৎসবে সে যাবে কিনা?

জবাবে সৌমিত্র বললে, কোন একটা বিশেষ কাজে তক্ষুনি তাকে যেতে হবে টালীগঞ্জে এবং ফিরতে অনেক রাত হবে, তাই সে যেতে পারছে না বলে বিশেষ দুঃখিত।

আমি বললাম, তুই কলকাতায় এসেও অনিলের জন্মতিথি উৎসবে গেলি না—একথা শুনলে অনিল কিন্তু ভয়ানক দুঃখিত হবে।

জবাবে সৌমিত্র বললে, তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে একপক্ষে ভালই হল বিনয়। আমি যে কলকাতায় আজ এসেছি এবং আমার সঙ্গে তোর মার্কেটে দেখা হল, এ কথাটা অনিল যেন কোনমতেই না জানতে পারে। ও যা সেণ্টিমেণ্টাল—শুনলে মনে ভয়ানক আঘাত পাবে। কাল সকালে আম হিরিণ্ময়ের বাসায় যাব, পরে অনিলের সঙ্গে দেখা করব এবং নিজেই সব খুলে বললে আর সে অসন্তুষ্ট হবে না।

আমি বললাম, কাজটা ভাল হল না সৌমিত্র!

তাতে সে বললে, বিশ্বাস কর বিনু—নিতান্ত ঠেকা, তাই অনিলের জন্ম-তিথি উৎসবে যেতে পারছি না। আচ্ছা ভাই চলি, দেরি হয়ে যাচ্ছে বলতে বলতে কতকটা যেন ত্বরিতপদেই সৌমিত্র চলে গেল।

ব্যাপারটায় তখনো কিছু আমার মনে হয়নি কিরীটীবাবু, কিন্তু পরে ভেবেছি—সৌমিত্র এরকম ব্যবহার করলে কেন?

হয়ত আসলে ব্যাপারটা কিছুই নয়, তথাপি আপনাকে সব জানালাম এই জন্যে যে সৌমিত্র আমাদের বিশেষ বন্ধু হয়েও—কলকাতায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সে-রাত্রে অনিলের জন্মতিথি উৎসবে উপস্থিত হল না কেন? কারণ সেদিনকার সৌমিত্রের সেই ব্যাবহারটা তার স্বভাবের বিপরীত।

যা হোক আমার অনিলের বাড়ি পৌঁছতে প্রায় সাতটা বেজে যায় এবং আমিও সৌমিত্র সম্পর্কে কোন কথাই সে-রাত্রে কাউকে কিছু বলিনি।

আমার পৌঁছবার আরও আধ ঘণ্টাটাক পরে সুজিত এসে পৌঁছায়। গান-বাজনার আসর থেকে সে-রাত্রে কেউ ওঠে গিয়েছিল কিনা বিশেষ আমার নজরে পড়েনি।

আমি একবার বাথরুমে গিয়াছিলাম খাবার ঘরে যাবার কিছুক্ষণ আগে।

খাবার ঘরে সকলেই আমরা প্রায় একসঙ্গেই প্রবেশ করি, সর্বশেষে প্রবেশ করে শিশির। জলপান করার সঙ্গে সঙ্গেই সৌরেশ ঢলে পড়ে গেল একটা আর্ত চিৎকার করে।

ব্যাপারটা এত আকস্মিক—এত অভাবনীয় যে এখনও ভেবে পাই না কিভাবে সৌরেশের ওরকম নৃশংস মৃত্যু ঘটতে পারে! এখনও সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা মস্ত প্রহেলিকার মত আমার কাছে মনে হয়।

সৌরেশের মৃত্যুর সময় কাছাকাছি ছিলাম, কিন্তু শিশিরের মৃত্যুর ব্যাপারটা আমায় যেন আরও বিস্মিত ও হতচকিত করে দিয়েছে।

শিশিরের মত অত সাবধানী ছেলে, যে নিজের ফ্লাস্কে রাখা তৈরি চা ভিন্ন অন্য কোথাও চা-পান করত না, এবং যে চা-ভর্তি সেই ফ্লাস্কটি পর্যন্ত সর্বদা নিজের কাছে কাছে রাখত, তার চায়ে বিষ মেশানো হল কি করে? আর কে-ই বা মেশাল?

সৌরেশের ব্যাপারটা তবু একটা কিছু ভেবে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু শিশিরের ব্যাপারটা—সত্যি কিরীটীবাবু আমার বুদ্ধির-চিন্তাশক্তিরও বাইরে।

অনিলের জন্মতিথি উৎসবেই শিশিরের সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ, তারপর আর দেখা হয়নি। অতএব তার সম্পর্কে কোন সংবাদই আমার গত দুদিনের জানা নেই।

নমস্কারান্তে—
বিনয় মুখার্জী

॥ বারো ॥

ঐদিন বৈকালে শেষ পর্যন্ত ক্লাবঘরে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জবানবন্দি আলাদা আলাদা ভাবে লিখে পেশ করবে কিরীটীবাবুর কাছে ঠিক হলেও—কমলা কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে মনে প্রস্তাবটা মোটেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি।

রুদ্ধ-বিষ সর্পিণীর মতই মনে মনে গজরাচ্ছিল কমলা।

এ শুধু তাদের উপরে অত্যাচারই নয়—অপমান, নিদারুণ অপমান;

কিন্তু উপায় নেই, জবানবন্দি সকলকে দিতেই হবে।

লেক টেরেসে ডাঃ অতুল্য ঘোষের নব্যকেতায় তৈরি চমৎকার কংক্রিটের মস্ত বড় বাড়ি। ডাঃ ঘোষ নিঃসন্তান, ছোট বোন কমলাকে তিনি সন্তানের মতই স্নেহ করেন।

কমলা এম. এ. পাস করে বিয়ে-থা করল না, চাকরি-বাকরিও কোন কিছু করল না—একটা দলে মিশে রাজনীতি করে বেড়াতে লাগল।

পার্টি, সঙ্ঘ বা দল নিয়ে দিবারাত্র এখানে ওখানে হৈহৈ করে বেড়াতে লাগল। প্রথমটায় ডাঃ ঘোষের মনে খুবই আঘাত লেগেছিল, কারণ সেটা তাঁর রুচি ও নীতির বাইরে।

কমলার হাতখরচের জন্যে আলাদা করে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউণ্ট খুলে দিয়েছিলেন ডাঃ ঘোষ। টাকার যখন যা প্রয়োজন হত, কমলা সেই চেক সই করে ব্যাঙ্ক থেকে নিজের ইচ্ছামতই টাকা তুলে নিত এবং তার জন্যে কারও কাছেই জবাবদিহি দেবার প্রয়োজন ছিল না।

খুশিমত বাড়ি থেকে যখন-তখন বের হয়ে যেত। এমন কত রাত গিয়েছে—বাড়িতে পর্যন্ত ফেরেনি।

কদাচিৎ কখনও বাড়িতে আহার করত। আহারপর্বটা বেশীর ভাগ সময় বাইরেই সম্পন্ন হত এবং নিজের থাকবার ও শোবার জন্যে আলাদা একটি ঘর ছিল আর কাজ করবার জন্যে ছিল এক বুড়ী ঝি সারদা।

সারদাই তিন বছরের মা-মরা মেয়ে কমলাকে সন্তানস্নেহে বুকে-পিঠে করে লালন-পালন করেছিল।

ডাঃ অতুল্য ঘোষ নিজেও বামপন্থী পলিটিক্যাল গ্রুপের লোক, কিন্তু জীবনে তাঁর পলিটিক্সটা পেশা নয়—অন্যান্য দেশের আরও দশজন ধনিক সম্প্রদায়ের মত একটা নেশাই ছিল।

ব্যাঙ্কে অর্থ, সমাজে প্রতিপত্তি ও সন্মান থাকলেই—পলিটিক্সের 'অ-আ-ক খ' বুঝি আর না বুঝি, যে কোন একটা পলিটিক্যাল গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকাটাই যখন আজকালকার এদেশে (ভারতবর্ষে) একটা রীতি ও এক ধরণের তথাকথিত অ্যারিস্টোক্রেসি ধনী জনসমাজের হয়ে দাঁড়িয়েছে, দেখা যাচ্ছে তখন ডাঃ অতুল্য ঘোষের মত একজন বিদ্যা, অর্থ, সন্মান, প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠাশালী লোকের পক্ষে সে মোহকে এড়িয়ে চলা যে সম্ভবপর হয়নি বলাই বাহুল্য।

কিন্তু নিছক সেটা সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির ব্যাপার-একটা নেশা মাত্রই ছিল বলেই অন্তরের মধ্যে মূল্য হিসাবে সেটা খুব বেশী যে একটা স্থান জুড়ে ছিল তা নয়। এবং তাই বোধ হয় তিনি একমাত্র বোন-কমলার রাজনৈতিক জীবন ও মতবাদকে নিয়ে অমনভাবে হৈচৈ করাটাকে মনেপ্রাণে ঠিক সমর্থন করতে পারতেন না।

প্রগাঢ় স্নেহের বশে মুখে কিছু না বললেও, মনে মনে যেন ক্রমেই অসন্তোষটা ধূমায়িত হতে হতে গাঢ় জমাট বেঁধে উঠছিল।

বোনকে কিছু মুখে না বলবার ডাঃ অতুল্য ঘোষের আরও একটা কারণ ছিল—তাঁর স্ত্রী বিনতা দেবী। বিনতা এ বাড়িতে বধূবেশে এসে প্রবেশ করে ঠিক পনের বছর বয়সের সময়।

কমলার বয়স তখন ঠিক চোদ্দ বছর।

মমতাময়ী বিনতা প্রথম দিন থেকেই পরম স্নেহে কমলাকে কাছে টেনে

নিয়েছিল কতকটা সঙ্গী ও সাথী হিসাবেই এ বাড়িতে অন্য কেউ সমবয়সী না থাকায়, ননদ ও ভাজের মধ্যে একটা সহজ প্রীতির সখিত্ব অতি দ্রুত দানা বেঁধে উঠেছিল। কমলাও বিনতাকে সখীর মতই গ্রহণ করেছিল।

অবশ্য তার আরও একটা কারণ ছিল, একটু অধিক বয়সেই কিশোরী বিনতাকে অতুল্য বিবাহ করেছিলেন। এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বয়সের পার্থক্যটাও বেশীই ছিল। তাই হয়ত সঙ্গী হিসাবে বিনতা বয়স্ক স্বামীকে খুব সহজভাবে প্রথমে গ্রহণ করতে পারেনি।

অতুল্যের বিবাহ ও স্ত্রী-নির্বাচনের ব্যাপারে বরাবরই নিজস্ব একটা মতামত ছিল। স্ত্রী হবে কিশোরী, স্বাস্থ্য ও লাবণ্যে ভরপুর। যৌবন তার ঠিক দেহের আঙ্গিনায় সবে করাঘাত করেছে—এখনও আসেনি। স্ত্রীর যৌবনকে মনকে রাঙিয়ে তুলবেন তিনিই ধীরে ধীরে।

সে যাই হোক, তাঁর নীতিতে তিনি নিজে কতটা সাফল্যলাভ করেছিলেন তা তিনিই জানেন, মোটের উপর অসুখী যে তাঁকে হতে হয়নি সেটা বুঝতে কারও কষ্ট হত না।

বিনতা ছোটখাটো মানুষটি, অত্যন্ত শান্তশিষ্ট ব্যবহার, মুখে সর্বদা হাসি যেন লেগেই আছে, কথা বলে অত্যন্ত কম। গায়ের বর্ণ বিনতার কালো, কিন্তু অসাধারণ তীক্ষ্ম ও উজ্জ্বল চোখমুখ। রাগ করতে বা অধৈর্য হতে কেউ কোনদিন তাকে দেখেনি।

বাড়ির মধ্যে বিনতা নামে যে একজন সর্বময়ী কর্ত্রী আছে, মনে মনে সকলে বেশ ভালভাবে সে কথা জানলেও বাইরের থেকে সেটা বোঝবার উপায় ছিল না।

তার কারণ অসাধারণ একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিনতার মধ্যে ছিল।—

কম কথা বললেও যেটা করবার বা করতে চাইবে কিংবা একবার কোন ব্যাপারে মনস্থির করবে, দুনিয়ার কারও সাধ্য ছিল না সেই সংকল্প থেকে স্বল্পভাষিণী সদাহাস্যময়ী বিনতাকে টলাতে পারে।

স্বামী অতুল্য ঠিক বিনতার বিপরীত, লম্বাচওড়া অতীব সুশ্রী পুরুষ। জোরে হাসা ও বেশী কথা বলা একটা স্বভাব, অল্পেতে রেগে ওঠেন, চেঁচা-মেচি করে বাড়ী যেন মাথায় করে তোলেন।

ইদানীং কমলার ব্যাপারে তাঁর কয়েকবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলেও, বিনতা তার স্বাভাবসিদ্ধ মৃদু মিষ্টি হাঁসি দিয়ে বলেছে, বিয়ে-থা না করলে মেয়েমানুষ অমন একটু আধটু সেণ্টিমেণ্টাল, খেয়ালী ও অসংলগ্ন প্রকৃতির হয়ই।

সেই জন্যেই তো চেয়েছিলাম ও বিয়ে-থা করুক, নিজের পছন্দমত দেখে-শুনে যাকে হোক।

তা বললে এখন কি হবে? মনের থেকে বিবাহের তাগিদ ও যতক্ষণ অনুভব না করে, জোরজবরদস্তি করে কোন কিছু করতে যাওয়া কি ভাল হবে—না তাতে ওই-ই সুখী হবে? তাছাড়া বয়সও যথেষ্ট হয়েছে ওর, নিজের

কিসে ভাল আর কিসে মন্দ সেটা এখনও না-ই বোঝে ও বা বুঝতে না চায়, জোর করে কি সেটা ওকে বোঝানো যাবে ?

তোমার কথা যে একেবারে অস্বীকার করি বিনু তা নয়, কিন্তু লোকের মুখে হাত চাপা দেবে কি করে ?

মৃদু হেসে জবাব দিয়েছে বিনতা, লোকের মুখে হাত চাপা দিতে যাওয়া বিড়ম্বনাই মাত্র—সে চেষ্টা না করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

মধ্যে মধ্যে কমলা ও বিনতার পরস্পরের মধ্যেও যে ঐ সম্পর্কে আলোচনা হয়নি তাও নয়।

বিনতা প্রশ্ন করেছে হয়ত, তুমি কি সত্যিই বিয়ে-থা কোন দিনও করবে না ভাই কমলা ? এমনি চিরটাকাল বাউণ্ডুলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াবে ?

হেসে জবাব দিয়েছে কমলা, কে বললে তোমায় এমন কথা বৌদি ?

তাই তো দেখছি—সব কথাই কি বলবার প্রয়োজন হয় ?

দু'চক্ষু দিয়ে আমাদের দেখাটা যে সব সময় সত্য নয়, তা কি তুমি জান না বৌদি ?

তর্ক থাক ভাই, আসল কথটা কি বল তো শুনি ?

আসল বা নকল জানি না বৌদি—সেধে ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে লাভ কি বল, এই তো বেশ আছি।

আবার কখনো হয়ত বিনতা বলেছে, রূপ-যৌবন যে বৃথাই গেল সই।

কে বললে বৃথাই গেল ? তোমার অমন ড্যাবড্যাব দুটো চোখের দৃষ্টি সর্বদাই তো আমার রূপ-যৌবনকে গিলছে।

তাতে আর লাভ কি বল ভাই ? নেহাত অপাত্রে সুধাবর্ষণ হচ্ছে। কিন্তু আমার একটা কথার জবাব দেবে ভাই, ঠাকুরঝি ?

কি ?

পুরুষ-বন্ধু তো শুনি তোমার অনেক। তা তারাই বা কি রকম পুরুষ —কানা নাকি লোকগুলো ?

কেন বল তো বৌদি ?

তাছাড়া কি ! যে রূপের দিকে তাকালে মুনিঋষিরও ধ্যান ভাঙে—কেমন করে সে রূপের দিকে চেয়েও—

আঃ, কি যে বল বৌদি ! ভদ্রলোকদের সম্পর্কে—

রাজা দুষ্মন্তও তো ছোটলোক ছিলেন না ঠাকুরঝি !

আমরা সব্ কমরেড। কাজের কারবারী আমরা সবাই—রূপের কারবারী তো নই।

* * *

কমলা লিখছিল তার জবানবন্দি।

কিরীটীবাবু,

সেদিন আপনাকে থিয়েটারে প্রথম আলাপের সময়ই বলেছিলাম, চাক্ষুষ বা

মৌখিক আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ইতিপূর্বে হবার সৌভাগ্য না হলেও নাম আপনার আমি বহুবার শুনেছি।

এও শুনেছি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নাকি আপনার। দৃষ্টিও আপনার নাকি রঞ্জন-রশ্মির মতই অনেক কিছুকেই ভেদ করে যেতে পারে। কিন্তু যাক্ গে সে-সব কথা।

আমায় একটা জবানবন্দি দিতে হবে। কিন্তু তারও আগে বলে রাখি, 'নন্‌সেন্স ক্লাবে'র সভ্যদের আমি একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও—ঠিক ক্লাবের সভ্যতালিকাভুক্ত কিন্তু নই। তবে দু'দিনই যখন উপস্থিত ছিলাম তখন জবান-বন্দি একটা আমাকে দিতে হবেই এবং দিতে বসেছিও কাগজকলম নিয়ে—এবং ওদের সকলেরই বিশেষ প্রিয় ও বন্ধু যখন আমি। কিন্তু কি যে লিখব জানি না, কারণ বুঝতে পারছি না আমার লেখবার মতো কিই বা আছে।

এগারোজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মধ্য থেকে দু'জন নিষ্ঠুরভাবে বিষে নিহত হয়েছে এবং যখন আমাদের প্রত্যেকেরই জবানবন্দি দিতে হচ্ছে তখন এ ধরনের জবানবন্দির কতটুকু মূল্য আছে বলতে পারেন ?

বন্ধুকে হত্যা যদি বন্ধু হয়ে করেও থাকি, নিশ্চয়ই সে কথা কেউ স্বীকার করব আশা করতে পারেন না—বিশেষ করে আপনার মত কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং তাই যদি হয় তা হলে বলুন তো এ জবানবন্দির কতটুকুই বা মূল্য আছে ?

তবু দিতে হবে যখন লিখছি।

মানুষের মন বড় বিচিত্র মিঃ রায়, তাই জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলে থাকেন—মানুষের মন না মতি !

সৌরেশের মৃত্যুটা যেমন আকস্মিক তেমনি shocking। এখনও যেন চোখের ওপরে সৌরেশের শোচনীয় মৃত্যুর ব্যাপারটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

খেতে বসবার কিছুক্ষণ আগে রান্নাঘরের দিকে একবার আমি গিয়েছিলাম, অত্যন্ত পিপাসা পেয়েছিল তাই। চাকরটার কাছে জল চাইলাম, কিন্তু চাকরটা রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিল—আমি পাশের ঘর থেকে নিজেই জল নিয়ে পান করি।

স্পষ্ট মনে আছে ফ্রিজের কাছেই একটা টুলের উপর শূন্য জলের গ্লাস-গুলো ধোয়া উবুড় করা ছিল, তারই একটা গ্লাস নিয়ে,—পাশের একটা কাচের জারে জল ভর্তি করে ফ্রিজে রাখা ছিল—তা থেকে জল ঢেলে পান করে ফিরে আসি।

আরও কিছুক্ষণ পরে সকলে আমরা খাবার জন্যে পাশের কক্ষে যাই অনিলের আহ্বানে।

যতদূর জানি বঙ্কিম নামে অনিলের চাকরটাই গ্লাসে গ্লাসে জল ঢেলেছিল এবং জল সেই কাচের জারটা থেকেই ঢালা হয়েছিল ! তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে নির্দিষ্ট একটা গ্লাসে জল ঢালবার পর নিশ্চয়ই গ্লাসে বিষ মেশানো

হয়েছিল [অবশ্য আপনার কথাই যদি ধরে নেওয়া হয় যে জলের সঙ্গে বিষ প্রয়োগেই] এবং যার সাহায্যে সৌরেশের মৃত্যু ঘটানো হয়েছে।

কিন্তু সকলেই তো আমরা পাশের ঘরে ছিলাম, তবে কে নির্দিষ্ট গ্লাস-টিতে গিয়ে বিষ মিশিয়ে এল এবং বিষ নিশ্চয়ই যখন মেশানো হয়েছিল গ্লাসে জল দেওয়ার পর, তখন সেটা কেই বা করতে পারে ?

অবশ্য আমাদেরই যখন সন্দেহ করা হয়েছে এক্ষেত্রে বিষপ্রয়োগকারী হিসাবে, তখন আমরাই কেউ নিশ্চয়ই বিষ মিশিয়েছি এবং আমাদের মধ্যে সেটা কার পক্ষে সত্য সম্ভব ছিল, সেটার একটা মীমাংসায় পেঁছিবার জন্যেই তো আপনার আমাদের কাছে এই জবানবন্দি চাওয়া !

যদি ধরুন আমিই মিশিয়ে থাকি বিষ, সেক্ষেত্রে একটা কথা ভেবে দেখেছেন কি, ঠিক নির্দিষ্ট গ্লাসেই বা কি করে আমি বিষ মেশালাম ! আমি তো আর গণৎকার বা যোগী নই যে সৌরেশ কোন্ আসনে গিয়ে বসবে এবং কোন্ গ্লাসটি তার ভাগ্যে পড়বে সেটা আগে থেকে জেনেই গ্লাসে বিষ মিশিয়ে দেব ? গ্লাসটা তো আমার ভাগ্যেও পড়ত পারত ? উদ্দেশ্য বা motiveয়ের কথা এক্ষেত্রে না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু এমন কে বোকা হবে বলুন তো নিজের জীবনকে ওভাবে risk করবে ! বিবেচনা করে দেখুন মিঃ রায়, ব্যাপারটা কি রকম কঠিন ও অসম্ভব।

তাছাড়া একটা কথা নিঃসংকোচে এখানে আমি আপনাকে বলছি, শিশিরকে আমি ভালবাসতাম, হ্যাঁ, সমস্ত প্রাণ দিয়েই তাকে ভালবাসতাম। স্ত্রীলোক কোন পুরুষকে এতখানি ভালবাসতে পারে প্রাণ দিয়ে কিনা জানি না—শিশিরকে আমি যত ভালবাসতাম। আমার ধারণা ছিল শিশিরও বুঝি প্রাণ দিয়েই আমাকে ভালবাসে। কিন্তু ইদানীং শিশির নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধার করে কলকাতায় ফিরে আসবার পর জানতে পারি, আমি শিশিরকে যেমন ভালবাসি শিশির আমাকে তেমন তো দূরে থাক, তার অর্ধেকও ভালবাসে না, কারণ তখন সে অভিনেত্রী সরমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

আমার পক্ষে এ যে কত বড় মর্মান্তিক, কত বড় দুঃসহ অপমান, সে আপনাকে আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না মিঃ রায়।

পরে জানতে পেরেছি শিশিরের সঙ্গে সরমার প্রেমের খেলা অনেকদিন ধরেই চলছিল।

রঙ্গমঞ্চে শিশিরের অতুলনীয় অভিনয় দেখে আমরা মুগ্ধ, চমৎকৃত হয়েছি—কিন্তু কেউ কি আমরা জানতাম সত্যিকারের জীবনেও শিশির কি দক্ষ অভিনয়ই না করতে পারে ! দিনের পর দিন সে আমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে গিয়েছে ? কে অন্তরের মধ্যে ভালবাসার কথামাত্র না থেকেও মুখে কত ভালবাসাই না দেখিয়েছে ? থাক্ গে সে সব কথা।

শুধু আমার সঙ্গে কেন, বোধ হয় সরমার সঙ্গেও—কারণ আজ বুঝতে পারছি জীবনটাকে শিশির সত্যি অভিনয় বলেই মনে করত।

জানেন মিঃ রায়, পুরুষ মাত্রেই মধুলোভী।

ওটা তাদের সহজাত প্রবৃত্তি, যে কোন নারীর প্রেমেই যেমন তারা মুহূর্তে গদ্‌গদ হয়ে উঠতে পারে তেমনি আবার তাকে ভুলতেও পারে, মুহূর্তে করতে পারে উপেক্ষা বা অবহেলা।

এটা জানবেন প্রত্যেক পুরুষেরই অবচেতন মনে ও-সম্পর্কে একটা 'ভ্যানিটি' আছে—নারীকে তারা জয় করেছে, নারীকে তারা জয় করে।

এরপর কতকগুলো লাইন কাটাকুটি করেছে কমলা।

তারপর আবার লিখছে।

সৌরেশের মৃত্যুর ব্যাপারে কোন আলোই নিক্ষেপ করতে আমি পারব না মিঃ রায়, কারণ সত্যিই কিছু ও-সম্পর্কে আমি জানি না।

তবে একটা কথা আমার মনে হয়, সৌরেশ বোধ হয় মালবিকাকে ভালবাসত! মালবিকা হয়ত ও-সম্পর্কে কিছু বলতেও বললে পারে।

শিশিরের সঙ্গে অভিনয়ের দিন দ্বিপ্রহরে ওর বাসায় আমার দেখা হয়েছিল।

আমি শিশিরের সঙ্গে—বলতে ঘৃণা ও লজ্জায় মাথা হেঁট হচ্ছে—অভিনেত্রী সরমা ও আমার ব্যাপারের একটা মীমাংসার জন্যেই গিয়েছিলাম।

কিন্তু শিশির যেন ব্যাপারটাতে তেমন কোন গুরুত্ব দিতে চাইলে না। তার চিরদিনকার স্বভাব যেমন to take everything easy—তেমনই যেন হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল।

অভিনয়ের সময় হয়ে আসছিল, আমিও তেমন পীড়াপীড়ি না করে ঐদিন অভিনয়ের পর আমার বাসায় যাবার জন্যে একটিবার আমন্ত্রণ জানিয়ে চলে এলাম। এবং ওঠবার সময় মনে হল যেন সুজিতকে দেখেছিলাম।

কিন্তু তখন তো জানি না, তার শেষের মুহূর্তটি অত কাছে ঘনিয়ে এসেছে। তা যদি জানতাম কিছুতেই তাকে কাছছাড়া করতাম না।

শিশিরের ব্যবহারে সত্যিই আমি বিশেষ মর্মাহত ও ব্যথিত হয়েছিলাম। শিশিরের ওখান থেকে ফিরে সোজা আমি অভিনেত্রী সরমার ওখানে যাই। সরমা কিন্তু তার আগেই থিয়েটারে চলে গিয়েছে।

ইচ্ছা ছিল থিয়েটারের পর তার সঙ্গে একবার দেখা করে তার, আমার ও শিশিরের সম্পর্কটার একটা আলোচনা করব, কিন্তু পরে আর তা প্রয়োজন হল না।

শিশিরের আকস্মিক নাটকীয় মৃত্যু সকল প্রশ্নের মীমাংসাই করে দিয়ে গেল।

সৌরেশ ও শিশির সম্পর্কে এর চাইতে বেশী কিছুই আমি জানি না।

নমস্কার জানবেন—

তেরো

হিরণ্ময়ের বাড়িতেই আছে সৌমিত্র।

অনেক রাত পর্যন্ত সৌমিত্র ছাদের ওপরে পায়চারি করে একাকী। অন্ধকার রাত্রি। ঊর্ধ্বে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত তারকাগুলি কালো নভোতলে কেমন নিঃসঙ্গ, একক মনে হয়।

নীচে হিরণ্ময়ের ঘরে আলো জ্বলছে, হিরণ্ময় এখনও জেগে আছে। জবানবন্দি লিখছে না তো!

কি খেয়াল হল, সৌমিত্র নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল।

হিরণ্ময়ের ঘরের দরজা বন্ধ, কিন্তু জানালা খোলা। খোলা জানালাপথে আলো দেখা যাচ্ছে ঘরে। পা টিপে টিপে, জানালার ধারে এগিয়ে গেল সৌমিত্র। জানালাপথে উঁকি দিয়ে দেখলে হিরণ্ময় গভীর মনোযোগের সঙ্গে কি যেন লিখছে?

আবার সৌমিত্র নিঃশব্দ পায়ে ফিরে এল ছাতে।

হিরণ্ময় বোধ হয় জবানবন্দিই লিখছে, তাকেও লিখতে হবে এবং আজই রাত্রে।

নির্দিষ্ট ঘরে এসে প্রবেশ করলে সৌমিত্র। ঘরের খিল ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে আলো না জ্বেলেই অন্ধকার কক্ষের মধ্যে সৌমিত্র কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

দশটি প্রাণপাত্র যেন সুধায় ভরে ছিল, কোথা থেকে এক অদৃশ্য কালো হাত এসে সেই সুধাপাত্রগুলির দুটির মধ্যে তীব্র হলাহল মিশিয়ে গেল।

দশটি সুধাপাত্রের মধ্যে দুটি সুধাপাত্রের সুধা সেই বিষে বিষাক্ত হয়ে গেল।

বাইরে কোথায় একটা রাত-জাগা কুকুর নৈশ রাতের অখণ্ড স্তব্ধতাকে দীর্ণ করে আর্ত করুণ সুরে যেন উঁ-উঁ করে কেঁদে উঠল।

সৌমিত্র সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে, সুটকেসের ভিতর থেকে প্যাড ও কলম নিয়ে শয্যার উপরে এসে বসল।

সম্মুখে প্যাডের কাগজ প্রসারিত, হাতে ঝরণা-কলম, অনেকক্ষণ স্থাণুর মত বসে রইল সৌমিত্র।

কি লিখবে সে?

কি-ই বা জানে?

সহসা এক সময় সৌমিত্র খসখস করে প্যাডের কাগজে লিখে চলল।

কিরীটীবাবু,

সৌরেশের মৃত্যুর দিন অর্থাৎ অনিলের জন্মতিথি উৎসবের রাত্রে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না আপনি আগেই শুনেছেন, অতএব সৌরেশের মৃত্যু সম্পর্কে কোন কিছুই আপনাকে আমি বলতে পারব না।

আর শিশিরের মৃত্যুর দিন আমিও বক্সে উপস্থিত ছিলাম সবার মত আপনি তাও জানেন। কিন্তু মনটা এমন বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল সেদিন ঐ সময়টা যে সেখানে উপস্থিত থাকলেও কোন দিকে নজর দেবার মত অবস্থা আমার ছিল না। কারণ সৌরেশের মৃত্যুসংবাদ আমাকে এতটা বিচলিত করেছিল যে, কিছুতেই যেন মনের মধ্যে শান্তি পাচ্ছিলাম না। অভিনয়ের সময়ই দীর্ঘ দু মাস বাদে সর্বপ্রথম মঞ্চের উপরে শিশিরকে দেখলাম। তারপর শিশিরের আকস্মিক মৃত্যু যখন ঘটল তখন বক্সেই বসে, সুতরাং শিশিরের মৃত্যু সম্পর্কেও আপনি যতই বলুন না কেন আমি বিশ্বাস করি না যে আমরাই কেউ আমাদের অন্তরঙ্গ দুটি বন্ধুকে বিষ দিয়ে হত্যা করেছি। নিজে তো আমি করিইনি, আমাদের মধ্যে অন্য কেউ ঐ দুষ্কার্য করেছে তাও বিশ্বাস করি না আমি।

অতএব নমস্কার—

সৌমিত্র

জবানবন্দি লিখছিল শিল্পী অনিল চৌধুরী।

প্রিয় কিরীটীবাবু,

আমার সৌরেশের মৃত্যুর ব্যাপারে যা কিছু আপনাকে জানাবার ছিল সবই তো অকপটে সেদিন জানিয়েছি। তবু আবার বলি যদি কিছু আরও ও সম্পর্কে আপনার জানবার থাকে আমাকে আপনি যে কোন সময় জিজ্ঞাসা করলেই জবাব দেব।

কোন কথাই আমি গোপন করিনি, ভবিষ্যতেও করব না জানবেন।

সৌরেশের মৃত্যুর ব্যাপারটা বিশেষ করে আমার পক্ষে যে কত বড় মর্মান্তিক ও লজ্জার ব্যাপার সে তো আপনাকে পূর্বেই আমি বলেছি।

ঘটনা-পরিস্থিতি থেকে যখন বোঝা যাচ্ছে আমাদের মধ্যেই কেউ একজন আমাদের দু বন্ধুকে খুন করেছি তখন অন্যের কথা জানি না, যদি আমি নিজেই খুন করে থাকি সৌরেশকে তাহলে আমাকে ধরিয়ে আপনি ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিন কিরীটীবাবু, আপনাকে আমি প্রাণ খুলে ধন্যবাদ জানিয়ে যাব মরবার আগে।

আর হতভাগ্য শিশির!

হায় রে! থিয়েটারে যাবার মুহূর্তেও যদি জানতে পারতাম আর একটি নিষ্ঠুর, পৈশাচিক হত্যাদৃশ্য চোখের ওপরে আমাকে বসে দেখতে হবে, বিশ্বাস করুন কিরীটীবাবু, আমি নিশ্চয়ই থিয়েটারে সেদিন যেতাম না।

চোখের ওপরে অমনি করে বসে বসে আর একটি প্রিয়তম বন্ধুর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড নিশ্চয়ই দেখতাম না।

জবানবন্দি নতুন করে আর কি ই বা লিখে আপনাকে জানাব কিরীটীবাবু! এই হীন, জঘন্য হত্যাকাণ্ডের যাহোক একটা কিছু মীমাংসা আপনি করে দিন, এই শুধু অনুরোধ আমার।

বলে দিন—আমাদের মধ্যে কে আমাদের দুটি বন্ধুর হত্যাকারী।

কে আমাদের এই আটজনের মধ্যে দুটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর পানীয়ের মধ্যে বিষ-প্রয়োগ করেছি? কে আমাদের মধ্যে এতটা নীচে নেমেছি, কে সেই শয়তান? কিরীটীবাবু, আবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই, এক একটা মীমাংসা করে দিন, যে পারিশ্রমিক আপনি চান আমি দেব। আমার যথাসর্বস্ব দেব।

জানেন না কিরীটীবাবু, কি দুঃস্বপ্ন শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সর্বদা ভৌতিক ছায়ার মত আমাকে অনুসরণ করে ফিরছে!

চোখ বুজলেই আমি দেখতে পাই হতভাগ্য সৌরেশের মৃত্যুযন্ত্রণাকাতর মুখচ্ছবি। কানে আসে সেই শেষ মুহূর্তের বেদনার্ত অস্ফুট চিৎকার।

বদ্ধ ওষ্ঠের পাশ দিয়ে সেই রক্তাক্ত লালার ক্ষীণ রেখা। মুষ্টিবদ্ধ সেই দুটি হাত। কি দুঃসহ যন্ত্রণায় সর্বদেহের এই নিদারুণ আক্ষেপ—সেই কুণ্ডন।

চক্ষুর সে কি বিস্ফারিত ভয়াবহ দৃষ্টি।

না না কিরীটীবাবু, আমি ভাবতে পারি না, ভাবতে পারি না সে দৃশ্য।

মুক্তি দিন আমায়—মুক্তি দিন, বাঁচান। ইতি—

অনিল

মালবিকার জবানবন্দি।

হিরণ্ময়ের আদেশেই এই জবানবন্দি লিখছি আমি।

যে রকম ভয়াবহ ও পৈশাচিক মৃত্যু ঘটে গেল সৌরেশ ও শিশিরের এবং ব্যাপারটা এত আকস্মিক এত অচিন্তনীয় যে এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।

আসলে বিশ্বাস করতে যে পারছি না তা নয়, বিশ্বাস করতে যেন মনই চাইছে না।

যদিচ জানি কারও ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপারে কারও কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না এবং সৌরেশ ও শিশিরের মৃত্যুর ব্যাপারে একান্তভাবেই সেটা অবান্তর, তথাপি বলছি এইজন্যে যে আমাদের এগারটি বন্ধু ও বান্ধবী—আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি কোন ব্যাপারই গোপন করবে না।

অকপটে সবাই যার যা জানা আছে স্বীকার করবে।

এবং সেই স্বীকারোক্তিতে অনুসন্ধান বা হত্যার মীমাংসার ব্যাপারে কারও কোন সুবিধা হবে কি না জানি না, তবে এটা ঠিক, এর দ্বারা আমাদের অনেকেরই মানসিক বিশ্লেষণের ব্যাপারটা আপনার কাছে অন্ততঃ সহজ ও সরল হয়ে যাবে।

আমাদের দেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় বয়স্ক পুরুষ ও নারীর মধ্যে আর যাই হোক, সহজ সখ্যতা ও প্রীতির সম্পর্ক কখনও গড়ে ওঠে কিনা সে সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহই আছে। কোন তরুণ যে কোন

তরুণীকে কেবল বান্ধবী হিসাবেই গ্রহণ করতে পারে—কথাটা আরও একটু ভেঙে সরল করে বলি, দেহকে বাদ দিয়ে কেবল মনের দিক দিয়ে বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারে বলে আজও আমার বিশ্বাস হয় না।

এবং আমাদের 'নন্‌সেন্স ক্লাবের' বন্ধুরাও সেই কথাটি একে একে আমার সম্পর্কে প্রমাণ করেছিল।

কথাটা খুলেই বলি।

অজিতা ও ভবানীর বিবাহের রাত্রে সর্বপ্রথম সৌরেশই আমায় বিবাহের প্রস্তাব করে, কিন্তু আমি হেসে কৌশলের সঙ্গে সৌরেশকে নিবৃত্ত করি।

স্পষ্টই তাকে আমি বলেছিলাম, বিবাহ ব্যাপারে আমি কখনও বিশেষ করে যেমন কোনদিন ভাবিনি, তেমনি মনের দিক থেকে কোন তাগিদও অনুভব করিনি এখন পর্যন্ত।

এর পর প্রস্তাব নিয়ে এল সৌমিত্র।

সৌমিত্র কিন্তু ব্যাপারটা ঐখানেই শেষ করতে পারেনি যদিচ আমি তার প্রস্তাবেরও একেবারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিই করে দিয়েছিলাম সঙ্গে সঙ্গে॥

অস্বীকার করব না অবশ্য, সৌরেশ খোলাখুলি ও স্পষ্টভাবে দ্বিতীয়বার আর ও-সম্পর্কে আমাকে কোন কথা না বললেও হাবেভাবে, ঠারেঠোরে মনোগত ইচ্ছাটা তার আমার প্রতি চেপে রাখতে পারত না।

অনিল ও হিরণ্ময়ও পত্র মারফৎ আমাকে জানিয়েছিল, তারা আমাকে ভাল -বাসে, আমাকে তারা বিবাহ করতে চায়।

বলা বাহুল্য, তাদের পত্রের জবাব আমি দিইনি। দেবার কোন প্রয়োজনও বোধ করিনি।

বলছিলাম সৌমিত্রই কেবল চুপ করে থাকেনি।

সৌমিত্র কিন্তু আমার নীরবতাকে মেনে নিতে পারলে না, বারংবার নান-ভাবে অনুরোধ জানাতে লাগল এবং শেষটায় কতকটা আমাকে বাধ্য হয়েই তাকেও অন্যান্যদের মত জবাব দিতে হয়েছিল, আমি বিবাহ করব না।

ছাড়বার পাত্র নয় ও। প্রশ্ন করলে, কেন?

তার কারণ আজ পর্যন্ত বিবাহের ব্যাপারে কোণ তাগিদই অন্তর থেকে আমি পাইনি। নিজের সহজ ও সরল জীবনটাকে আর একজনের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আমি মিথ্যে জটিল করে তুলতে চাই না, তাছাড়া বন্ধুর স্বামীর আসন গ্রহণ না করাই ভাল, বিশেষ করে যখন সেই বন্ধুদেরই আরও ছ'জন বন্ধু আমাকে বান্ধবী বলে দাবি করে।

তারা এতে সুখীই হবে জেনো মালবিকা। সৌমিত্র বলেছিল।

গ্যারাণ্টি দিতে পার কি?

যদি বলি পারি—

তবে বলব বিশ্রী রককের একটা ভুলকে তুমি প্রশ্রয় দিতে চলেছ।

এ কথা বলছ কেন মালবিকা?

যাক, কৌতূহলটা বড় বিশ্রী জিনিস। জীবনে অনেক সময় অচিন্তনীয়, আকস্মিক চরম আঘাতকে ঐ কৌতূহলই টেনে আনে।

এতেও সৌমিত্র নিবৃত্ত হল না। এখান থেকে স্বেচ্ছায় নিজে পাটনায় বদলি হয়ে গেল এবং যাবার আগে একখানা চিঠি দিয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবেই জানিয়ে গেল, সে আমাকে চিরদিনই ভালবাসবে, তা থেকে কেউ তাকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। এবং যত দূরেই সে থাক না কেন, এই ধারণা নিয়েই সে যাচ্ছে—একদিন তার পরীক্ষার অবসান হবে, আমাকে তার কাছে ধরা দিতেই হবে।

সৌমিত্র চিন্তাশীল নয়, অত্যন্ত ভাবুক প্রকৃতির।

বাদ গিয়েছে এ-ব্যাপারে মাত্র তিনজন—বিনয়, সুজিত কর ও ভবানী রায়।

ভবানী প্রথম থেকে আকৃষ্ট ছিল অজিতার প্রতি। কিন্তু শ্রদ্ধা করি আমি বিনয় ও সুজিতকে। আমার একান্ত নিজস্ব ও ব্যক্তিগত ব্যাপারটা না জানালেও চলত, কিন্তু জানালাম যাতে করে আপনার কাছে এ সময় সকলেরই মনের একটা দিক অন্ততঃ গোপন আর থাকবে না। .

* * *

শিশিরের মৃত্যুর ব্যাপারে কোন কিছু আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারব বলে তো আমার মনে হয় না। কারণ সৌরেশের মৃত্যুর পর থেকে শিশিরের মৃত্যু পর্যন্ত আমার সঙ্গে শিশিরের আর একবারও দেখা হয়নি।

সৌরেশের মৃত্যুর দিন পাশাপাশিই ছিলাম সব এবং গানের আসর থেকে উঠে একবার বাথরুমে গিয়েছিলাম, কিন্তু জলের গ্লাসের সঙ্গে চোখোচোখিও আমার আহারে বসবাস পূর্বে হয়নি।

কাউকে সন্দেও করি না এবং সন্দেহজনক কিছু করতেও দেখেনি কাউকে।

অবশ্য কমলাকে একবার না দুবার ঘরের বাইরে যেতে দেখেছি। দুবার এইজন্যে বলছি, প্রথমবার ঘর থেকে বের হয়ে কিছুক্ষণ পরে ঘরের দরজা পর্যন্ত ফিরে এসে আবার তক্ষুনি ঘরে না প্রবেশ করে ফিরে যেতে দেখেছি এবং মিনিট পাঁচেক বাদে আবার ফিরে আসতে দেখেছি ঘরের মধ্যে।

কমলার সঙ্গে পরিচয় হয় আমার 'নন্‌সেন্স ক্লাবে'ই। পূর্বে পরিচয় ছিল না।

অস্বীকার করব না, কেন যেন কোন দিনই মনে মনে ওকে আমি পছন্দ করিনি।

কেন যেন করিনি আজও তা বলতে পারব না, কারণ তার হেতুটা মনের মধ্যে আজও আমার সুস্পষ্ট নয়। কমলাকে কি আমি হিংসা করি? না, কই তাও তো নয়! হিংসা করবই বা কেন?

অর্থ তার প্রচুর আছে স্বীকার করি, কিন্তু অর্থের প্রতি কোন মোহ আমার কোন দিনই নেই।

বিদ্যা, ছাত্রী হিসাবে আমার চাইতে কোন দিনও তার বেশী সুনাম নেই। তবে হ্যাঁ, রূপ তার আছে। চোখ-ঝলসানো, পুরুষের মন-ভোলানো রূপ তার আছে বটে। রূপের দেমাকও তার যথেষ্ট। সুন্দরী সে। পুরুষমানুষ তো ছার, আমাদের মেয়েদেরও চোখে তার রূপ প্রকট হয়ে ওঠে। তাই বলে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার কি কেবলমাত্র ঐ রূপে, বাহ্যিক রূপের জৌলুসেই যাচাই হবে?

মনের কোন দামই কি রূপের কাছে নেই?

বাইরের পোশাকটা নিয়েই চিরকাল সকলে টানাটানি করবে, ভিতরের আসলটুকুর কোন সংবাদই নেবে না?

হ্যাঁ, বলছিলাম কমলাকে কোন দিনই আমি পছন্দ করিনি।

করিনি তার স্বৈরিণীর মত আচরণের জন্যে।

চোখ-ঝলসানো রূপ ও সুগঠিত দেহের দেমাকে সে যেন সর্বদাই আত্মসচেতন হয়ে থাকে। আঘাত হেনে যেন বলতে চায়, দেখ—আমায় দেখ!

তবু আশ্চর্য, এত রূপ, দেহের এত প্রাচুর্য নিয়েও সে একমাত্র আমাদের দলে শিশিরকে ছাড়া কাউকেই আকর্ষণ করতে পারেনি!

শিশির বন্ধু হলেও যে জগতে, যে সমাজে সে ঘোরাফেরা করত, সে এক অন্ধকার, অপরিসর গলিপথ ছাড়া তো আর কিছুই নয়! রঙ্গমঞ্চ বা পর্দার জগতে যারা, বিশেষ করে আমাদের দেশে আজও চলাফেরা করে, শিক্ষা বলুন, রুচি বলুন, কোন দিক দিয়েই কি তারা শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে?

শিশিরের শিক্ষা ছিল মানি, মানি সে অভিজাত বংশের সন্তান—কিন্তু সমাজের যে স্তরে সে চলাফেরা করত বা তার কর্মজগতে যারা তার প্রতিবেশী বা সহকর্মী ছিল, তাদের প্রভাব থেকে কেমন করে নিজেকে সে মুক্ত করবে!

সেও রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ তো—রক্ত-মাংসের দাবিকে সে অস্বীকার করবে কি করে?

* * *

শিশিরের মৃত্যুর ব্যাপারে সঠিক যদিচ আমি জানি না তবু একটা কথা মনে হয়, ওর সহ-অভিনেত্রী সরমার কথাটা ভুলে যাবেন না। শুনেছি অভিনেত্রী সরমা নাকি ওর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিল।

তবু বলতে দ্বিধা নেই, শিশিরের অমন নিষ্ঠুরভাবে বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যুর ব্যাপারটাও কম পরিতাপের বিষয় নয়।

তবে ও-সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, কারণ সেদিন থিয়েটারে বক্সে আগাগোড়াই ছিলাম।

সৌরেশের মৃত্যুর ব্যাপারে আমি কাউকেই সন্দেহ করতে পারি না।

হিরণ্ময়, অনিল, সৌমিত্র সন্দেহের বাইরে।

বিনয় ও সুজিত কর আমার বন্ধু হলেও মনের দিক দিয়ে তেমন কোন ঘনিষ্ঠ-তাই ওদের দুজনের সঙ্গে আমার ছিল না।

বিনয়ের অন্য কোন দোষ আছে বলে আমার মনে হয় না, তবে একটু ভীরু-

প্রকৃতির বলেই মনে হয়, তাছাড়া যে মদ খায় তার চরিত্রও যে খুব নির্মল থাকতে পারে এ যেন আমার ধারণারও অতীত।

সুজিত কর—লক্ষ্য করবেন, অল্প বয়সে সাহিত্যজগতে সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে বলে ভীষণ দাম্ভিক। তার ধারণা বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে সে অনাগত এক দিক্‌পাল। এবং এমন একদিন শীঘ্রই আসবে যেদিন সমগ্র বাংলা কেন, সমগ্র ভারতও তার সাহিত্যের প্রতিভার প্রতি বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে।

তথাপি বিনয় বা সুজিত করের মধ্যে কেউ খুন করতে পারে, বিশেষ করে আমাদের এতদিনের দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে, বিশ্বাস করতে মন চায় না।

পরিশেষে একটা কথা বলে শেষ করব—এ রহস্যের মীমাংসা সত্যিই মনে-প্রাণে আমি চাই।

দোষী ধরা পড়ুক, তার শাস্তি হোক। ইতি --

মালবিকা

চোদ্দ

সকলের জবানবন্দিগুলো ভিন্ন ভিন্ন খামে ভরে খামের মুখ বেশ ভাল করে এঁটে পরের দিন সকলেই হিরণ্ময়ের হাতে তুলে দিল।

হিরণ্ময়ও আর দেরি না করে খামগুলো নিয়ে কিরীটীর বাসার উদ্দেশে রওনা হয়।

* * *

ঐদিন দ্বিপ্রহরে কিরীটী একটার পর একটা জবানবন্দি মনোযোগের সঙ্গে একবার করে প্রথমে আগাগোড়া পড়ে গেল।

দ্বিতীয়বার পড়বার সময় একটা লাল পেনসিল দিয়ে জবানবন্দিগুলোর কোন কোন জায়গায় দাগ দিয়ে যেতে লাগল। এবং লাল পেনসিল দিয়ে জবানবন্দির দাগ দেওয়া অংশগুলো একটা নোটবইতে প্রত্যেকের নামের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে লিখে লিখে, তার পাশে পাশে আবার নিজস্ব সব মন্তব্য লিখতে লাগল।

প্রত্যেকের বিভিন্ন জবানবন্দি থেকে একটা জিনিস যা কিরীটীর কাছে কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটা হচ্ছে হিরণ্ময়, অনিল, সুজিত, ভবানী, বিনয়, মালবিকা, অজিতা, সৌমিত্রের ও কমলার মনোগত স্বাভাবিক বৃত্তিটা।

কমলা 'নন্‌সেন্স ক্লাবে'র পুরোপুরি একজন তালিকাভুক্ত সভ্যা না হলেও এদের প্রত্যেকেরই বিশেষ পরিচিত ও বন্ধুস্থানীয়।

'নন্‌সেন্স ক্লাবে' যাতায়াত তো তার ছিলই এবং মাত্র দু'বছরের মধ্যেই ঘনিষ্ঠও হয়ে উঠেছিল যথেষ্ট। দশটি বন্ধু থেকে ও এতটুকুও পৃথক তো ছিলই না বরং বলা চলতে পারে ঘনিষ্ঠতার দিক দিয়ে কমলা ছিল দশের পরেই দলের মধ্যে একাদশ যেন।

সৌরেশ ও শিশির উভয়েরই মৃত্যুর সময় অকুস্থানে কমলা উপস্থিত ছিল।

সৌরেশ ও শিশিরের মৃত্যুর ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা যেটা জটিল বস্তু সেটা হচ্ছে, দশটি বাঁদরের মূর্তি থেকে দুটি আশ্চর্যজনক ভাবে নিখোঁজ।

সত্যিই সৌরেশ ও শিশিরের মৃত্যুর সঙ্গে ওই দুটি বাঁদরের মূর্তির অপসারণের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে কি না?

মনে মনে আগাগোড়া দুটি মৃত্যুর ব্যাপার বিশ্লেষণ করে দেখলে কার সম্পর্কে কি ভাবা যেতে পারে?

প্রথমেই ধরা যাক হিরণ্ময়কে—হিরণ্ময় তার যথেষ্ট না হলেও পরিচিত, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, সৎচরিত্র বলেই কিরীটী জানে এবং হিরণ্ময়ই নিজে যেচে এসে বন্ধুর হত্যার ব্যাপারে মীমাংসা করতে কিরীটীর সাহায্য চেয়েছে বা বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছে। হিরণ্ময় সহজ ও সরল প্রকৃতিরই বলে মনে হয়। কেবল একটা ব্যাপারে হিরণ্ময় সেদিন সত্য নয় জেনেও চুপ করে ছিল কেন এখনো বুঝতে পারেনি কিরীটী। 'নন্‌সেন্স ক্লাবে'র কথা ওঠায় অনিল চৌধুরী কমলার নাম সভ্য হিসাবে করেছিল হিরণ্ময়ের উপস্থিতিতেই। হিরণ্ময় কোন প্রতিবাদ জানায়নি সেদিন। পরে সে-ই বলেছিল কমলা তালিকাভুক্ত সভ্যা না হলেও ক্লাবের একজন বলেই পরিগণিত হত। হিরণ্ময়ের এ আচরণের অর্থ কি? দ্বিতীয়তঃ, হিরণ্ময় একদা মালবিকাকে চিঠি দিয়ে প্রেম নিবেদন করেছিল সেকথা সে হঠাৎই বা স্বীকার করতে গেল কেন? তবে কি আজও মালবিকার উপরে হিরণ্ময়ের কোন দুর্বলতা অবশিষ্ট আছে? তৃতীয়তঃ, অনিলের বাড়িতে উৎসবের রাত্রে হিরণ্ময়—সকলে যখন ভোজনে বসে তখন সে সৌরেশের এক পাশে ছিল, কথাবার্তার মধ্যে সকলেই যখন মশগুল সেই সময় কোন এক ফাঁকে হিরণ্ময়ের পক্ষে জলের গ্লাসে বিষ মিশিয়ে দেওয়া এমন কিছু অসম্ভব ছিল না। চতুর্থতঃ, শিশিরের মৃত্যুর পূর্বে এক-মাত্র হিরণ্ময়, সুজিত ও কমলার সঙ্গেই শিশিরের দেখা হয়েছিল। অবশ্য এ সব ওদের জবানবন্দি থেকেই জানা যায়।

হিরণ্ময় যে শিশিরের পরলোকতত্ত্ব ও তার বিশ্বাস সম্পর্কে তার জবান-বন্দির মধ্যে লিখেছে তা সত্য হলেও ঠিক কি ও বলতে চেয়েছে? এবং হিরণ্ময়ের কাছে ক্লাবঘরের চাবি যখন একটা ছিল, বাঁদরের মূর্তি দুটো সরিয়ে নেওয়াটাও তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না হয়ত।

দ্বিতীয়তঃ আসা যাক সুজিত করের জবানবন্দিতে ঃ ঔপন্যাসিক হিসাবে সে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সুনাম ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে সত্য এবং সে ভ্যানিটিও তার প্রচুর আছে। শিশিরের মৃত্যুর দিন সুজিত তার অর্থাৎ শিশিরের গৃহে যায়। চোরের মত সুজিত, কমলা ও শিশিরের কথা আড়াল থেকে আত্মগোপন করে শুনেছে। হিরণ্ময়ের জবানবন্দি থেকে জানা যায়, সুজিত একবার নাকি অনিলের বাড়িতে উৎসবের রাত্রে গান-বাজনার আসর থেকে বাইরে উঠে যায়। সুজিতের পক্ষে সেদিক দিয়ে সৌরেশ ও শিশিরের

জলে ও চায়ে বিষ মিশিয়ে দেওয়াটা অসম্ভব কিছু নয় এবং সুজিতের কাছে চাবি ছিল যখন—ক্লাবঘর থেকে সেক্ষেত্রে বানরের মূর্তি চুরি করাটাও অসম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ ধরা যাক অনিল চৌধুরীকে ঃ চিত্রকর—শিল্পী মানুষ, সেণ্টি-মেণ্টাল ও কিছুটা ভীরু প্রকৃতির হওয়াই সম্ভব। জন্মতিথি উৎসবে বন্ধুদের ডেকে এনে একজনকে বিষ দিয়ে হত্যা করবে মোটেই তার মত মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। অবশ্য হত্যা করলে তার মত বিষপ্রয়োগের সুবিধা আর কারুরই ছিল না।

সৌরেশের মৃত্যুর ব্যাপারে তাকে সন্দেহ করলেও শিশিরের মৃত্যুর ব্যাপারে তাকে কেন যেন সন্দেহ করতে মন সায় দেয় না। অবশ্য চাবি যখন একটা তার কাছে ছিল, ক্লাবঘর থেকে মূর্তি চুরি করাটাও অসম্ভব নয়। আর একটা কথা, সে প্রথম দিন কমলাকে ক্লাবেরই একজন বলে পরিচয় দিয়েছিল কেন?

তবে কি অনিল কমলাকে ভালবাসে? মালবিকাকে যে সে প্রেম নিবেদন করেছিল সে সম্পর্কেই বা তার জবানবন্দিতে কোন উচ্চবাচ্য করলে না কেন?

চতুর্থতঃ সৌমিত্র অনিলের জন্মতিথি উৎসবের দিন কলকাতাতেই উপস্থিত থেকেও উৎসবে যোগ দিল না কেন? বন্ধুদের মধ্যে বিনয়ের জবানবন্দি থেকেই জানা গেল, সৌমিত্র তখন কলকাতাতেই উপস্থিত ছিল এবং ঐদিন সন্ধ্যার সময় হগমার্কেটে ফুলের স্টলের সামনে আকস্মিকভাবে বিনয়ের সঙ্গে তার দেখাও হয়েছিল। সে-সময়কার সৌমিত্রের কথাবার্তা ও ব্যবহারটাও একটু যেন মিস্টি-রিয়াস। সৌমিত্র নিজেও তার জবানবন্দির মধ্যে কোথাও স্বীকার করেনি যে, ঐ রাত্রে সে কলকাতাতেই উপস্থিত ছিল। তারপর সৌমিত্র যে মালবিকাকে প্রেম নিবেদন করেছিল সে সম্পর্কেও কোন কথা জবানবন্দিতে জানায়নি। সৌমিত্র একজন উঁচুদরের বেহালাবাদক হলেও পদার্থ-বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, সরকারের একজন অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট বিষ সম্পর্কে তার জ্ঞানটা টনটনে থাকাই স্বাভাবিক। কোন্ বিষের ক্রিয়া কত দ্রুত, কি ভাবে কোন্ বিষ প্রয়োগ করা যেতে পারে, এ সব কিছু সৌমিত্রের হয়তো বিশেষভাবেই জানা।

পঞ্চমতঃ বিনয় মুখোপাধ্যায় সম্পাদক বিখ্যাত একটি দৈনিকের। সে মদ্যপান করে। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। মালবিকাকে প্রেম নিবেদন করেনি। তার পক্ষে সেটা স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক সেটাই বড় কথা নয়, মালবিকার বক্তব্য আপাততঃ যদি সত্যিই বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে বিনয়ের চরিত্র সম্পর্কে একটা কথা বিশেষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটা হচ্ছে – বিনয় বুদ্ধিমান তো বটেই, সাধারণ ভাবাবেগেরও সে কোন ধার ধারে না।

তবে বিষপ্রয়োগের রীতিটা দেখলে মনে হয়, এর মধ্যে যেন এমন কোন একজনের হাত আছে যিনি হয়ত একটি বিশেষ পানীয়ের ব্যাপারে একটু বেশী রকমই আসক্ত। তাই খুনের পদ্ধতি হিসাবে বিনয়কেও একেবারে বাদ দেওয়া হয়ত চলে না।

ষষ্ঠতঃ ভবানী—আপাতত একে অনায়াসেই এ দলের থেকে বাদ দেওয়া চলতে পারে, কারণ অজিতাকে শ্রীমান আবিষ্কার করে বিবাহও করেছে এবং সে সত্যই আজ আপনাতে আপনি পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সপ্তমতঃ ঐ সঙ্গে সঙ্গে ভবানীর স্ত্রী অজিতাকেও এই দল থেকে বাদ দেওয়া চলতে পারে।

এদের সকলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও 'নন্‌সেন্স ক্লাবে'র একজন রীতিমত ও বিশিষ্ট সভ্য হলেও আজ সে বাইরের আঙ্গিনা অতিক্রম করে অন্দরে এসে উঠেছে।

অষ্টমতঃ কমলা ঘোষ, ডাঃ অতুল্য ঘোষের বোন। সুন্দরী, শিক্ষিতা, অতি-মাত্রায় সেণ্টিমেণ্টাল, অল্পেতেই ভেঙে পড়ে, কাতর হয়। এদের সকলেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু—'নন্‌সেন্স ক্লাবে'ও রীতিমত যাতায়াত আছে, যদিচ পাকাপোক্তভাবে ক্লাবের সভ্যা-তালিকাভুক্তা এখনও নয়। এবং সেদিক দিয়ে কারও কোন আপত্তি তো ছিল বলে মনে হয় না বরং কমলাকে সকলেই যেন সাদরে আপনাদের মধ্যে আহ্বান জানিয়ে সকলের মধ্যে স্থান করে দিয়েছিল, দশের পরে ভিন্ন একাদশ নয়—ঐ দশেরই একটি যুক্তাংশ যেন একাদশ হিসাবে। এখানে একটা কথা স্বতঃই সকলের মনে জেগে উঠবে, কমলা সম্পর্কে শিশিরের মতামতটা স্পষ্ট থাকলেও অন্যান্য পুরুষদের মনোভাবটা ঠিক কি ছিল? অবশ্য হিরণ্ময়ের জবানবন্দি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, হিরণ্ময়ের দুর্বলতা ছিল কমলার ব্যাপারে কিন্তু আর আর সকলে এ-সম্পর্কে কেউ কোন কথা বলেনি। মালবিকার মত কমলা নিজে থেকেও একমাত্র শিশির ছাড়া কারও কথাই বলেনি। নিশ্চয়ই ঐ জায়গাটায় একটু অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। কমলা শিশিরকে ভালবাসত বলেই সরমাকে হিংসা করত, সেই হিংসার বশবর্তী হয়ে তার পক্ষে শিশিরকে হত্যা করা এমন কিছু দুঃসাধ্য ছিল না কিন্তু সত্যিই যদি সে শিশিরকে ভাল-বেসে থাকবে—তার পক্ষে সৌরেশকে হত্যা করাটা কি অসম্ভব নয়?

কমলার পক্ষে শিশিরের ফ্লাস্কের চায়ে বিষ মিশিয়ে দেওয়াটাও অসাধ্য ছিল না, কারণ শিশির সেদিন দ্বিপ্রহরে বাড়ি থেকে অভিনয়ের ব্যাপারে বের হবার পূর্বে কমলা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।

নবম ঃ মালবিকা দেবী, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তার জবানবন্দি থেকে—বেচারী নিজের জীবনের ব্যর্থতায় আজ মস্তিষ্কবিকৃতিতে ভুগতে হয়তো শুরু করেছে। যৌন ব্যর্থতা, অতৃপ্ত কামনা আজ সর্বক্ষণ তাকে সচেতন করে রাখে। নারী হয়েও তার নারীত্বের জন্যে এই যে তার সদা-সশঙ্কিত, ভীরু মর্মবেদনা—এর সান্ত্বনা তো নেই। আরও মজা হচ্ছে, পুরুষেরা যেমন মালবিকা শ্রেণীর নারী-দের সহজেই পাওয়া যাবে বলে হাত বাড়ায় তেমনি মালবিকা শ্রেণীর নারীরা আবার সর্বদা নিজেদের দৈন্য ও শূন্যতা সম্পর্কে আত্মসচেতন বলেই না ধরা দিয়ে দুর্লভতার ভান করে। এবং তাতেই তাদের যা কিছু সান্ত্বনা, যা কিছু শান্তি। কি মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি!

* * *

যতই চরিত্রগুলোকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যাক না কেন, পর পর দুটি খুনের উদ্দেশ্য—মোটিভ্ সম্পর্কে যেন কিছুতেই একটা চরম মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া যাচ্ছে না।

সুযোগ বা সুবিধা সকলেরই থাকলেও একটা খুব জোরালো খুনের উদ্দেশ্য যেন কিছুই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কারও বেলাতেই তেমনি।

তারপরে বাঁদরের মূর্তি থেকে দুটি অদৃশ্য হয়ে গেল। খুনের সঙ্গে বাঁদরের মূর্তি অদৃশ্য হওয়ারই বা কি এমন সম্পর্ক আছে!

ওটা কি খুনীর একটা সামান্য খেয়াল বা মোটা রসিকতা একটা, না সত্য-সত্যই ঐ দুটি খুনের সঙ্গে নিখোঁজ বাঁদরের মূর্তি দুটোরও সত্যই কোন কারণ বা যোগাযোগ আছে!

কিরীটীর চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল জংলীর কণ্ঠস্বরে, বাবু, চা!

কিরীটী সম্মুখে দণ্ডায়মান শ্রীমান জংলীর দিকে তাকাল। ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার ঘনায়মান আবছা তরল অন্ধকারে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে চায়ের কাপ হাতে জংলী।

দে! হাত বাড়িয়ে কিরীটী জংলীর হাত থেকে চা-টা নিয়ে বললে, জংলী, আলোটা জেবলে দে আর একটা চুরোট দে।

জংলী প্রভুর নির্দেশ পালন করে মৃদু কণ্ঠে বললে, একজন বাবু নিচে অপেক্ষা করছেন—

কে? নাম জিজ্ঞাসা করেছিলি?

হ্যাঁ, হিরণ্ময়বাবু।

যা, ওপরেই নিয়ে আয় ভদ্রলোককে। আর এক কাপ চা-ও দিয়ে যাবি অমনি, বুঝলি?

কিরীটী কাগজগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে দিল এবং একটু পরেই সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। হিরণ্ময় আসছে।

হিরণ্ময় কক্ষে এসে প্রবেশ করল।

এস, বস হিরণ্ময়।

হিরণ্ময় কিরীটীর পাশেই একখানা সোফা অধিকার করে বসল।

তোমাদের কথাই ভাবছিলাম—

পড়লে আমাদের জবানবন্দিগুলো?

হ্যাঁ, মোটামুটি পড়লাম।

জংলী এক কাপ চা নিয়ে এসে, হিরণ্ময়ের সামনে একটা ত্রিপয় টেনে চায়ের কাপটা ত্রিপয়ের ওপরে নামিয়ে রেখে চলে গেল।

কিছু বুঝতে পারলে?

নিঃশেষিত চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে চুরোটে অগ্নিসংযোগ করতে করতে কিরীটী বললে, তা কিছুটা বুঝেছি বৈকি।

হিরণ্ময়ের চোখে-মুখে একটা ব্যাকুলতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বুকের মধ্যে একটা কেমন বোবা আশঙ্কা যেন।

পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় হিরণ্ময় কিরীটীর মুখের দিকে। কিরীটীর মুখের কোথায়ও কিন্তু এতটুকু ভাব-বৈলক্ষণ্য নেই ; একান্ত নির্বিকার, প্রশান্ত।

হঠাৎ কিরীটী বলে ওঠে, ধারণাটা আরও সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

ধারণাটা ?

হ্যাঁ, মানে তোমাদের নয়জনের মধ্যেই যে একজন সৌরেশ ও শিশিরকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করেছো সেই ধারণাটা।

হিরণ্ময় বোকার মতই কতকটা যেন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কিরীটীর মুখের দিকে।

তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে শুধায়, কিন্তু কে ?

তা এখনই বলতে পারছি না, তবে তুমিও হতে পার।

অ্যাঁ ! একটা অর্ধস্ফুট আর্ত শব্দ যেন হিরণ্ময়ের কতকটা অজ্ঞাতেই তার কণ্ঠ থেকে বের হয়ে আসে।

হ্যাঁ, তুমিও হতে পার ; সুজিতবাবু, অনিলবাবু, সৌমিত্রবাবু, ভবানীবাবু, বিনয়বাবু, মালবিকা দেবী, কমলা দেবী বা অজিতা দেবীও হতে পারেন। হিরণ্ময় দীর্ঘদিন ধরে নানা শ্রেণীর ক্রিমিন্যাল মাইণ্ড ঘেঁটে ঘেঁটে একটা জিনিস বুঝেছি, মানুষের প্রকৃতি সত্যিই বিচিত্র। কত তুচ্ছতম কারণেই না একজন অত্যন্ত সহজ সরল শান্তশিষ্ট প্রকৃতির মানুষ ভয়ংকর হিংস্র শ্বাপদের মত হয়ে ওঠে। জঘন্যতম মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। এতটুকু সংকোচবোধও করে না।

কিন্তু—

অবশ্য আমি এমন কথা বলছি না যে, ক্রিমিন্যাল সম্পর্কে আমার ঐ মতামতটা বর্তমানে তোমাদের সকলের প্রতিই প্রযোজ্য। কিন্তু এমন একটি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে শিশির ও সৌরেশের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে, যে অবস্থায় কেউই তোমরা সন্দেহের গণ্ডি থেকে বাইরে যেতে পারছ না। তোমরা প্রত্যেকেই কালো সন্দেহের একটা কঠিন দুরতিক্রমণীয় বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে ফিরছ এবং ফিরবেও যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা স্থির মীমাংসায় আমরা পৌঁছতে পারি। এ তো গেল একটা দিক, আরও একটা দিক যা সত্যিই আমায় ভাবিয়ে তুলেছে, বর্তমানে হত্যাকাণ্ডের মীমাংসার চাইতেও বেশী—সেটা হচ্ছে—

কি ? উদ্‌গ্রীব ব্যাকুল কণ্ঠে হিরণ্ময় প্রশ্ন করে।

আর একটি মৃত্যুর পদশব্দ আমি যেন শুনতে পাচ্ছি।

কি বললে ?

হ্যাঁ, **death is coming again** ! মৃত্যু আসছে—শীঘ্রই আবার আসছে, আমার মন বলছে যেন, তোমাদের মধ্যে—

কিরীটী ! অতি কষ্টে অর্ধস্ফুট ভাবে চেঁচিয়ে ওঠে হিরণ্ময়।

সৌরেশ ও শিশিরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 'নন্‌সেন্স ক্লাবে'র ঘর থেকে ঐ দুটি বাঁদরের মূর্তির অপসরণ একটা অদৃশ্য ভয়ংকর সঙ্কেত দিচ্ছে—মৃত্যু। আবার নৃশংস মৃত্যু আসছে, আর এইবার খুনীকে আমি সাদরে সুস্বাগতম্‌ জানাব। কিরীটীর কণ্ঠস্বরটা যেন কেমন অদ্ভুত গম্ভীর এবং ভরাট শোনায়।

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে হিরণ্ময় তাকিয়ে থাকে কিরীটীর মুখের দিকে।

আবার কিরীটীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এবার আর তাকে আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে দেব না!

পনের

তাহলে সেই কথাই রইল ভবানীবাবু, আপনি সমস্ত ব্যবস্থা করুন বাগানবাড়িতে কোন একটা উপলক্ষ করে। সকলের আবার মিলিত হবার এবং সেখানে চা-শরবত পান ও ভোজনের ব্যবস্থাটা যেন থাকে। অবশ্য এমন একটি উপলক্ষ করে মিলনের ব্যবস্থা করবেন যাতে করে কারও মনে কোন সন্দেহ না জাগে। কারণ সকলেরই মনের অবস্থা বর্তমানে এমন হয়ে আছে যাতে করে হয়তো কেউই কোথায়ও সহজে খেতে চাইবেন না। অথচ আমাদের খুব শীঘ্র একবার মিলিত হওয়া সকলের একান্ত প্রয়োজন।

কিরীটীর কথার প্রত্যুত্তরে ভবানী বলে, সত্যি কথা বলে সকলকে ডাকলেই তো হয়।

না চাতুরী দিয়েই চতুরকে আবিষ্কার করতে হবে। রহস্যের মীমাংসা করতে হলে রহস্যেরই আশ্রয় নিতে হয়। শঠে শাঠ্যং।

বুঝলাম মিঃ রায়, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না—কী বলে সকলকে ডাকি!

এক কাজ করুন না কেন ভবানীবাবু?

কী?

কোন একটা বইয়ের মহরৎ উৎসব করুন না কেন?

মহরৎ উৎসব করব!

হ্যাঁ। সত্যি-সত্যিই মহরৎ উৎসব আপনাকে আমি করতে বলছি না অবশ্য। বর্তমানে আপনি একজন নামকরা চিত্র-পরিচালক। স্টুডিও, ক্যামেরাম্যান, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অনেকের সঙ্গেই আপনার তো যথেষ্ট আলাপ-পরিচয় আছে, কেমন আছে কিনা?

তা আছে।

বেশ, ওদের কয়েকজনকে নিয়ে একটা মহরৎ উৎসবের ব্যবস্থা করুন না কেন!

সেটা অবশ্য এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়।

হ্যাঁ, ঐ সব চাইতে ভাল ব্যবস্থা। ছবির নাম দিন মরুতৃষ্ণা।

মরুতৃষ্ণা!

হ্যাঁ, মরুতৃষ্ণা। চমৎকার হবে ভবানীবাবু। বাগানবাড়িতে না হলেও চলবে। কোন একটা স্টুডিওতেই একটা ছুটিছাটার দিন বেছে নিয়ে ব্যবস্থা করুন।

বেশ, তাই হবে।

আর একটা কথা, আসল ব্যাপারটুকু কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কারও কাছে ভাঙবেন না। কেবল আমি, আপনি ও আপনার স্টুডিওর লোকেরা জানবে, এমন কি আপনার স্ত্রী ডাঃ রায়কেও আপনি বলতে পারবেন না।

আচ্ছা তাই হবে।

তাহলে আর দেরি করবেন না। যত শীঘ্র পারেন ব্যবস্থাটা করে আপনি সকলকে পৃথক পৃথক ভাবে আমন্ত্রণ জানাবেন।

বেশ। আমি তাহলে এখন উঠি। সব ব্যবস্থা করে আপনাকে আমি ফোনে জানাব।

হ্যাঁ।

ভবানী উঠে দাঁড়াল। কিরীটীর বাড়িতেই দুজনে বসে কথাবার্তা হচ্ছিল।

ভবানী বিদায় নিয়ে চলে গেলে কিরীটী নিঃশব্দে কক্ষের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল।

মালবিকা তার নিজের নার্সারী স্কুলে আবার ফিরে এসেছে গ্রীষ্মাবকাশের পরে।

নিজের ঘরে সকালবেলা স্নানের পর ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার সামনে একটি মোড়ার ওপরে বসে সাদা একটি চিরুনি দিয়ে কেশপ্রসাধনে রত। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে যেন।

মসৃণ আরশির বক্ষে নিজের প্রতিবিম্বিত ছায়ার দিকে তাকিয়ে ছিল মালবিকা। মুখটা আরও শুকিয়ে, আরও একটু যেন ভেঙে লম্বাটে ধরনের হয়ে গিয়েছে। বয়স কত হল মালবিকার? মনে মনে হিসাব করে মালবিকা—পঁয়ত্রিশ বৎসর।

মনে-মনেই চমকে ওঠে কি মালবিকা!

জীবনের পঁয়ত্রিশটা বৎসর ইতিমধ্যে কখন একসময় গত হয়ে গিয়েছে। জীবনের পঁয়ত্রিশ বসন্ত শাখায় শাখায় পুষ্প ফুটিয়ে, ফলের সম্ভাবনায় নিঃশব্দে আবার ঝরে গিয়েছে কখন টেরও পায়নি ও।

জীবনদেবতা প্রেমের পাত্রখানি পূর্ণ করে কোন মাধুরীই তো দান করেননি। শুষ্ক, ব্যর্থ, বন্ধ্যা জীবনের পঁয়ত্রিশটি বৎসরকে আজ মালবিকা স্মৃতির সাগর মন্থন করে জাগিয়ে তুলতে চায় যেন।

বিধাতা তাকে রূপ দেননি সত্য, কিন্তু কমলার মত রূপ নিয়েই তো সকলে এ জগতে আসে না। রূপের দিক দিয়ে তার চাইতে অনেক খাটো হয়ে তো অনেক নারীই এমনি করে ব্যর্থ, বন্ধ্যা হয়ে যায়নি। তবে? তবে তার জীবনে প্রেম তার পরিপূর্ণতার গৌরব নিয়ে আবির্ভূত হল না কেন? কেন

সে সংসার, স্বামী, পুত্র, নারীজীবনের যা কিছু স্বীকৃতি পেলে না এ জগতের কাছ হতে ? কেন, কেন ?

সহসা চমকে উঠল মালবিকা নিজের চিন্তার গতি দেখে।

এ কী সব ভাবছে সে ! কেনই বা ভাবছে।

প্রেমকে তো সে-ই স্বীকৃতি দিতে চায়নি। ভীত, শঙ্কিত ভাবে এড়িয়ে গিয়েছে।

হিরণ্ময়, সৌরেশ, অনিল ও সৌমিত্র !

সকলেই তো একের পর এক এসে একদিন দাঁড়িয়েছিল তার হৃদয়দুয়ারের সামনে প্রাণের অর্ঘ্য সাজিয়ে।

সেদিন তাদের সে ই তো ফিরিয়ে দিয়েছে সকলকে ব্যর্থ নমস্কারে। হ্যাঁ, ফিরিয়ে দিয়েছে সত্য, কিন্তু কেন যে ফিরিয়ে দিয়েছে সে কথা তার চাইতে কে আর বেশী জানে ?

কী ছিল তার ? দেবার মত—পুরুষ নারীর কাছে যা চায় দেবার মত কিছুই যে তার ছিল না।

অন্তরের শুষ্ক প্রেম বা ভালবাসা দিয়ে যে দেহের প্রার্থনাকে চিরদিন পূরণ করা যায় না, একদিন ভালবাসা ও প্রেমের সমস্ত স্বপ্নই যে একান্তভাবে দেহের, দৈহিক প্রয়োজনটার কাছে অত্যন্ত কুশ্রী ও উলঙ্গ হয়ে ধরা পড়বেই—একথা তার সম্পর্কে তার নিজের চাইতে আর কে বেশী জানত ? ওদের কারও একজনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সংসার হয়তো একদিন পাতা চলত, কিন্তু সে সংসারে প্রাণ কতদিন থাকত ! প্রেমের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই কেবল মাত্র দেহের প্রয়োজন দিয়ে আনন্দকে কি বেঁধে রাখা যেত বাকি জীবন ধরে ? না।

চিন্তাস্রোতে মালবিকার বাধা পড়ল, বাইরে নার্সারীর দাসী সরলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, দিদিমণি !

কে ? সরলা ? কি রে ?

একজন ভদ্রলোক বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

কে ?

নাম বললেন সৌমিত্রবাবু না কি—

কে ? সৌমিত্র ? যা, বল গে আমি আসছি।

* * *

ভিজিটার্স রুমে এসে প্রবেশ করতেই মালবিকা দেখতে পেলে, দু'হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে নিঝুম হয়ে বসে আছে সৌমিত্রই।

সৌমিত্র !

মালবিকার ডাকে চমকে সৌমিত্র মাথা তুলে তাকাল।

এত সকালে, ব্যাপার কি ?

সৌমিত্রের সমস্ত মুখখানা যেন শুকিয়ে গিয়েছে, চোখের কোলে কালি। একটা চেয়ারের উপরে বসতে বসতে মালবিকা বললে, তুমি কি অসুস্থ সৌমিত্র ?

না, অসুস্থ নই। একটা ভিক্ষা নিতে তোমার কাছে আমি এসেছি আজ।

ভিক্ষা ! সবিস্ময়ে তাকাল সৌমিত্রের মুখের দিকে মালবিকা।

হ্যাঁ, ভিক্ষা। প্রথমতঃ একদিন তোমার কাছে যে প্রস্তাব আমি করেছিলাম সেই প্রস্তাবটির জন্যে সত্যিই আজ আমি অনুতপ্ত এবং সেটি আমি প্রত্যাহার করতে চাই, এই আমার ভিক্ষা।

স্তব্ধ, অনড়, পাষাণের মতই বসে থাকে মালবিকা। কানের মধ্যে কে যেন তার গরম সীসে ঢেলে দিয়েছে একটু আগে। সমস্ত চিন্তাশক্তি যেন বোবা হয়ে গেছে, শ্রবণশক্তি হয়েছে বধির।

সৌমিত্র আবার বলে, হ্যাঁ, দ্বিতীয়তঃ সেই চিঠিখানা আজও যদি তুমি নষ্ট না করে থাক তো সেখানা আমি ফেরত চাই।

বোবা, অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মালবিকা সৌমিত্রের মুখের দিকে কিছুক্ষণ যেন ফ্যালফ্যাল করেই।

বৎসর কয়েক আগে—আকাশে মৃদু জ্যোৎস্নালোকের মায়া, সানাইয়ে বেজে চলেছে জয়জয়ন্তীর আলাপ, বায়ুতরঙ্গে হাসনুহানার মৃদুমদির গন্ধ, নির্জন ব্যাল-কনিতে একটি পুরুষ ও একটি নারী।

পুরুষের হাতে ভিক্ষাপাত্র।

কি বলেছিল যেন পুরুষ—আমি তোমাকে বিবাহ—

পুরুষটির কথা শেষ হয়নি, নারী জবাব দিয়েছিল, কিন্তু আমি ঠিক এখনও ঐ কথাটা সম্পর্কে একদিনও ভেবে দেখিনি, ইত্যাদি।

তারপর ভিক্ষাপাত্র নিয়ে এল আর একটি পুরুষ, তাকেও সে সেদিন ফিরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পুরুষটি ক্ষান্ত হয়নি, চিঠি লিখে জানিয়েছিল, যদি তোমার প্রতি আমার এ ভালবাসা সত্য হয়, একদিন আমার খোঁজ তুমি করবে, ইত্যাদি। তার পর আরও লিখেছিল, তবু— তোমাকে আমি ভালবাসি এবং চিরদিনই এমনি ভালবাসব।

মধ্যখানে মাত্র কয়েকটি বৎসরের ব্যবধান—সেই নারী ও সেই পুরুষ !

কিন্তু কী জবাব দেবে আজ সেই নারী সেই পুরুষকে ?

চিঠিটা অবশ্য সে আজও নষ্ট করে ফেলেনি, সযতনে রেখে দিয়েছে তুলে সুবর্ণ পেটিকার মধ্যে।

কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করে আজ পুরুষ, কেন—কেন রেখে দিয়েছ আজও ? প্রত্যাখ্যানই যদি আমায় সেদিন করেছিলে তবে কেন চিঠিখানি এতদিন রেখে দিলে।

ছলনাময়ী নারী ! কোন দুর্বলতাই কি তোমার মনে ছিল না সেদিন ? তুমি নিজেকেই নিজে সেদিন ছলনা করেছিলে, না আমাকেই করেছিলে ছলনা ?

হঠাৎ মালবিকা যেন সম্বিৎ ফিরে পায়। বলে, কোন্ চিঠির কথা বলছ

সৌমিত্র ?

পাটনা যাবার আগে যে চিঠিটা তোমায় আমি লিখেছিলাম !

কই, মনে নেই তো। কবে কী চিঠি তুমি আমায় লিখেছিলে মনে পড়ছে না, পড়ে হয়ত তখনি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। আর তোমার সে কথা ? সে তো কোনদিনই আমি গ্রহণ করিনি—তার আবার প্রত্যাহারই বা কি, আর প্রত্যর্পণই বা কী ? আমার মত সেদিনও যা ছিল আজও তেমনি আছে, কিছুই তো বদলায়নি।

মালবিকার কথা শেষ হতেই সৌমিত্র উঠে দাঁড়াল। একটা স্বস্তির নিশ্বাস নিয়ে বললে, যাক, বাঁচা গেল। কয়েক মাস নিজের কাছে নিজেই যেন অপরাধী হয়েছিলাম, আচ্ছা চলি মালবিকা।

অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই যেন কথাগুলো শেষ করে ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াল সৌমিত্র।

কতকটা যেন আর্তকণ্ঠেই মালবিকা বলে ওঠে, এখুনি যাবে ? চা খাবে না ?

না। আচ্ছা চলি।

সৌমিত্র ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। এবং সোজা পথের উপরে এসে নেমে হনহন করে হেঁটে চলল।

গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটা ঘোষণা করলে।

ট্রাম-লাইনের পাশে, গাছের নিচে, রাত্রির ঘনীভূত অন্ধকারে একটা বেঞ্চের উপরে একাকী বসে সুজিত।

আকাশে মেঘ করেছে।

আষাঢ়ের তৃতীয় সপ্তাহ। সারাটা দিন অসহ্য গুমোট গ্রীষ্মের পর আকাশে স্তূপে স্তূপে মেঘ জমেছে এখন।

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা একটা হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

রাস্তা প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছে। শুধু জেগে আছে রাস্তার দু'পাশে ইলেক্‌ট্রিক বাতিগুলো একক চক্ষু মেলে।

মাঝে মাঝে দু-একটা প্রাইভেট মোটর টপ্ স্পীডে মসৃণ পীচের নির্জন রাস্তা দিয়ে সোঁ সোঁ শব্দ তুলে ছুটে যাচ্ছে।

আর শোনা যায় ক্বচিৎ কখনও সোয়ারীহীন রিক্‌শার টুংটাং ক্লান্ত মন্থর, দীর্ঘায়ত, ঘণ্টির শব্দ।

বাড়িতে আজকাল আর মন বসে না সুজিতের। সে-রাত্রের পর থেকে কেন যেন সর্বদা মনে হয় অদৃশ্য একটা ছায়ার মত কি যেন অনুক্ষণ ওর পিছনে পিছনে ফিরছে। তার অস্তিত্ব সে অনুভব করে। স্পর্শাতীত অথচ কিছু যে একটা আছে ওর সমস্ত চেতনা, অনুভূতি দিয়ে যেন সেটা ও টের পায়।

মাঝে মাঝে একক নির্জনতায় বিশেষ করে স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে ও যখন নিজের শয়নকক্ষের আলোটি নিভিয়ে দিয়ে নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকে, হঠাৎ যেন মনে হয় একটা সুস্পষ্ট হিমতীক্ষ্ণ হাওয়ার ঝাপটা ওর সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ তুলে দিয়ে গেল।

মনে হয় কে যেন অতি হাল্কা ভাবে, লঘু স্পর্শে ওকে ছুঁয়ে গেল।

চমকে ওঠে সুজিত।

কে? কে?

কিন্তু কোথায় কে!

কখনও মনে হয় কে যেন ঠিক পাশেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিক ওদিক তাকায় সুজিত।

না, কেউ কোথায়ও নেই।

ভুল। সবই কল্পনা। শূন্য মস্তিষ্কের কল্পনা।

হাতঘড়িটার দিকে একবার তাকাল সুজিত। অন্ধকারে রেডিয়াম দেওয়া ডায়ালটায় ইংরেজী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

রাত্রি সোয়া বারোটা।

সুজিত বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। রাত অনেক হল, বাড়ি ফিরতে হবে।

কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি টিপটিপ করে নাকে-মুখে এসে পড়ল। একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার মৃদু স্পর্শ। সুজিত এসে ফুটপাতের ওপরে দাঁড়াল, যদি একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায়।

ভাগ্যক্রমে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ট্যাক্সি কিছুদূর এগোতেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল।

বাড়িতে এসে পেঁছিতে ছোট ভাই দরজা খুলে দেয়।

মা তখনও জেগেই ছিলেন, সুজিতের সাড়া পেয়ে ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন, সুজিত এলি?

হ্যাঁ, মা।

এত রাত করে এলি—খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে।

হোটেল থেকে খেয়ে এসেছি। বলতে বলতে সুজিত নিজের কক্ষের দিকে চলে গেল।

বৃষ্টিও নেমেছে যেন আকাশ ভেঙে আজ রাত্রে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়, নীল আলোর হঠাৎ দ্যুতিতে চারিদিক যেন চমকিয়ে ওঠে।

ঘরের আলোটা আর জ্বালাতে ইচ্ছা করে না। পায়ে পায়ে সুজিত বন্ধ জানলার কাছে এসে দাঁড়াল।

কাঁচের বন্ধ সার্সীর গায়ে জলের ঝাপ্‌টা এসে অবিশ্রাম আছড়ে আছড়ে পড়ছে। অদ্ভুত একটা চিট্‌পিট্‌ চিট্‌পিট্‌ শব্দ। বজ্রের থেকে থেকে হুঙ্কার। সমস্ত পৃথিবী যেন কেঁপে ওঠে থরথর করে। বিদ্যুতের অগ্নি-

ঝলক সর্পিল গতিতে লক্‌লকিয়ে ফেরে।

মনে পড়ে হঠাৎ, সৌরেশ চমৎকার বর্ষা-সঙ্গীত গাইত।

সৌরেশ আজ আর নেই।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় আর একজনের কথা—শিশির!

শিশির, সৌরেশ! দুজনেই আজ কোন্ বিস্মৃতির ঘনান্ধকারের হারিয়ে গিয়েছে।

নিঃশেষে যেন অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

সত্যি, কি হয়ে গেল!

কি মর্মান্তিক! কি বেদনায় ভরা স্মৃতি! স্মৃতিমাত্রই আজ অবশিষ্ট।

জানালটা খুলে দিল সুজিত। বৃষ্টিটা অনেকটা কমে এসেছে, ঝড় থামেনি এবং এখনো থেকে থেকে মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের সোনালী আলোর ঝলকানি।

জলো হাওয়ায় বৃষ্টির ছাট গায়ে-মুখে এসে লাগছে।

কিছুক্ষণ খোলা জানলাটার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে এগিয়ে গিয়ে সুইচটা টিপে আলোটা জ্বালিয়ে দিল সুজিত।

টেবিলের ওপরে একটা ভাঁজ করা কাগজ, পেপার-ওয়েটের তলায় চাপা দেওয়া, তার নাম লেখা ও লেখা বড় বড় অক্ষরে—'জরুরী'।

এগিয়ে গিয়ে সুজিত ভাঁজ-করা কাগজটা তুলে আলোর নিচে খুলে দেখলে।

ভবানী চিঠি লিখে রেখে গিয়েছে।

সুজিত,

দু'দুবার এসেও তোর দেখা পেলাম না। কাল রবিবার, আনোয়ারশা রোডে 'কল্পপুরী স্টুডিও'তে আমার একটা নতুন বইয়ের মহরৎ উৎসব। ওদের সকলকেই নেমন্তন্ন করেছি, সকলেই আসছে। তোরও কিন্তু আসা চাই ভাই। মহরৎ হবে সন্ধ্যা সাতটায়, একটু আগেই আসিস। না এলে বিশেষ দুঃখিত হব জানিস! তোকে না পেয়ে মুখে বলতে পারলাম না বলে চিঠি লিখে রেখে যাচ্ছি। আসিস কিন্তু ভাই। তোদের ভবানী।

চিঠিটা পড়া শেষ হতেই যেন খোলা জানলাপথে একটা হিমতীক্ষ্ণ দমকা হাওয়া এসে ওর হাত থেকে ভবানীর চিঠিখানা সহসা উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল ঘরের মেঝের উপরে।

নিজের অজ্ঞাতেই মুহূর্তে সুজিতের সর্বাঙ্গ যেন শিউরে ওঠে। এ সেই হিমতীক্ষ্ণ হাওয়ার ঝাপটা! সর্বাঙ্গ যেন অদৃশ্য কুয়াশার মত বেষ্টন করে ধরেছে। বরফের মত ঠাণ্ডা, অত্যন্ত লঘু।

অদ্ভুত। মনে হয় যেন কেউ এসেছে। নিশ্চয়ই কেউ এসেছে—এই মুহূর্তে ঠিক তার পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে।

স্পর্শাতীত, তবু তার উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে। চারিদিকে একবার

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল সুজিত। কই, কেউ কোথায়ও নেই তো!

একটা অদৃশ্য শক্তি যেন সহসা সুজিতকে দেওয়ালের দিকে—যেখানে বাতির সুইচটা বসানো, ঠেলে নিয়ে যেতে চায়।

কে যেন অদৃশ্য হাতে ওকে ঠেলছে। হ্যাঁ, স্পষ্ট অনুভব করে ওর সমস্ত শরীর দিয়ে ও, কেউ ওকে দেওয়ালের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

এগিয়ে চলে সুজিত—সম্মোহনের অদৃশ্য কঠিন প্রভাবে যেমন সম্মোহিত ব্যক্তি নিজের অনিচ্ছায় এবং অজ্ঞাতে এগিয়ে চলে ঠিক তেমনি করেই এগিয়ে চলে সুজিত।

কোন একটি অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলিসংকেতে আপনা থেকেই চলতে চলতে সুজিত যেন দেওয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল এবং আপনা থেকেই একটি হাত তার ধীরে, অতি ধীরে উত্তোলিত হয়ে দেওয়ালের গায়ের আলোর সুইচটা স্পর্শ করল। খুট্ করে একটা শব্দ হল এবং মুহূর্তে দপ্ করে ঘরের ইলেকট্রিক আলোটা নিভে গেল।

নিশ্ছিদ্র আঁধার সমগ্র কক্ষখানিকে মুহূর্তে গ্রাস করে নিল।

অন্ধকার। ছেদহীন ঘন কালির মত অন্ধকার।

সহসা বাইরে থেকে একটা হিমশীতল তীক্ষ্ণ দমকা হাওয়া যেন কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল এবং সেই অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পেলে সুজিত, ভবানীর লেখা সেই চিঠির কাগজটা উড়তে লাগল কক্ষময়।

নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সুজিত উড়ন্ত কাগজখানির দিকে। কাগজটা ঠিক যে ইতস্তত উড়ে বেড়াচ্ছে হাওয়ায় তা যেন নয়, কে যেন অদৃশ্য থেকে কাগজখানি হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়।

ক্রমে কাগজটা উড়তে উড়তে পূর্বের জায়গাতে এসে স্থির হয়ে রইল এবং ক্রমে সাদা কাগজটার চতুর্দিকে একটা আলোর চাপা জ্যোতি যেন ফুটে উঠছে একটু একটু করে ও স্পষ্ট দেখতে পেল।

ঠিক সেই রকম আলোর জ্যোতি—যা সেদিন রাত্রে জবানবন্দি লেখবার সময় চোখের সামনে সুজিত প্রকাশ হতে দেখেছিল।

এতক্ষণের সমস্ত সাহস যেন এক মুহূর্তে হারিয়ে ফেললে সুজিত। দু'-হাতে মুখ ঢেকে আর্ত-অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, না! না! না!

এবং পরমুহূর্তেই জ্ঞান হারিয়ে ঘরের ঠাণ্ডা মেঝের উপর এলিয়ে পড়ল।

ষোল

'কল্পপুরী স্টুডিও'।

কিরীটীর পরিকল্পনা মত ভবানীর আমন্ত্রণে সকলেই এসেছে আজ স্টুডিওতে।

হিরণ্ময়, কমলা, সৌমিত্র, বিনয়, সুজিত, মালবিকা, ভবানী, ডাঃ অজিতা রায় ও অনিল চৌধুরী এবং ছায়াচিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তারকা সুচিরা, জাতীয়

রঙ্গমঞ্চের প্রধানা সুন্দরী তরুণী অভিনেত্রী সরমা, ক্যামেরাম্যান অলোক দাস, সাউণ্ড ইন্‌জিনীয়ার তড়িৎ সাহা, চীফ টেক্‌নিসিয়ান অচ্যুত ঘোষ ও শিল্প-নির্দেশক অপরূপ সেন।

আর এসেছেন 'মরুতৃষ্ণা' বইয়ে প্রধান একটি কূট বৃদ্ধের চরিত্র যিনি অভিনয় করবেন—নবাগত এক শিল্পী অসীম রায়, কাহিনীটিও ওঁরই লেখা।

ভদ্রলোক লম্বায় প্রায় ছ'ফুট, দেহের গঠনটি চমৎকার।

চোখে একটি কালো কাচের চশমা, পরিধানে ঢোলা পায়জামা ও ঢোলা হাতা আদ্দির পাঞ্জাবি, মাথায় একটি কালো রঙের টুপি।

'কল্পপুরী স্টুডিও'টি আয়তনে প্রকাণ্ড। তিন-তিনটি ফ্লোর।

তবে আজ রবিবার থাকায় ও সরকারী ছুটি থাকায় স্টুডিওর সমস্ত কাজই বন্ধ।

দুই নং ফ্লোরের সামনে একটি ছোট্ট ফুলের বাগান, মধ্যিখানে একটি ফোয়ারা। ফোয়ারা-মুখ থেকে জলধারা উৎক্ষিপ্ত হয়ে নিচের জলাধারের মধ্যে পড়ছে।

কয়েকটি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক বালব্‌ জ্বেলে দেওয়া হয়েছে।

টেবিল চেয়ার পেতে অভ্যাগতদের বসবার ব্যবস্থা হয়েছে।

একপাশে স্ট্যাণ্ডের উপরে কালো কাপড়ে ঢাকা ক্যামেরাটি বসানো, তারই অল্প দূরে সাউণ্ড্‌ ট্রাকটি দেখা যাচ্ছে।

প্রধান অতিথি হিসাবে আজ যাঁর আসবার কথা ছিল, কলকাতার বিশিষ্ট একটি চিত্রগৃহের ও চিত্র-প্রতিষ্ঠানের মালিকের অন্যতম সহকারী বা দক্ষিণহস্তও বলা চলতে পারে—গদাই মিত্র, তিনি এখনও এসে পৌঁছননি।

সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছটা হবে।

বাতিগুলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে কিছুক্ষণ।

পরস্পরের মধ্যে সকলের আলাপ-পরিচয় হয়ে যাওয়ায় প্রত্যেকেই কারও না কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলছে।

মাঝে মাঝে চাপা হাসির উচ্ছ্বাস মর্মরিত হয়ে ওঠে।

কয়েকজন ভৃত্য এসে একধারে লম্বা একটা টেবিল পেতে দিল, বিছিয়ে দিল টেবিলটার ওপরে ধবধবে একখানা লম্বা টেবিল-ক্লথ।

জলযোগের আয়োজন শুরু হয়ে গেল। টেবিলের উপরে সাজিয়ে রাখতে লাগল ভৃত্যেরা ডিসে ডিসে করে নানাপ্রকারের লোভনীয় খাদ্যবস্তু। একপাশে রাখা হল কতকগুলো খালি প্লেট। সকলে যে যার ইচ্ছামত প্লেটে খাবার তুলে খাবে।

এমন সময় ইলেকট্রিক শঙ্খহর্নের তীব্র অথচ গম্ভীর আওয়াজে সকলের দৃষ্টি যুগপৎ সামনের দিকে গিয়ে নিবদ্ধ হল। গ্রীণ রঙের নবক্রীত চকচকে একখানা রোভার গাড়ি অদূরে এসে দাঁড়াল।

ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দিলে গাড়ি থেকে নামলেন আমাদের গদাই

মিত্র। মণ-বারো ওজনের সুবিপুল বপুখানি।

দেহের আন্দাজে মুখখানি ছোট কিন্তু গোলগাল। একপাশে চুলের সিঁথি, হাতে মার্কোভিচের একটি টিন।

ভদ্রলোকের চোখে-মুখে সর্বদাই যেন একটা আপ্যায়িত-মার্কা হাসির ছটা ছড়িয়ে থাকে। অত্যন্ত মিষ্টি করে সকলের মন রেখে কথা বলবার দুরূহ আর্টটা গদাই মিত্র চমৎকার আয়ত্ত করেছেন। তাঁর সংস্পর্শে যে কেউই আসুক, নিরাশার কথা কাউকেই কখনও তিনি বলেন না, ওটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। এবং যে কথাগুলো বলেন সে কথাগুলো জীবনে না রক্ষা করাটাই তাঁর চরিত্রগত বিশেষত্ব।

কাজেই তাঁর সংস্রবে যারা আসেন, দু-চারদিন আশায় আশায় ঘোরাফেরা করেন—কিন্তু দুনিয়ায় তো সকলেরই প্রচুর টাকা, বাজে খরচ করবার মত প্রচুর অবকাশ নেই। তাই কেউ দু মাস, কেউ চার মাস, আবার কেউ বা দীর্ঘ এক-আধটা বৎসর অনবরত মিষ্টি কথা শুনে শুনে অবশেষে একদিন নীরবে ছোট্ট একটি মিষ্টি নমস্কার জানিয়ে নিঃশব্দে নিজের পথ দেখেন।

যা হোক, গদাই মিত্র চিত্র-জগতের একজন অত্যন্ত পপুলার ব্যক্তি, তাঁকে চেনে না বা তাঁর নাম শোনেনি এমন খুব কম লোকই কলকাতা শহরে আছে।

পরিচালক ভবানী রায়ই প্রথমে সাদর সম্বর্ধনা জানায় কলকণ্ঠে, এই যে গদাইদা, আসুন!

গদাইবাবু এ মহলে প্রায় সকলেরই সর্বজননী 'দাদা' এবং ছোট-বড় সকলেই যে তাঁর সংস্পর্শে আসে তাঁকে গদাইদা বলে ডাকে।

আপ্যায়িত-মার্কা হাসিটি হেসে গদাই মিত্র বললেন, একটু দেরি হয়ে গেল ভাই।

তা হোক। আসুন সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়টা করিয়ে দিই।

আলাপ-পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হল।

মরুতৃষ্ণা বইয়ের একটি দৃশ্য তুলে মহরৎ উৎসব হবে।

গদাই মিত্র পরিচালক ভবানীকে প্রশ্ন করলেন, কার লেখা বইটা হে ভবানী?

একজন নতুন লেখক গদাইদা—নাম ধূর্জটি রায়।

আগে কখনও সিনেমার জন্যে কোন বই লিখেছেন বলে জানি না তো—

না, এই প্রথম।

বিষয়বস্তুটা কি?

মিষ্ট্রি—রহস্য বই। বলতে বলতে নবাগত শিল্পী অসীম রায়কে দেখিয়ে ভবানী বললে, ঐ নবাগর শিল্পীটিরই পেন্‌নেম হচ্ছে ধূর্জটি রায়, উনিই ওঁর বইতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

বটে! বটে!

যা হোক, মরুতৃষ্ণা বইয়ের একটি দৃশ্য: একটি বৃহৎ প্রাসাদোপম অট্টালি-

কার সামনে বাগানের মধ্যে একটি বেতের টেবিলে মুখোমুখি দু'টো বেতের চেয়ারে বসে নায়ক ভিলেন বজ্রপাণি ও বড়লোকের একমাত্র দুহিতা তরুণী নায়িকা রজনীগন্ধা আলাপ করছে।

বজ্রপাণির বাপ ও রজনীগন্ধার বাপ ছিল পরস্পর পরস্পরের বন্ধু।

বজ্রপাণির পিতা সোমেশের অবস্থা ছিল ভাল—কারণ উত্তরাধিকারসূত্রে সে পিতার মস্ত বড় জমিদারী পেয়েছিল, কিন্তু রজনীগন্ধার বাপ যোগেন্দ্রর অবস্থা কোনদিনই সচ্ছল ছিল না। সোমেশ যোগেনকে প্রাণের চাইতেও ভালবাসতেন, তাই বন্ধুর আর্থিক দুরবস্থা মোচনের জন্যেই কতকটা বন্ধুকে সহকারী ও সহকর্মী হিসাবে নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন উভয়েরই। বৎসর কয়েকের মধ্যেই ব্যকসায় অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি দেখা দিল।

যোগেনের অবস্থা ফিরল, সেই সঙ্গে মনের মধ্যে লোভের কালো ছায়াও পড়ল।

সোমেশ বন্ধুকে অতিমাত্রায় বিশ্বাস করতেন। ব্যবসার যাবতীয় দেখাশুনায় ভার বন্ধুর ওপরেই অন্ধবিশ্বাস ও প্রীতিতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। সেই বিশ্বাসের মূলধন নিয়ে একটু একটু করে যোগেন বন্ধুর সব কিছুই গ্রাস করে ফেললে।

এত বড় আঘাত সইতে না পেরে সোমেশ যোগেনকে একদিন ডেকে পাঠালেন কিন্তু যোগেন এল না। অবশেষে বাধ্য হয়ে একান্তভাবে সোমেশকেই একদিন যেতে হল যোগেনের ওখানে।

বন্ধু সাদরে অভ্যর্থনা জানাল এবং শরবতের সঙ্গে বিষ দিয়ে শেষ পর্যন্ত যোগেন সোমেশকে হত্যা করলে।

হাসপাতালে বিষজর্জরিত অন্তিমপথযাত্রী সোমেশ পুত্র বজ্রপাণিকে ইঙ্গিতে বিষ-প্রয়োগের কথা বলে গেলেন।

পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে বজ্রপাণি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল।

শুরু করলে সে যোগেনের গৃহে যতোয়াত। রজনীগন্ধা যোগেনের একমাত্র মেয়ে বজ্রপাণির প্রতি মুগ্ধ হল এবং শীঘ্রই বজ্রপাণিকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসলে।

দুজনে দেখাসাক্ষাৎ হয়, কত কথা হয়—হয় কত হাসি গল্প, কিন্তু বজ্রপাণি একটি মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে না রজনীগন্ধার পিতাই তার পিতৃহত্যাকারী—খুনী!

সেদিনও এসেছে বজ্রপাণি যোগেনের গৃহে।

বাগানে চা পান করতে করতে দুজনা বজ্রপাণি ও রজনীগন্ধার আলাপ চলছে।

ভবানী রায় সংক্ষেপে গল্পটি বলে বললে, ঐ দৃশ্যটিরই আজ সুটিং হবে।

সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে সুটিং দেখে।

ক্যামেরা রেডি। পরিচালকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ক্যামেরার স্ট্যাণ্ডের পশ্চাতে দণ্ডায়মান ক্যামেরাম্যান অলক দাস জবাব দেয়, ইয়েস্।

সুচিরা দেবী, আপনি আর একটু ঝুঁকে বসুন। হ্যাঁ, আপনার চোখ থাকবে অসীমবাবুর মুখের দিকে মুখে হাসি—ইয়েস। সাউণ্ড, রেডি!

সাউণ্ড-ট্রাকের মধ্য থেকে জবাব এল, ইয়েস।

স্টার্টার দু'খণ্ড কাঠ একত্রে তিনবার পিটে শব্দ করলে, অর্থাৎ স্টার্ট!

* * *

সুটিং হয়ে গেল।

এবারে জলযোগ।

একমাত্র ভবানী ও তার স্ত্রী ডাঃ অজিতা রায় ছাড়া নন্‌সেন্স ক্লাবের অন্যান্য সভ্যদের মুখগুলি যেন থমথম করছে।

ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সব ছড়িয়ে পড়ে। টেবিলের উপর থেকে যে যার ইচ্ছামত আহার্য-বস্তু তুলে জলযোগ শুরু হয়ে গেল।

ট্রে-তে করে ভৃত্যরা চা ও শরবত ভর্তি কাপ ও গ্লাসগুলো এনে টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখল একে একে।

যে যার অভিরুচি মত চা বা শরবত পান করতে থাকে।

অসীম রায় ওরফে ধূর্জটি রায় একটা ডিসে কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ তুলে হাতে নিয়ে, একটা স্যাণ্ডউইচ মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে ইতস্তত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল।

চোখে এখনও তার কালো চশমাটি।

সুজিত একটা শরবতের গ্লাস হাতে হিরণ্ময় ও কমলার সঙ্গে কি যেন কথাবার্তা বলছে। কথা বলতে বলতে যেমন সে শরবতের গ্লাসে চুমুক দিয়েছে মুহূর্তে কি যেন হল, তার শিথিল হাত থেকে শরবত-ভর্তি গ্লাসটা মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল।

সতর্ক হবার পূর্বেই টলে পড়ে গেল সুজিত।

কি—কি হল! বলতে বলতে হিরণ্ময় ও কমলা ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে ভূপতিত সুজিতের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

ওদের আর্ত কণ্ঠস্বরে সকলেই চমকে ফিরে তাকায় ততক্ষণে।

অসীম রায় প্রায় পাশের লোকটিকে ধাক্কা দিয়েই একলাফে সুজিতের ভূপতিত দেহটার সামনে এসে দাঁড়ায়।

কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গিয়েছে। সুজিতের দেহটা বারকয়েক ধনুকের মত বেঁকে বেঁকে আক্ষেপ করে স্থির হয়ে গেল।

হাতের পাতা দুটি মুষ্টিবদ্ধ।

চোখের মণি দুটো যেন অক্ষিকোটর থেকে ঠেলে বার হয়ে আসে। বন্ধ

ওষ্ঠের ফাঁক দিয়ে রক্তমিশ্রিত একটা ক্ষীণ লালার ধারা নেমে এল।

সব শেষ।

সকলেই সুজিতের ভূপতিত স্থির দেহটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তখন।

কারও মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। ঘটনার আকস্মিকতায় উপস্থিত সেখানে অতগুলো লোক যেন একেবারে বোবা বনে গিয়েছে।

ভয়ংকর শ্বাসরোধকারী হিমশীতল একটা কঠিন স্তব্ধতা যেন পরিবেশটাকে মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

কি হল হঠাৎ এ কি ঘটল?

অসীম রায় এতক্ষণ সুজিতের দেহটাকে পরীক্ষারত ডাঃ অজিতার দিকে স্থির সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

বিষণ্ণভাবে ঘাড় নেড়ে উঠে দাঁড়ায় ডাঃ অজিতা, না. সব শেষ!

সুজিতবাবু পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বুঝেছিলাম ডাঃ রায়, সব শেষ। আবার হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড্ তার করাল দংশন হেনেছে।

অজিতা, কমলা, হিরণ্ময়, মালবিকা, বিনয়, অনিল, সৌমিত্র সকলেই সবিস্ময়ে যুগপৎ চমকে বক্তার মুখের দিকে তাকায়।

কালো কাচের চশমাটা চোখ থেকে খুলে, ঠোঁটের ওপরের সরু গোঁফটা টেনে খুলে অসীম-বেশী কিরীটী আত্মপ্রকাশ করলে।

সকলের কণ্ঠ থেকে যুগপৎ বিস্ময়ের সঙ্গে একটি নাম উচ্চারিত হয়—কিরীটীবাবু!

কিরীটী বিষণ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয়, হ্যাঁ, কিন্তু এখানে উপস্থিত থেকেও মৃত্যুকে আটকাতে পারলাম না। হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড্ এবারেও তার দাঁত বসাল। কিন্তু এই শেষ নয়—হ্যাঁ, আমি বলছি হিরণ্ময়, অনিলবাবু, এই শেষ নয়। The death roll has not yet been completed। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি এখনও—হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড্—that blessed poison এখানেই তার ক্রিয়া শেষ করবে না। সৌরেশবাবু, শিশিরবাবু গিয়েছেন—সুজিতবাবুও গেলেন। এখানেই খুনী তৃপ্ত হবে না। আমি স্পষ্ট দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি খুনীর হাতের বিষের পেয়ালার বিষ এখনও নিঃশেষিত হয়নি। পেয়ালায় এখনও অনেকখানি বিষই অবশিষ্ট আছে।

স্তম্ভিত, নির্বাক বিস্ময়ে সব দাঁড়িয়ে স্থাণুর মত। এক-একখানি যেন পাষাণে গড়া মূর্তি। প্রাণ নেই, স্পন্দন নেই।

কিরীটীর কঠিন কণ্ঠে আবার যেন প্রত্যাদেশ ঝঙ্কৃত হল, এখনও—এখনও আপনারা বলুন যে যা জানেন! আবার আমি সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি সকলকে আপনাদের, বলুন—বলুন দয়া করে আপনারা যে যা জানেন বা দেখেছেন বা সন্দেহ করছেন!

তবু কারও মুখে কথা নেই।

শব্দহীন, বাক্যহীন, পাষাণের মতই সব দাঁড়িয়ে; প্রাণহীন সব মাটির

পুতুল যেন।

সামনে ভূ-শয্যায় লুণ্ঠিত সুজিতের—হতভাগ্য সুজিত করের বিষজর্জরিত প্রাণহীন দেহটা বীভৎস, ভয়ংকর।

একটিবার চেয়ে দেখুন—আপনাদেরই বন্ধুর ঐ প্রাণহীন দেহটার দিকে। কেন—কেন ওঁকে এমন নৃশংসভাবে বিষ দিয়ে হত্যা করা হল? কার কাছে কি অপরাধ উনি করেছিলেন? দীর্ঘকালের আপনাদের পরস্পরের প্রীতি, বন্ধুত্ব। এর কি কোন দামই নেই? ভেবে দেখুন তো আর একবার—আইনত, ন্যায়ত, আপনারাই কি ওঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী নন? I—yes I—hold all of you responsible for his death! আপনাদের সকলকেই আমি দায়ী করছি। হ্যাঁ, আপনাদেরই সুজিত করের মৃত্যুর জন্যে প্রত্যেককেই দায়ী করছি।

উত্তেজনায় আবেগে কিরীটীর কণ্ঠস্বর কাঁপতে কাঁপতে যেন ভেঙে পড়ল।

কোন একটা কাচের বাসন যেমন একটা শক্ত কিছুতে ধাক্কা খেয়ে ঝনঝন শব্দে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় এবং শব্দটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলেও অনেকক্ষণ ধরে একটা শব্দের অনুরণন তুলে দেয়, কিরীটীর কণ্ঠস্বরও তেমনি থেমে গেলেও একটা শব্দের অনুরণন যেন জাগিয়ে রাখে।

আজ আর কেউ কারও মুখের দিকেও যেন পরস্পর চাইতে ভয় করছে, প্রত্যেকেরই দৃষ্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ।

ইতিমধ্যে কখন আকাশের পশ্চিম প্রান্তে এক টুকরো মেঘ জমেছিল, সেটা একটু একটু করে প্রায় আকাশ জুড়েই বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।

সন্ধ্যার দিক থেকে যে সুন্দর বাতাসটা বইছিল, তাও কখন যেন একসময় থেমে গিয়েছে।

মাথার ওপরে মেঘলা রাত্রির অন্ধকার আকাশ থমথম করছে।

সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে বায়ুহীন একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধতা।

ভবানীবাবু!

কিরীটীর ডাকে ভবানী ঈষৎ চমকে মুখ তুলে তাকায়, আজ্ঞে?

ফোন করে টালীগঞ্জ থানায় বিরিঞ্চি চৌধুরীকে একটা সংবাদ পাঠান, সে থানাতেই আছে, আমার নাম করে বলবেন, সে যেন শীঘ্র চলে আসে।

ভবানী কিরীটীর নির্দেশে স্থানত্যাগ করে অফিসঘরের দিকে চলে গেল।

সতের

লাল ছোট ছোট কাঁকর বিছানো রাস্তাটার ওপরে ভবানীর ক্রমবিলীয়মান জুতোর মচমচ শব্দটা অনেকক্ষণ ধরে শোনা গেল।

দূরে কোথাও নিশ্চয়ই বৃষ্টি নেমেছে, ঠাণ্ডা জলকণাবাহী একটা হাওয়ার ছাপটা বয়ে গেল সকলের সর্বাঙ্গে শিহরণ তুলে।

বসুন সকলে—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন সব! বসুন। বিরিঞ্চি না এসে পৌঁছনো পর্যন্ত তো কারও এখান থেকে যাবার উপায় নেই।

আবার কিরীটীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল!

সকলেই এতক্ষণে নড়েচড়ে ওঠে, মাটির পুতুলগুলিতে যেন প্রাণসঞ্চার হয়।

স্টুডিওতে কোন একটি চিত্রের যে কোন একটি নির্দিষ্ট দৃশ্য তোলা হচ্ছিল। কিরীটী তার পরিচালক।

কিরীটীর নির্দেশে সকলে যে যার এক একটা চেয়ার অধিকার করে বসল।

পকেট থেকে সিগার-কেসটা বের করে একটা সিগার বের করলে কিরীটী। দু ঠোঁটের ফাঁকে সিগারটি আবদ্ধ করে দেশলাই জ্বালাল। স্পষ্ট বোঝা যায়, কিরীটীর সিগারে অগ্নিসংযোগকারী দুটি হাতই একটু একটু কাঁপছে।

দ্রুত চিন্তার সাইক্লোন যেন কিরীটীর মাথার স্নায়ুতে স্নায়ুতে বয়ে যাচ্ছে।

সত্য, নিজেও সে আজ যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। আশঙ্কা একটা তার মনে মনে থাকলেও, এত দ্রুত ঘটনাসংঘাত সে আদপেই আশা করেনি যেন।

একটু পরেই কাঁকর বিছানো রাস্তায় ভবানীর পদশব্দ পাওয়া গেল।

ভবানী টেলিফোন করে ফিরে আসছে।

ভবানী এসে সামনে দাঁড়াতেই কিরীটী প্রশ্ন করলে, পেলেন বিরিঞ্চিকে ফোনে?

হ্যাঁ, বললেন আসছেন এক্ষুনি।

বসুন ভবানীবাবু।

ভবানী কিরীটীর নির্দেশে একটি চেয়ার অধিকার করে বসলে ঠিক তার স্ত্রী অজিতার পাশেই।

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কিরীটী বলে ওঠে, হিরণ্ময়, অনিলবাবু, আপনাদের প্রত্যেকেরই জবানবন্দি খুব খুঁটিয়ে আমি আগাগোড়া পড়েছি। দু'একদিনের মধ্যে আমি ও-সম্পর্কে একটা লিখিত মতামত ও সেই সঙ্গে জবানবন্দিগুলো আমার বন্ধু সি. আই. ডি.-র কমিশনার তালুকদারকে পেশ করব, সে নিজেই এ কেসের যাবতীয় ভার নিয়েছে। সেদিনও আপনাদের বলেছিলাম আজও বলছি, খুনীকে আপনারা কিছুতেই আড়াল করে রাখতে পারবেন না। ধরা তাকে পড়তেই হবে এবং শুধু তাই নয়—তাকে নিজে থেকে ধরা দিতে হবে। ভবানীবাবুর সঙ্গে পূর্বাহ্নেই পরিকল্পনা করে আজকে এইখানে সকলকে নিয়ে এইভাবে একটা চিত্রের মহরৎ-উৎসবের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে আবার সকলের মিলিত হবার ব্যবস্থা আমি করেছিলাম। সকলের জবানবন্দি পড়ে কতকগুলো ব্যাপার আমি নিজে থেকে যাচাই করে নিতে চেয়েছিলাম এবং একেবারে স্থিরনিশ্চিত না হলেও মনে মনে আশঙ্কাটা আমার

বরাবরই ছিল, আজও হয়তো আবার কিছু ঘটবে। হত্যাকারীর পূর্বের পর পর দু'দিনের হত্যার পদ্ধতি দেখে কেন যেন আমার স্থির ধারণা একটা হয়েছিল, যদি তাকে—খুনী বা হত্যাকারীকে আবার পূর্বের মত একটা সুযোগ দেওয়া যায় এবং পূর্বাহ্নেই তাকে সজাগ করে দেওয়া যায়, সে আবার চেষ্টা করবে তার হিংস্র নখর বিস্তার করতে, আবার সে তীব্র কালকূট পরিবেশনের মধ্য দিয়ে হত্যা করবার চেষ্টা করবে। আর এবারও যদি সে চেষ্টা করে তাহলেই বুঝব—স্থির নিশ্চিত হব এখানেই তার হত্যালীলা থামবে না। আবার সে হত্যা করবে এবং হলও তাই! কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, সব দিক দিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করেও মৃত্যুকে ঠেকাতে পারলাম না। বুঝলাম, হত্যাকারী সত্যিই চতুর। তাই আবার আপনাদের সকলকে আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি, যে যা আপনারা জানেন আমায় খুলে বলুন। লজ্জা বা সঙ্কোচের এটা সময় নয় এবং বন্ধুপ্রীতির পরাকাষ্ঠা নিয়ে এত বড় একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে চেপে যাওয়া—নীতি বা মনুষ্যত্বের দিক দিয়েও ক্ষমার যোগ্য নয়।

দূরে গাড়ির তীব্র হেড-লাইটের আলো দেখা গেল।

বোধ হয় বিরিঞ্চিরই গাড়ি আসছে।

সত্যি বিরিঞ্চিরই গাড়ি। গাড়ি এসে রাস্তার ওপরে দাঁড়াল। লংস ও খাকী হাফ সার্ট পরিধানে, কোমরে বেল্টের সঙ্গে পিস্তল ঝুলছে বিরিঞ্চি চৌধুরীর, টালিগঞ্জ থানার ইনচার্জ, গাড়ি থেকে নামলেন।

বিরিঞ্চি লোকটা বংশদণ্ডের মত লম্বা ঢ্যাংঢ্যাঙে এবং এত বেশী লম্বা যে সামনের দিকে একটু কুঁজো হয়ে চলা অভ্যাস।

মুখটা সরু—লম্বাটে প্যাটার্নের, টানা চক্ষু, খড়্গের মত খাড়া নাসিকা।

মাথার চুল ছোট ছোট করে কদমছাঁট দেওয়া। বেশ ভারী পাকানো একজোড়া গোঁফ। সামান্য একটু নুর দাড়ি।

গলার 'অ্যাডামস্ অ্যাপল'টা অত্যন্ত বিশ্রীভাবে প্রকট। কথা বলবার বা ঢোক গেলবার সময় পাতলা চামড়ার নিচে ওঠা-নামা করে একটা মারবেলের মত 'অ্যাডমস্ অ্যাপল'টা।

শ্যামপুকুর থানা-ইন্‌চার্জ নির্মলশিববাবুর মত এরও একটা মুদ্রাদোষ আছে। কথা বলতে বলতে নাকের ভিতরের চুল টেনে টেনে ছেঁড়া, মধ্যে মধ্যে একটা করে হাঁচি দেওয়া বিশ্রীভাবে মুখবিকৃতি করে ও কথা বলতে বলতে কথার মধ্যে অসংখ্য-বার 'কী' শব্দটি উচ্চারণ করা অনাবশ্যক তীক্ষ্মতার সঙ্গে। বিরিঞ্চি লোকটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও কর্মপটু হলেও ঐ একাধিক মুদ্রাদোষগুলির জন্যেই প্রমোশন পায়নি এতকাল সুনামের সঙ্গে চাকরি করেও।

নইলে উনিশ বছরের তার সার্ভিস এবং সার্ভিস-রেকর্ডও খুব ভাল ছিল, কিন্তু ঐ দোষগুলোই তার প্রমোশনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শক্ত কংক্রিটের পিলারের মত—তার উন্নতির পথে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। শোনা

যায় বছর কয়েক আগে কোন এক সহৃদয় পুলিস কমিশনারের রেকমেণ্ডে যখন বিরিঞ্চি ডি আই জি -র দরবারে ইণ্টারভিউ দেবার জন্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, ডি. আই. জি. ওকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন—Your name is Birinchi Chowdhury ?

ডি আই জি. লোকটা নেটিভ্ ক্রিশ্চান্ ছিলেন এবং জাতে ছিলেন অন্ত্যজ। কিন্তু একান্ত সৌভাগ্য বলতে হবে—পেয়েছিলেন সুন্দরী, শিক্ষিতা স্ত্রী এবং স্ত্রীর দৌলতেই লোকটার প্রমোশন চটপট, অত্যন্ত দ্রুত হয়েছিল।

লোকটির বিকৃত ইংরেজী উচ্চারণ করাটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চাকরির বাজারে সেটার কি-ই বা মূল্য—বিশেষ করে ঠেলবার লোক যখন আছে পশ্চাতে!

চৌধুরীকে তিনি 'কাউড্রি' উচ্চারণ করেছিলেন।

দুর্ভাগ্য বিরিঞ্চির, ডি আই জি-র প্রশ্নের জবাবে মুখবিকৃতি করে একটা হাঁচি দিয়ে, পটাস্ করে নাক থেকে একটা চুল ছিঁড়ে বলে বসলেন, কী ? নট্ কাউড্রি বাট চৌধুরী !

ব্যাস্ আর যায় কোথা ! ডি. আই. জি. তো অগ্নিশর্মা, what ?

আবার মুখবিকৃতি করে একটা হাঁচি ও অনাবশ্যক তীক্ষ্ণতার সঙ্গে 'কী' উচ্চারণ করে জবাব দিলেন, yes ! কী ?

এর পরের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—এক কলমের খোঁচায় সেবারের প্রমোশনের চান্স তো গেলই, ভবিষ্যতের আশা-ভরসাও শেষ হয়ে গেল বিরিঞ্চির।

ইনএফিসিয়েণ্ট, রুড বলে রিমার্ক গেল।

চাকরি যেত, কিন্তু পূর্ববর্তী সার্ভিস-রেকর্ডের জোরে চাকরিটা শেষ পর্যন্ত কোন-মতে বজায় থেকে গেল।

বিরিঞ্চি এগিয়ে এসে কিরীটীকেই নাকের একটা চুল ছিঁড়ে মুখবিকৃতি করে এক হাঁচি দিয়ে প্রশ্ন করে, তাহলে সত্যি-সত্যিই—কী! একটা বিভ্রাট ঘটেছে, কী ?

হ্যাঁ, ওই দেখুন না ! বিভ্রাট একটু বেশী রকমই ঘটে গিয়েছে ! অঙ্গুলি-নির্দেশ করে কিরীটী অদূরে ভূ-শায়িত সুজিত করের প্রাণহীন দেহটা দেখায়।

ডেথ্—কী ? আবার হাঁচি !

হ্যাঁ, পয়েজনিং।

কী ! কী ! পয়েজনিং ? বিষ দিয়ে হত্যা, না আত্মহত্যা ? কী হ্যাঁচ্চো ! আরেক হাঁচি।

আত্মহত্যা নয়—হত্যা—murder !

হত্যা ! কি ভয়ংকর, কী !

সহসা এমন সময় বড় বড় কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি সকলের চোখে-মুখে এসে

পড়ল।

আঃ, আবার বৃষ্টি নামল যে! কী—হ্যাঁচ্চো! হাঁচি দিলেন আর একটা বিরিঞ্চি।

তাই তো! কিরীটী আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

বৃষ্টি ততক্ষণে বেশ ভালভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

অদূরেই ছিল পাশাপাশি দুটো ঘর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিশ্রামের জন্যে। সকলেই ভবানীর আহ্বানে সেই ঘরের দিকে ছুটল।

একমাত্র কিরীটী যেতে যেতে থেমে গেল।

হঠাৎ ছোট একটা হোমিওপ্যাথির ঔষধের শিশি ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ঘাসের ওপর শিশিটা পড়ে আছে ঠিক মৃতদেহের পিঠের কাছে।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে শিশিটা নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল আলগোছে। শিশিটার মুখে কোন ছিপি নেই, শিশিটা শূন্য।

ছিপিটার খোঁজে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল কিরীটী, কিন্তু ছিপিটা নজরে পড়ল না কোথাও।

বৃষ্টিও তখন বেশ জোরে শুরু হয়েছে। মৃত সুজিতের গায়ের পোশাক ইতি-মধ্যেই বৃষ্টির জলে ভিজে গিয়েছে। চোখে মুখে তীব্র ইলেকট্রিক আলোয় সঞ্চিত বৃষ্টির জলের ফোঁটাগুলো চিকচিক করছে। এত যত্নের দেহ আজ বৃষ্টির জলে মাটির ওপর পড়ে পড়ে ভিজছে, কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

এই তো জীবন! মুহূর্তে সব শেষ হয়ে গেল।

কিরীটী আর দাঁড়াল না, দ্রুতপায়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে কিরীটী শুনলে, বিরিঞ্চি বোধ হয় ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করেই বলছে, আপনাদের মধ্যেই কেউ তাহলে হত্যা করেছেন—কী! আপনারা ছাড়া যখন এখানে আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না, তখন আপনারাই কেউ একজন ভদ্রলোককে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছেন। কী—কথা বলছেন না কেন, কী? চুপ করে আছেন কেন সব, কী?

নাকের আর একটা চুল ছেঁড়বার জন্যে নাকের মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় লোমের দু আঙুলের মাথায় খুঁজতে লাগল একান্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে বিরিঞ্চি।

কিরীটীকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে বিরিঞ্চি বললে, এই যে কিরীটীবাবু, কী? এঁদের বলছি এখানে যখন এঁরা ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না তখন এঁদের মধ্যে একজনই কেউ - কী, নিশ্চয়ই সুজিতবাবুকে poisoning করেছেন, কী? আপনি কি বলেন, কী?

কিরীটী মৃদু হাসির সঙ্গে বলে, আমি আর কি বলব?

নিশ্চয়ই। আপনার কথাটাও আমাকে শুনতে হবে বৈকি, কী! And your statement would be more important, কী?

নিশ্চয়ই, আমারও statement একটা পাবেন বৈকি। আগে এঁদের কাছে যা আপনি জানতে চান জেনে নিন।

সেই ভাল, তাহলে আপনারা সকলে পাশের ঘরে যান, কী ? আমি এক-এক-জন করে ডেকে পাঠাবো, কী ?

হ্যাঁ, তাহলে সেই মতই হোক। আপনারা সকলে গিয়ে পাশের ঘরে অপেক্ষা করুন, মিঃ চৌধুরী এক এক করে যাঁকে যেমন ডাকবেন আসবেন। কিরীটী ওদের দিকে তাকিয়ে কাথাটা বললে।

সকলে নিঃশব্দে একের পর এক ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

বাইরে প্রবল ধারায় বর্ষণ শুরু হয়েছে, থেকে থেকে মেঘের ডাক ও বিদ্যুতের সোনালী ইশারা।

পাশের ঘরটাও অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের বিশ্রাম-কক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কয়েকখানা সোফা ও চেয়ার পাতা। ছোট একটি সিঙ্গল বেডে একধারে শয্যাও একটি বিস্তৃত। দেওয়ালে টাঙানো বড় বড় দুটি আয়না।

হিরন্ময় আজকের ব্যাপারে বিশেষভাবেই যেন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। জানলার ধারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে হিরন্ময় বসল। খোলা জানলাপথে স্টুডিওর পশ্চাৎ দিকটা চোখে পড়ে।

বিঘেখানেক জায়গা, একটা মজা পুষ্করিণী, তার পাড়ে ছোট একটা বাঁশঝাড়, এদিক ওদিকে বিক্ষিপ্ত কয়েকটা আম ও নারিকেল গাছ, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের আলোয় সবই স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে। প্রবল ধারায় বর্ষণ হচ্ছে। অন্ধকার, মেঘাচ্ছন্ন, বর্ষণমুখর প্রকৃতি যেন কালো আঁধার ও জলের পর্দা দিয়ে দৃষ্টিপথ থেকে আপনাকে সরিয়ে নিয়েছে। মধ্যে মধ্যে জলকণাসিক্ত হাওয়ার ঝাপটা সর্বাঙ্গে এসে শিহরণ জাগিয়ে তোলে।

অনিল পায়ে পায়ে এসে হিরন্ময়ের পাশটিতে দাঁড়াল, মৃদু কণ্ঠে ডাকে, হিরন্ময় ?

অনিল চৌধুরীর ডাকে হিরন্ময় সহসা যেন চমকে ওঠে, অ্যাঁ ! ও, অনিল ? এস।

আমার শরীরটা বড় খারাপ লাগছে ভাই। মাথাটা কেমন ঘোরাচ্ছে, বমি-বমি একটা ভাব—

হিরন্ময় তাড়াতাড়ি চেয়ারটা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, অনিলের হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ করে একান্ত স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলে, এই চেয়ারটায় বস।

দ্বিতীয়বার আর অনুরোধ জানাতে হয় না, অনিল হিরন্ময়-নির্দিষ্ট চেয়ারটার উপরে বসে পড়ল। তারপর সহসা দু হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে, অব্যক্ত চাপা অশ্রু- রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, পারছি না—পারছি না, এ আর আমি সহ্য করতে পারছি না ভাই ! এ কি হল ! এ কি হল ! সৌরেশ, শিশির, সুজিত···

বাকি কথাগুলো অনিল আর শেষ করতে পারে না কান্নায়, কণ্ঠস্বর যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল তার। অনিল কাঁদছে।

সমস্ত শরীরটা তার অসহ্য কান্নার আবেগে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ক্রন্দনরত, অবনতমুখ অনিলের দিকে হিরণ্ময় কিয়ৎক্ষণ স্থির বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

সান্ত্বনার একটা ক্ষীণ শব্দও যেন তার কণ্ঠ থেকে বের হয় না।

ইতিমধ্যে কক্ষমধ্যে একটা ফিসফিস--পরস্পর পরস্পরের মধ্যে মৃদু কথোপ কথনের গুঞ্জন উঠেছে। সেই গুঞ্জন ও বাইরে বৃষ্টির শব্দে অনিলের চাপা কান্নার শব্দটা ঢাকা পড়ে যায়।

কারও কানে যায় না।

হিরণ্ময় আরও একটু এগিয়ে এসে অনিলের পিঠের ওপরে একখানা হাত রেখে স্নেহকরুণ কণ্ঠে, বোধ হয় সান্ত্বনা দিয়েই বলে, অনিল ভাই—Don't loose your nerve! এ সময় আমাদের তো ভেঙে পড়লে চলবে না ভাই।

কিন্তু—কিন্তু এ যে অসহ্য! এ যে ভাবতেও পারছি না!

বাইরে অন্ধকার আকাশে বজ্রের আকস্মিক হুঙ্কার একটা শোনা যায় ও সেই সঙ্গে বিদ্যুতের চোখ-ঝলসানো আলো।

হ্যাঁ, আমি আপনাকে বলছি, এবারে আমি ইচ্ছে করেই খুনীকে একটা সুযোগ দিয়েছিলাম। প্রত্যেককেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল পূর্বাহ্ণেই, এখানে জলযোগ, চা ও শরবত পানের ব্যবস্থা থাকবে। এ ধরনের সুযোগ দেওয়ার খুনীকে—

বলেন কি মিঃ রায়! আপনি কী খুনীকে ইচ্ছা করেই তাহলে আবার হত্যা করবার সুযোগ দিয়েছিলেন, কী?

হ্যাঁ, আসলে কতকটা তাই বটে, তবে বললাম তো খুনীকে আবার এ ধরনের হত্যা করবার সুযোগ দেবার আমার দুটি কারণ ছিল।

কারণ ছিল, কী?

হ্যাঁ, প্রথমত একটা জিনিস, পূর্বের দুটি খুনের ব্যাপার থেকে নিঃসংশয় হতে পারছিলাম না যে, খুনী কেবলমাত্র দুটিকেই খুন করে শান্ত হবে, না এর পর আরও সে খুন করতে চাইবে? দ্বিতীয়ত আমার ইচ্ছা ছিল, যদি সত্যই তার আরও খুন করবার প্রয়োজন থাকে, যে সম্পর্কে আগেই যদিও একটিমাত্র ব্যাপার থেকেই প্রায় আমি স্থির নিশ্চিত হয়েছিলাম, তাহলে সে এ সুযোগটি নিশ্চয় হেলায় হারাবে না। এবং সে ক্ষেত্রে আমি নিজে এখানে উপস্থিত থাকলে অনেক কিছুই আমার চোখে হয়তো পড়বে, যার দ্বারা এ নৃশংস হত্যা-রহস্যের কোন কঠিন সূত্রকে আমি হয়তো খুঁজে পেলেও পেতে পারি।

বলেন কি মিঃ রায়, কী? তাই বলে রহস্যের মীমাংসায় পৌছবার জন্যে আপনি মানুষের প্রাণ নিয়ে এমন risk নেবেন, কী?

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, No risk no gain! কিন্তু আসলে ঠিক তাও

নয় বিরিঞ্চিবাবু, আমি আদপেই ভাবতে পারি নি, খুনী আমাকে শেষ পর্যন্ত এরকম করে বোকা বানিয়ে ছেড়ে দেবে। কিন্তু আর নয়—বার বার তিনবার! এখন আমি নিশ্চিন্ত, সে আবার তার তীব্র কালকূট সুযোগ পেলেই পরিবেশন করবে। কিন্তু সেই হবে তার শেষ ও চরম খেলা। বলতে বলতে সহসা কিরীটীর কণ্ঠস্বর যেন তীক্ষ্ণ ধারালো হয়ে ওঠে। কিরীটীর দেহটা সোজা, ঋজু হয়ে ওঠে এবং সমস্ত দেহটা যেন ইস্পাতের মতই কঠিন বলে মনে হয়!

হ্যাঁ, সেই হবে তার শেষ ও চরম খেলা। যে বিষের পাত্র হাতে সে মরণ-খেলা শুরু করেছে, সেই তীব্র বিষ তার হাতের পাত্রকে ভেদ করে তার দেহের শিরা-উপশিরা দিয়ে দেহের হাজারো, লক্ষ কোটি রক্তকণিকায়-কণিকায় ছড়িয়ে যাবে। নিষ্ঠুর চরম অভিশাপ তাকে মাথা পেতে নিতে হবে।

ঠিক এমনি সময় বাইরে দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

কে?

কিরীটীই এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়। দরজার ওপাশে যে যুবকটি দাঁড়িয়ে, সর্বাঙ্গ তার জলে ভিজে গিয়েছে।

যুবকের নাম অবিনাশ।

অবিনাশ মৃদু কণ্ঠে বলে, নেই স্যার।

নেই?

না, একটি মূর্তি নেই। সাতটা মূর্তি সেখানে আছে এখন।

কিরীটী কিছুক্ষণ অবিনাশের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তারপর মৃদুস্বরে বলে, আচ্ছা অবিনাশ, তুমি আমার গাড়ির মধ্যে গিয়ে বসে অপেক্ষা কর।

আচ্ছা স্যার।

অবিনাশ চলে গেল।

ছেলেটি কে? কী বলে গেল, কী? বিরিঞ্চি প্রশ্ন করে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

ও কিছু না।

কিরীটী মনে মনে ভাবছিল, আশ্চর্য! আজ সকাল দশটার সময়ও ও নিজে গিয়ে লেক টেরেসে 'নন্‌সেন্স ক্লাবে'র মধ্যে দেখে এসেছে আটটি বানরের প্রতিমূর্তিই আছে।

অবিনাশ আর জিতেনকে চব্বিশ ঘণ্টাই প্রায় বাড়িটার উপরে নজর রাখতে বলা হয়েছিল। ছেলে দুটি অত্যন্ত চালাকও। দুজনের চোখে ধুলো দিয়ে অনায়াসেই মূর্তিটা সরিয়ে নিল হত্যাকারী?

লোকটা সত্যি করিতকর্মা বটে!

এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, খুনের সঙ্গে মূর্তি অপসারণেরও একটা কোথাও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু সেটা কি?

মিঃ রায় ?

অ্যাঁ ! কিরীটী বিরিঞ্চির ডাকে যেন চমকে ওঠে, কিছু বলছিলেন মিঃ চৌধুরী ?

হ্যাঁ, এখন এদের—মানে স্টুডিওর লোকদেয় সম্পর্কে—

তার আর কোন প্রয়োজন হবে না বিরিঞ্চিবাবু। স্টুডিওর ভদ্রলোকদের অনায়াসেই যেতে দিতে পারেন, কারণ তারা এ ব্যাপারে কোন দিক দিয়েই সংশ্লিষ্ট নয় এবং সম্পূর্ণ নির্দোষ। বাকি বন্ধুদের প্রশ্নাদি করেও বিশেষ যে কিছু জানতে পারবেন বা খুনের মীমাংসায় কোন সাহায্য পাবেন বলে আমার মনে হয় না। এবং এঁদের আজকের মত যেতে দিন, শুধু ছেড়ে দেবার আগে বলে দিন, আপাততঃ ওরা কেউ যেন কলকাতার বাইরে কোথাও পুলিসের কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে না যান।

বলেন কি, কী ? অনেকক্ষণ বাদে একটা নাকের চুল ছিঁড়ে বিরাট একটা হাঁচি তুলে বিরিঞ্চি বলে ওঠেন, কী ? আপনি যখন নিশ্চয় করেই বলেছেন, এঁদেরই মধ্যে একজন হত্যাকারী, কী, তখন এঁদের জিজ্ঞাসাবাদ না করে এমনিই যেতে দেব, সেটা কি আইনসঙ্গত হবে, কী ?

সে ভার আমার, মানে সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার উপরেই রইল মিঃ চৌধুরী। ডি. আই. জি. কে ফোনে জানিয়ে দেবেন, কিরীটী রায়ের ব্যবস্থানুযায়ীই ওদের আপাততঃ জবানবন্দি না নিয়ে যেতে দেওয়া হয়েছে।

ডি আই. জি কে. ফোন করে দেব, কী ?

হ্যাঁ, তিনি জানেন—তাঁদের মত নিয়েই এ কেসটার আমি তদন্ত করছি।

তাই বলুন, কী। এই কথাটাই এতক্ষণ বলতে হয়, কী !

একটা চুল নাকের ভিতর থেকে ছিঁড়ে বিরিঞ্চি আবার একটা বিরাট হাঁচি দিলেন, হ্যাঁ-চো-চ্চো ! কী ?

আঠার

সে-রাত্রে গৃহে ফিরে কিরীটীর দরজার গোড়াতেই দেখা হয়ে গেল ভৃত্য জংলীর সঙ্গে।

জংলী বললে, তালুকদার সাহেব বাইরের ঘরে বহুক্ষণ ধরে কিরীটীর সঙ্গে দেখা করবে বলে অপেক্ষা করছে। কিরীটী প্রথম থেকেই তালুকদারের সঙ্গে বর্তমান কেসটি সম্পর্কে প্রতিদিনকার ঘটনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিল, কারণ উপরওয়ালার অনুমতিতেই তালুকদার কিরীটীর সাহায্য নিয়ে আইনত কেসটার ইনভেসটিগেশনের ভার নিয়েছিল।

রাত্রি প্রায় তখন সাড়ে দশটা হবে।

জংলীকে দু কাপ কফি দিতে বলে কিরীটী সোজা এসে বাইরের ঘরে প্রবেশ করল, এই যে তালুকদার, তারপর কতক্ষণ ?

বাবাঃ ! এতক্ষণ কোথায় ছিলে বল তো ? পাক্কা দুটি ঘণ্টা ধরে তোমার

অপেক্ষায় হাঁ করে বসে আছি।

কিরীটী একটা সোফার উপরে বসে গা এলিয়ে দিতে দিতে ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে বললে, বড্ড বোকা বনে গিয়েছি হে তালুকদার!

বল কি?

আর বলি কি! আমার চোখের উপর দিয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে চলে গেল—

কে? কে ডঙ্কা বাজিয়ে চলে গেল?

আর কে! হাতে যার কালকূটের পাত্র। সৌরেশ, শিশির ও সুজিতবাবুর হত্যাকারী।

সুজিতবাবুর হত্যাকারী! সুজিত—সুজিতবাবুও—বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে তাকায় তালুকদার কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, the same old story repeated again! আবার শরবতের গ্লাসে অদৃশ্য হস্তে কালকূট পরিবেশন ও হতভাগ্য সুজিতবাবুর মুহূর্তে পতন ও মৃত্যু!

অ্যাঁ। কি বলছ তুমি কিরীটী? আবার খুন!

হ্যাঁ। দাঁড়াও, ঘরটা বড় গরম হয়ে উঠেছে, জানালাগুলো খুলে দিই।

কিরীটী সোফা থেকে উঠে ঘরের বন্ধ জানালার খড়খড়িগুলো একটা একটা করে সব খুলে দিল। বর্ষণক্লান্ত রাত্রি মেঘহীন আকাশে অসংখ্য তারকা ইতি-মধ্যে ফুটে উঠেছে। জলকণাসিক্ত ঠাণ্ডা বাতাস খোলা জানালাপথে এসে চোখে-মুখে একটা ঝাপটা দেয়।

জংলী ট্রেতে করে দু কাপ ধূমায়িত কফি নিয়ে কক্ষে এসে প্রবেশ করে।

কিরীটী পুনরায় এসে সোফার উপরে একটা কফির কাপ হাতে তুলে নিতেই তালুকদার ওর দিকে তাকিয়ে বলে, শুরু কর হে!

কফি পান করতে করতেই সংক্ষেপে আজকের ঘটনাটা কিরীটী তালুকদারকে বলে যায়।

বুঝলে, এই হল সংক্ষেপে আজকের ঘটনা! আমাকে রীতিমত বোকা বানিয়ে ছেড়েছে হে হত্যাকারী!

তাই তো হে, ব্যাপারটা যে ক্রমেই জটিল ও ঘোরালো হয়ে উঠছে।

পকেট থেকে স্টুডিওতে ঐ দিন কুড়িয়ে পাওয়া হোমিওপ্যাথি ওষুধের খালি ছোট শিশিটা রুমালের সাহায্যে ধরে বের করে আলগোছে সেটা কিরীটী সামনের গোল কাঠের টেবিলটার উপরে নামিয়ে রাখল।

ওটা কি?

পালসেটিলা টু'হান্‌ড্রেডের একটা খালি হোমিওপ্যাথির শিশি। একান্ত নিরাসক্ত কণ্ঠে কিরীটী জবাব দেয়।

পালসেটিলা টু'হান্‌ড্রেডের খালি শিশি! বলতে বলতে তালুকদার হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে যেমন শিশিটা তুলে নিতে যাবে, কিরীটী আচমকা হাঁ-হাঁ করে বাধা দিয়ে ওঠে, আরে! আরে! কর কি, কর কি

তালুকদার সাহেব ?

আচমকা কিরীটী উচ্চকণ্ঠে বাধা দেওয়ায় তালুকদার হকচকিয়ে একেবারে যেন হতবুদ্ধি হয়ে থেমে যায়, কেন, কি হল ?

দাঁড়াও। বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল, for heaven's sake don't touch that blessed thing ! তারপর উঠে বলে, আল্লার দোহাই তোমার সাহেব, আমি না আসা পর্যন্ত হাত দিও না শিশিটায়। বলতে বলতে কিরীটী পাশের ঘরে চলে গেল।

হতভম্ব হয়ে তালুকদার বসে থাকে।

একটু পরেই ফিরে এল কিরীটী হাতে একটা লাল মলাটের মোটা বই নিয়ে এবং বইয়ের একটা অংশ খুলে সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসতে বসতে বললে, Now listen ! শোন—it's a protoplasmic poison, a colourless—volatile liquid with peculiar odour and it has got an acrid bitter taste ! It is absorbed rapidly by the mucous membrane. It quickly enters the blood from all parts of the body—utilises the oxygen from the blood and consequently the tissues suffer from oxygon starvation. A large dose at once arrests the heart in diastole etc. etc., বুঝলে বন্ধু ! ইহারই নাম অ্যাসিডাম্ হাইড্রোসায়ানিকাম্ বা হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড ! এবং এই ক্ষুদ্র পালসেটিলা টু'হান্ড্রেডের লেবেল বা মুখোশ-পরিহিত শিশিটির মধ্যে সাংঘাতিক ঐ পদার্থটিই ছিল—যা মাত্র ঘণ্টাকয়েক আগে হতভাগ্য সুজিত কর সুমিষ্ট শরবতের সঙ্গে পান করায় পরলোকের পথে নির্বিঘ্নে যাত্রী হয়েছেন।

অ্যাঁ ! ঐ শিশিটার মধ্যেই তাহলে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড ছিল ?

হ্যাঁ, অথচ যে যেহেতু ভয়ংকর পদার্থটি স্বভাবতঃই volatile সেই হেতু এখন আর কোন চিহ্নই শিশিটির মধ্যে তার উপস্থিত নেই। কিন্তু পদার্থের চিহ্ন না থাকলেও মালিকের হাতের চিহ্ন এখনও ওতে বর্তমান আছে সুনিশ্চিত, কেমিকেলের সাহায্যেই সেটা ধরা যাবে। তাই ওটায় হাত লাগাতে—

কেমিকেলের সাহায্যে !

হ্যাঁ, অস্মিক অ্যাসিডের সাহায্যেই ওই শিশির কাচের ওপরে finger print ফুটে উঠবে, তারপর তার একটা ফটোগ্রাফ নিলেই চলবে।

কিন্তু—

অবশ্য সেটাই খুনেই অকাট্য ও একমাত্র খুনীকে দোষী বলে সাব্যস্ত করবার প্রমাণ নয়—one of the evidences মাত্র। বহু প্রমাণের একটি।

আবার একটু থেমে কিরীটী বলে, শোন তালুকদার, আমি খুনীকে আর একটা সুযোগ দেব and that would be h s last chance—অর্থাৎ শেষ সুযোগ তার ভেল্কি দেখাবার। অবশ্য এভাবে খুনীকে আরও একটা সুযোগ দেওয়া মানেই সাংঘাতিক ভাবে risk নেওয়া, কিন্তু তা ভিন্ন আর দ্বিতীয়

পথ নেই—অতীব ধূর্ত অতীব ক্ষিপ্র ও অসাধারণ কৌশলী খুনী। এক্ষেত্রে চতুরের সঙ্গে চাতুরী না করলে তাকে ধরা যাবে না। আর শুধু তাই নয়, তাকে হাতেনাতে অর্থাৎ red-handed ধরতে হবে—

কিন্তু—

জানি তুমি কি বলতে চাও তালুকদার, খুনী আবার সুযোগ পেলেই বা তাকে সুযোগ দিলেই যে সে তার আত্মরূপ প্রকাশ করবে আবার হত্যা করবার জন্যে যে তীব্র কালকূটের পাত্র নিয়ে এগিয়ে আসবে তার কোন স্থিরতাই নেই, তথাপি এক্ষেত্রে আমি একটা চান্স নেব—

আমি তোমার কথার অর্থটা ঠিক বুঝতে পারছি না কিরীটী।

এও আমার এক্ষেত্রে খুনীর মানসিক গতি সম্পর্কে একটা থিয়োরি। আর একটু সোজা করে তোমায় বুঝিয়ে দিই শোন তালুকদার, এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যা হওয়া উচিত সেটাই বড় একটা হতে দেখা যায় না।

কি বলতে চাও তুমি কিরীটী?

খুনী তিন-তিনবার খুন করেছে অথচ আমরা কেউ তিনবারের একবারও তাকে স্পর্শ করতে পারলাম না এখনো পর্যন্ত। অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে সে যেন আমাদের সকলের চোখের উপর দিয়েই চাতুরীর খেলায় ট্রাম্প করে গেল! এতগুলো লোক আমরা স্রেফ বোকা বনে গেলাম। প্রথম থেকেই যদি তার উদ্দেশ্য থেকে থাকে যে ঐ তিনজনকেই সে হত্যা করবার জন্যে মনস্থ করেছিল, তাহলে চতুর্থবারে সে আর হত্যা করবে না কাউকে কারণ তার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঐ যে বললাম, তিন-তিনবার সে যে কৃতকার্য হয়েছে এবং বিশেষ করে শেষবার বুদ্ধির দাবা খেলায় আমাকে পর্যন্ত মাত করেছে তাতেই তার ভ্যানিটি বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক এবং যার জন্যে চতুর্থবার সে সুযোগ পেলে প্রয়োজন না থাকলেও কেবলমাত্র আমাকেই বোকা বানাবার জন্যে খুব সম্ভবত হত্যা করতে এগিয়ে আসবে এই আমার বিশ্বাস।

বল কি!

হ্যাঁ, ভ্যানিটি বড় বিচিত্র বস্তু। কিন্তু এ ছাড়াও আরও একটা বড় রকমের কারণ আছে বলে মনে হয়—

কি?

শেষের দুবারের হত্যার ব্যাপারটার মধ্যে definite প্ল্যান থাকলেও, প্রথম-বারের হত্যার প্ল্যানটা দেখলে স্বভাবতই কি একটা কথা আমাদের মনে হয় না যে, যেভাবে সে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল তাতে করে একমাত্র সে—মানে হত্যাকারী বাদে শুধু সৌরেশই নয়, দলের যে কেউ সেই নির্দিষ্ট গ্লাসটি থেকে জলপান করতে পারত? তাই যদি হয় তা হলে তিন নম্বরেই যে সে হত্যালীলা খতম করবে তার কি নির্দিষ্ট কোন স্থিরতা আছে? অতএব আমি আর একবার চান্স নেবই—

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব কিরীটী ?

বল !

তুমি কি খুনি কে—

কতকটা জানি বইকি, তবে—

তবে ?

এখনও এ খুনের মোটিভ বা উদ্দেশ্যটা ঠিক কি, বুঝে উঠতে পারিনি। তা যদি পারতাম, তাহলে হতভাগ্য সুজিত করকে বোধ হয় আজ নিহত হতে হত না। শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচাতে পারতাম তো নিশ্চয়ই, হত্যাকারীকেও আজ ছেড়ে দিতাম না। তোমার কাছে গোপন করব না ভাই, বিশেষ করে ঐ উদ্দেশ্যটা জানবার জন্যেই এবারের সুযোগটা তাকে আমি স্বেচ্ছায় দিয়েছিলাম কিন্তু এবারেও বুঝতে পারলাম না। আর একটা জিনিস, এই হত্যাগুলোর সঙ্গে 'নন্‌সেন্স ক্লাবে'র বাঁদরের মূর্তিগুলো অপসারণের ঠিক যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে তাও এখনো পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারছি না। মোটিভ যদিও একটা খাড়া করা যায় কিন্তু ঐ মূর্তিগুলোই যেন সব গোলমাল করে জট পাকিয়ে দিচ্ছে।

এবারেও কি একটা মূর্তি তাহলে—

হ্যাঁ, এবারেও একটি মূর্তি চুরি গিয়েছে। 'ননসেন্স ক্লাবে'র আর একটি বাঁদরের মূর্তি অদৃশ্য হয়েছেন পূর্বের মতই যথারীতি। কিরীটী মৃদু হেসে জবাব দিল।

ঢং ঢং করে দেওয়াল-ঘড়িটা রাত্রি বারোটা ঘোষণা করলে।

কিরীটী তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, উঃ, বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে—এখুনি বেরুতে হবে !

এত রাত্রে আবার কোথায় বের হবে ?

অভিসারে। রহস্যময় হাসি হেসে কিরীটী বলে।

অভিসার !

হ্যাঁ, তাই। তাহলে এখন এস। কিরীটী আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে রুমালের সাহায্যে আলগোছা টেবিলের উপরে রক্ষিত শিশিটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে পাশের কক্ষে চলে গেল।

তালুকদারও উঠে দাঁড়াল।

ও ভাল করেই জানে, এরপর কিরীটী রায় একেবারে সম্পূর্ণ অন্য জগতের মানুষ। কোন একটা রহস্যের মীমাংসার কিনারায় প্রায় যখন কিরীটী এসে পৌঁছয়, সামান্য দু-একটা পয়েন্ট একটু-আধটু গোলমাল থাকে—তখন মনের মধ্যে লোকটা অদ্ভুত একটা চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা অনুভব করে।

খুব বেশী নয়, অথচ শরীরে একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার থাকলে শরীর ও মনের মধ্যে একটা বিশ্রী গ্লানি ও অস্থিরতা যেমন জাগে—ঐ অবস্থায় কিরীটীরও দেহে মনে অমনি গ্লানি ও অস্থিরতা জাগে।

অত্যন্ত ক্রিয়াশীল মন তার, ঐ সময় অদ্ভুতভাবেই যেন চঞ্চল অস্থির ও ভাবাবেগে তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে। ঐ সময় কিরীটী নিজে থেকে ঠিক যতটুকু বলে তার একটি বর্ণও বেশী তার মুখ থেকে বের করা যাবে না।

সাপ যেমন এক-একসময় গর্তে মুখ দিলে তাকে টেনে বের করা দুঃসাধ্য, কিরীটীও ঠিক তেমনি অসাধ্য কঠিন হয়ে ওঠে ঐ সময়টিতে।

উনিশ

কিরীটী তার ল্যাবরেটারির মধ্যে একটা প্রমাণ-সাইজের আয়নাযুক্ত ড্রেসিং টেবিলের সামনে ঘূর্ণ্যমান ছোট একটা টুলের উপরে বসে রূপসজ্জায় ব্যস্ত।

ড্রেসিং টেবিলের একপাশে রক্ষিত ডোমে-ঢাকা ইলেকট্রিক টেবিল ল্যাম্পের আলোয় আয়নার সামনে বসে কিরীটী রূপসজ্জা নিচ্ছে।

সাধারণ মুসাফির পথিক। মাথার চুল রুক্ষ, বিস্রস্ত, বহুদিন যেন তেলের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। একটা চোখ কানা —ঠুলি বাঁধা। ডান দিককার গালে মস্ত বড় মেলানিন টিউমার।

এখুনি তাকে বেরুতে হবে।

মালবিকার চোখে ঘুম নেই।

ঘরের মধ্যে একাকী মালবিকা অস্থির পদে পায়চারি করছে।

একদা যারা যে কারণেই হোক তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিল, একে একে আজ তাদের মধ্যে দুজন গতাসু।

বাকি দুজনের একজন তো মাত্র দুদিন আগেই রূঢ়ভাবে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছে, ক্ষণিকের মোহ আজ আর তার নেই, এমন কি সেই মোহের শেষ স্মৃতিটুকু পর্যন্ত সে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে দিতে চায়।

এবং আর একজন—তাকে আজ আর বুঝতে অন্তত মালবিকারও কষ্ট হয় না এতটুকু, সামান্যতম মোহও আজ আর মালবিকার প্রতি তার নেই।

কথাগুলো মনে মনে ভাবতে গিয়েও, অন্ধকার ঘরের মধ্যেও অপমান লজ্জা ও ধিক্কারে যেন মালবিকা নীল হয়ে ওঠে। চরম নিষ্ঠুরভাবেই ব্যর্থ হয়েছে আজ তার নারী জীবনের সমস্ত কিছু। সমস্ত স্বপ্ন। সমস্ত গোপন আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু কেন? কে তার জন্যে দায়ী? সৌরেশ, শিশির, অনিল, হিরন্ময় ও সৌমিত্র—এদের মধ্যেই কি কেউ?

শিশির ও সৌরেশ আজ এদের মধ্যে গত, সুজিত তাকে কোন দিনই না জানতে দিলেও মালবিকা মনে মনে এতদিন ভেবেছে, সুজিত তাকে পাবে না জেনেই যেন অবহেলা করে তাকে নিজের মনে সান্ত্বনা পেতে চাইত।

এখন কেন যেন মনে হচ্ছে ঐ ধারণাটাও বোধ হয় তার ভুল।

অসুস্থ মনের বিকৃত কল্পনাবিলাস মাত্র।

অনিল চৌধুরীও ঘুমোয়নি।

তার গৃহের শয়নকক্ষ-সংলগ্ন ছোট একটি ঘরে স্টুডিও করে নিয়েছিল সে। সেই ঘরে বসে বসেই নির্জনে সে ছবি আঁকত।

স্টুডিও থেকে ফিরে আজ রাত্রেও সে সেই ঘরের মধ্যেই এসে ঢুকেছে। পর পর দেওয়ালে এগারোখানি ক্যানভাস টাঙানো।

ইচ্ছা ছিল অনিলের, নিজের ও দশটি বন্ধু-বান্ধবীর একটি করে কালার-পেণ্টিং করে একদিন সকলকে ডেকে এনে ছবিগুলো দেখিয়ে সে চমক লাগিয়ে দেবে। ধীরে ধীরে অনিলের ছবির কাজ এগুচ্ছিল।

হিরণ্ময়, কমলা ও সুজিতের ছবি মাত্র শেষ হয়েছিল, অন্যগুলো তখনও বাকি—ঐ সব ছবিগুলো অনিল সম্পূর্ণভাবেই তার স্মৃতিশক্তির ওপরে নির্ভর করে আঁকছিল।

এমন সময় আকস্মিকভাবেই ঘটে গেল সৌরেশের মৃত্যু। চারটে দিনও গত হল না, নিহত হল শিশির। মাঝখানে দশটি দিনও অতিবাহিত হল না, সুজিতও আজ—

সত্যিই অনিল যেন আজ ভাবতে পারছে না।

এই তো মানুষের জীবন! এই তো বন্ধুত্ব ও প্রীতির মূল্য! সাবানের বুদবুদের মতই যেন জেগে উঠেই ফুৎকারে ভেঙে কোথায় হারিয়ে গেল—মিলিয়ে গেল সব কিছু!

সুইচ টিপে অনিল ঘরের একশত শক্তির আলোটা জেবলে দেয়। ঝলমল করে ওঠে সমগ্র কক্ষখানি উজ্জ্বল আলোর দ্যুতিতে।

চারিদিকে দেওয়ালের ছবিগুলো—নানা রঙ, নানা কল্পনার মধ্যে শিল্পীর যে স্বপ্ন, অকস্মাৎ যেন ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে।

সৌরেশের মৃত্যুর পর সৌমিত্রের অর্ধসমাপ্ত ছবিখানা—ইতিপূর্বে যেটা সে আঁকতে শুরু করেছিল, মধ্যপথে অসমাপ্ত রেখেই সেটা শুরু করেছিল সৌরেশের ছবিখানা আঁকতে।

অনেকটা অগ্রসর হয়েছে এই কদিনেই অনিল। সৌরেশের মুখখানা ক্যানভাসের বুকে প্রায় ফুটে উঠেছে। পরিচিত জনেরা অবশ্য ছবিখানা দেখলেই বলবে, অবিকল সৌরেশেরই ছবি।

হুবহু সৌরেশের প্রতিচ্ছায়া যেন।

সেই দুটি চক্ষু—সাগরের গভীরতা যেন দুটি চোখের তারায় তার। টানা টানা দুটি ভ্রূ। খড়্গের মত ধারালো উন্নত নাসিকা। কোঁকড়ানো ওল্টানো চুলের সীমান্তে টানা কোমল অর্ধচন্দ্রাকৃতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক কপালখানি ছিল তার।

হ্যাঁ, ঐ কপালটিই ঠিক আসছে না। কিছুতেই অনিলের মন তৃপ্ত হচ্ছে না। বার বার তুলি বোলাচ্ছিল সে ছবির কপালের অংশে আজ কদিন ধরে।

আর হয়নি আঁকা ওর মত ওষ্ঠ দুটি। দুটি যেন পদ্মের পাপড়ি ছিল তার দুটি ওষ্ঠ। সৌরেশের ওষ্ঠপ্রান্তে সর্বদা হাসি যেন লেগেই থাকত, যার ফলে উপর ও নিচের ওষ্ঠ দুটি সামান্য বিভক্ত হয়ে থাকত, মধ্যদেশ ঈষৎ বিস্তৃত, প্রান্তে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত।

সৌরেশের পাশেই শ্বেতশুভ্র ক্যানভাসখানিতে অনিল স্থির করছিল আঁকবে শিশিরের প্রতিকৃতি। গতকাল দ্বিপ্রহরে সৌরেশের ছবির সামান্য ত্রুটিটুকু অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও যখন অনিল ঠিক করে উঠতে পারেনি, পেনসিলটা নিয়ে পাশের ক্যানভাসখানির উপরে প্রাথমিক কয়েকটা রেখা টেনেছিল মাত্র—আজও সৌরেশের ছবির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় ক্লান্ত আঁখি তুলে পাশের পেনসিলে রেখাঙ্কিত ক্যানভাসটার দিকে তাকাল অনিল।

সুদক্ষ শিল্পীর সামান্য কয়েকটি পেনসিলের রেখাতেই শিশিরের একটা প্রতিচ্ছায়া যেন শুভ্র ক্যানভাসটার বক্ষে আবছাভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

সৌরেশ আর শিশির!

নেই, তারা আজ আর নেই—দুজনের একজনও।

সুজিতও চলে গেল ওদের ছেড়ে আজ।

কালের যাত্রাপথে হারিয়ে গেল সৌরেশ, সুজিত আর শিশির।

সমস্ত মনটাই যেন একেবারে খালি, শূন্য হয়ে গিয়েছে। নিদারুণ একটা ব্যথায় ভরা শূন্যতা যেন সমগ্র মনকে নিঃস্ব, রিক্ত করে দিয়েছে। বুকখানা কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল অনিলের।

কক্ষের এক কোণে সুদৃশ্য একটি জয়পুরী কারুকার্যখচিত দণ্ডের উপরে রক্ষিত ধূপাধারটি। ছবি আঁকবার সময় অনিল ধূপাধারটি জ্বালিয়ে দেয়। মিষ্ট, পাতলা চন্দনগন্ধী ধূপের রেশ বায়ুস্তরে ভেসে বেড়ায়। অনিল আপন মনে কাজ করে।

আঁকবার সাজসরঞ্জাম সাজিয়ে নিয়ে অনিল ধূপাধারটি জ্বেলে দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সুস্নিগ্ধ চন্দনের সুবাসে সমগ্র কক্ষখানি যেন আমোদিত হয়ে উঠল। পশ্চিমের জানলাটি খুলে দিল অনিল। মধ্যরাত্রির আকাশে ছিন্ন, ভাসমান, মেঘান্তরাল থেকে একফালি বাঁকা চাঁদ ক্ষণে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে আবার ক্ষণে মেঘে ঢাকা পড়ছে। অস্পষ্ট, ক্ষীণ আলো সমগ্র প্রকৃতি জুড়ে স্বপ্নের মত ভেসে বেড়াচ্ছে।

তুলিটা হাতে অনিল আবার দাঁড়ায় সৌরেশের প্রায়-সমাপ্ত ছবির ক্যানভাস-টার সম্মুখে এসে। তারপর গোল টুলটা টেনে নিয়ে বসল অনিল।

তুলিটা হাতে ধরে, নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে অনিল সৌরেশের প্রতিকৃতির প্রতি।

বন্ধু, তুমি আজ কতদূরে—কোন্ অদেখা অন্ধকারের রহস্যঘেরা সীমানা পেরিয়ে কোন্ মায়ালোকে চলে গিয়েছ জানি না।

তোমার সমস্ত প্রীতি, ভালবাসা, স্নেহ স্মৃতিমাত্র হয়ে বুকের মধ্যে জমাট বেঁধে আছে এখনও।

ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তুমি যদিও আজ চলে গিয়েছ বন্ধু, প্রতি মুহূর্তে তবু তোমার কথা মনে পড়ছে।

তোমাকে একটি মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারছি না।

সর্বক্ষণ তুমি যেন আমাদের পাশে পাশেই রয়েছ।

তৃষ্ণার পানীয়ের সঙ্গে তীব্র হলাহল মিশিয়ে দিয়ে তোমায় হত্যা করেছি আমরা।

কেবল তোমাকে নয়—সৌরেশ, শিশিরকেও হত্যা করেছি এবং তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে আবার আজ হত্যা করলাম সুজিতকেও।

কিন্তু কেন—কেন তোমাদের তিনজনকে হত্যা করেছি আমরা ?

আত্মচিন্তায় বিভোর অনিল ভুলে যায় সব কিছু। তুলিটা হাতে করেই ক্যানভাসটার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে পাথরের মত নিশ্চল টুলটার ওপরে বসে থাকে।

সময় কেটে যায়।

হঠাৎ যখন খেয়াল হল, মনে হল সমস্ত কক্ষখানি যেন একটা অসহ্য গুমোটে ভরে উঠেছে। শ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। একটা তপ্ত বাষ্পে যেন কক্ষের বাতাস সীসার মতই ভারী ও শ্বাসরোধকারী মনে হচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি উঠে সুইচ টিপে অধিক শক্তির বৈদ্যুতিক আলোটা নিভিয়ে দিল অনিল। মুহূর্তে কক্ষখানিকে অন্ধকার যেন গ্রাস করলে।

ঘরের বাকি দুটো জানলাও খুলে দিল।

আকাশে চাঁদ এখন মেঘান্তরাল থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে। ক্ষীণ, অস্পষ্ট চাঁদের আলো পাতলা একটা কুয়াশার মত যেন সমগ্র প্রকৃতি জুড়ে থিরথির করে কাঁপছে।

বাতাস একেবারে থেমে গিয়েছে, কোথাও বাতাসের লেশমাত্রও নেই।

বার বার কেন না-জানি অনিলের এই মুহূর্তে ঘুরে ফিরে কেবল সৌরেশের কথাই মনে পড়ছে। সেই সঙ্গে মনে পড়ছে শিশির ও সুজিতের কথা।

অকস্মাৎ যেন মনে হয় তিনজোড়া চক্ষু অন্ধকারে ওর পশ্চাতের দিকে তাকিয়ে আছে পলকহীন।

অকারণেই মনটার মধ্যে যেন কেঁপে ওঠে। শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা ঠাণ্ডা বরফের মত অনুভূতি নীচের দিকে নেমে চলেছে।

কে ? অন্ধকারে ঘরে কি কেউ এসেছে ?

আশ্চর্য ! একটা অদৃশ্য শক্তি যেন দু'বাহু দিয়ে ওর সমস্ত চেতনা ও অনুভূতিকে টানছে পশ্চাতের দিকে। ফেরো। এদিকে ফিরে তাকাও। তাকাও

পিছনের দিকে।

কে? তোমরা কি চাও?

শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য শক্তির অলঙ্ঘ্য আকর্ষণেই যেন অনিলকে ফিরে তাকাতেই হল। অনিল ফিরে তাকাল।

দণ্ডের উপরে রক্ষিত ধূপাধারের আগুনটা নিভে গিয়েছে অনেকক্ষণ বটে, কিন্তু নির্বাপিত হোমানলের মতই ভস্মস্তর ভেদ করে চাপা রক্তাভ অদ্ভুত একটা দ্যুতি যেন ফুটে বের হচ্ছে।

সেই চাপা রক্তাভ বিচ্ছুরিত দ্যুতিতে যেন সমগ্র কক্ষখানি প্রবালের মতই অদ্ভুত রঙে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে।

ভয়াবহ নিস্তব্ধতা। নিথর, নিস্তরঙ্গ সেই প্রবালের মত আলোর জ্যোতি মহাকালের অনির্বাণ সংকেতের মত যেন অবশ্যম্ভাবী কোন এক সম্ভাবনার কথাই জানিয়ে দিচ্ছে আঁধার আলোর সীমান্ত রেখায় পরিস্ফুটমান অনিবার্য এক মহাসত্য যেন।

সহসা কক্ষমধ্যে কোথা থেকে যেন বয়ে এল হিমতীক্ষ্ণ এক বায়ুপ্রবাহ। সর্বাঙ্গে শিহরণ তুলে গেল। পৃথিবীর নয়, মাটির নয়, অন্যলোকের যুগান্ত-ব্যাপী অন্ধকারের কুক্ষি থেকে যেন বয়ে এল হিমতীক্ষ্ণ একঝলক বায়ুপ্রবাহ।

তারপর—

অনিল স্পষ্ট দেখতে লাগল: অদূরে কক্ষের কোণে রক্ষিত ধূপাধারের ভস্মাবৃত রক্তাভ অগ্নিআভা থেকে যেন অস্পষ্ট ধোঁয়ার মতই সরু একটি ঊর্ধ্ব-মুখী রেখা ক্রমে কুণ্ডলাকৃতি হতে হতে বিশেষ একটা আকার নিচ্ছে।

সুস্পষ্ট আকার নিচ্ছে চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে অল্পে অল্পে। ক্ষীণ, অস্পষ্ট ঘষা কাঁচের অন্তরাল থেকে বিচ্ছুরিত চাপা আলোর মত দেখা গেল একখানি মুখাকৃতি। একেবারে অস্পষ্টও নয়, সুস্পষ্ট ও নয়।

কে? কে?

অনুচ্চারিত একটা শব্দ অনিলের কণ্ঠের মধ্যে যেন আর্ত বেদনায় গুমরে ওঠে, সৌরেশ! সৌরেশ! সত্যি-সত্যিই কি তাই তুমি আমায় দেখা দিতে এসেছ? বল, বল বন্ধু! সত্যিই কি তুমি? এ আমার চোখের ভুল নয় তো? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?

আশ্চর্য আশ্চর্য!

তার পাশে ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে আরও দুটি ছায়ায় গড়া অস্পষ্ট দুটি মুখ, প্রথমটির দু'পাশে। একটি অবিকল শিশিরের মত, অন্যটি সুজিতের মত।

এ কি! এ কি!

সৌরেশ—শিশির—সুজিত! তোমরা! তোমরা সত্যিই কি এসেছ?

সৌরেশের দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ দুটি ঈষৎ যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে।

কি যেন বলবার চেষ্টা করে ও।

ওষ্ঠ দুটি কুঞ্চিত ও প্রসারিত হচ্ছে, কিন্তু কোন শব্দই ফুটে বের হচ্ছে না।

সৌরেশ।

সহসা যেন নিঃশব্দে একটা আর্ত চিৎকার করে ওঠে অনিল।

বিষ! বিষ! সৌরেশের ওষ্ঠ দুটি যেন কেঁপে কেঁপে উচ্চারণ করে।

পরক্ষণেই একটা হিমতীক্ষ্ণ প্রবল বায়ুর ঝাপটা অনিলের সর্বাঙ্গে যেন একটা শিহরণ তুলে জানলাপথে বের হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল ছায়ার মায়া, আলোর অস্পষ্ট স্বপ্নরেখা। জমাট নিশ্ছিদ্র আঁধারে কক্ষখানি মুহূর্তে ভরে গেল।

হতবাক মুহ্যমান অনিল ভাল করে কিছুই বুঝতে পারে না।

আশ্চর্য! এতক্ষণে কি জেগে-জেগেই ও স্বপ্ন দেখছিল? স্বপ্ন!

হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপে আবার ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিল অনিল। পূর্বের সেই উজ্জ্বল আলোটা নয়, নীলাভ একটা মৃদু আলো।

পিপাসায় কণ্ঠতালু যেন মরুভূমির মত শুষ্ক হয়ে উঠেছে। ঘরের কোণে রক্ষিত সোরাই থেকে কাচের গ্লাসটার জল ভরে জলপান করতে যাবে, মৃদু করাঘাত রুদ্ধ দ্বারে শোনা গেল।

কে! এত রাত্রে আবার কে এল!

জলটা আর খাওয়া হল না অনিলের, সম্মুখের টুলটার ওপরে জলভর্তি কাচের গ্লাসটা রেখে এগিয়ে গেল অনিল অর্গলবদ্ধ দ্বারের দিকে।

আবার মৃদু করাঘাত দরজায়।

কক্ষের দ্বার খুলে দিতে গিয়ে বর্ষাতি হাতে বর্ষাতি টুপিটা, ঠোঁটের উপরে পাকানো গোঁফ আগন্তুককে দেখে অনিল চমকে ওঠে, কে আপনি!

আগন্তুক অনিলের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে একপ্রকার তার গা ঘেঁষেই যেন ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

বিস্মিত মুহ্যমান অনিল আগন্তুকের দিকে চেয়ে থাকে।

আগন্তুক ঠোঁটের উপর থেকে নকল গোঁফটা খুলে ফেলতেই অনিল বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে, এ কি তুমি! এত রাত্রে?

এত রাত্রে এই বেশে আমায় দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছ, না?

না, মানে—

নিঃশব্দে হাসি জেগে ওঠে আগন্তুকের ওষ্ঠপ্রান্তে।

রাত্রির তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। কেউ কোথাও হয়তো এখন জেগে নেই। সুষুপ্তির কোলে সারা পৃথিবী মগ্ন।

বলছি সব, এক গ্লাস জল খাওয়াতে পার? বড় পিপাসা পেয়েছে! বাঃ, এই যে গ্লাসে ভর্তি জল! ও, তোমারও বুঝি পিপাসা পেয়েছিল?

হ্যাঁ। জল খেতে যাচ্ছি এমন সময় তুমি—

কিছু মনে করো না। সত্যি বড় পিপাসা পেয়েছে। দাঁড়াও, আমি জলটা

খেয়ে তোমায় আর এক গ্লাস ভরে দিচ্ছি। please don't mind!

ঢকঢক করে সমস্ত জলটুকু আগন্তুক পান করে নিল।

কুড়ি

কিরীটী রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারে তার গাড়িতে চেপে লেক টেরেসের দিকে চলছিল? গাড়ির পশ্চাতের সীটে বসে হীরা সিং ড্রাইভার!

দেশপ্রিয় পার্কের দক্ষিণ কোণে এসে গাড়ি থেকে নেমে হীরা সিংয়ের হাতে গাড়ি দিয়ে পদব্রজে কিরীটী লেক টেরেসের দিকে এগিয়ে চলল।

ছিন্ন মেঘের আড়ালে বাঁকা চাঁদ উঠেছে। পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছে তারই ক্ষীণ আলো। রাস্তাটা একেবারে জনহীন। অস্পষ্ট আলোছায়ায়-ঘেরা রাস্তার দু'পাশে বড় বড় বাড়িগুলো নিস্তব্ধ, নিঝুম।

কোন সাড়াশব্দ নেই। ঘুমের ঘোরে সবাই অচেতন।

অবিনাশ ছিল নন্‌সেন্স ক্লাবের প্রহরায়।

নির্দিষ্ট জায়গায় এসে কিরীটী তার দেখা পেল।

আবছা আলো-আঁধারিতে অদ্ভুত বেশে কিরীটীকে দেখে হঠাৎ যেন অবিনাশ চমকে ওঠে, কে?

ভয় নেই অবিনাশ, আমি কিরীটী।

আপনি!

হ্যাঁ। কোন নতুন খবর আছে?

না স্যার। কাউকে এদিকে আসতে দেখিনি।

কিরীটী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল 'নন্‌সেন্স ক্লাবে'র দিকে।

দোতলা বাড়িটা রাস্তার উপরে, একটা টানা বারান্দা, তারই এক প্রান্তের ঘর দুটিতে 'নন্‌সেন্স ক্লাব'।

বারান্দায় কাঠের পার্টিশন তুলে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ওদিক-টাকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেওয়া হয়েছে!

হঠাৎ দপ্‌ করে বোধ হয় ক্লাবঘরের আলো জ্বলে উঠল।

বন্ধ খড়খড়ির ফাঁকে অন্ধকারে ঘরের মধ্যে যে আলো জ্বলে উঠেছে বুঝতে কিরীটীর কষ্ট হয় না।

কিরীটীর সমস্ত দর্শনেন্দ্রিয় যেন তীক্ষ্ণ সজাগ হয়ে ওঠে।

চোখের মণি দুটো অন্ধকারে বাঘের চোখের মত জ্বলতে থাকে।

চাপা কণ্ঠে কিরীটী ডাকে, অবিনাশ!

আজ্ঞে?

তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

কিরীটী দ্রুত অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘরের আলোটা একটু পরেই নিভে গেল দপ্‌ করে।

* * *

কিরীটী আগে দু-তিনবার 'নন্‌সেন্স ক্লাবে' এসে এ-বাড়ির সব কিছু দেখেশুনে গিয়েছে।

এ-বাড়ির সব কিছুই ওর নখদর্পণে। কিরীটী এসে সিঁড়ির দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজায় তালা ঝুলছে।

পকেট থেকে একটা সরু পেনসিল-টর্চ ও একটা চাবি বের করে কিরীটী টর্চের আলোর সাহায্যে চাবিটা তালার মধ্যে দিয়ে ঘোরাতেই তালাটা খুলে গেল খট্ করে একটা শব্দ করে।

সিঁড়ি বেয়ে কিরীটী দোতলায় উঠে গেল।

ক্লাবঘরের দরজার সামনে এসে কিরীটী দাঁড়াল।

কান পেতে শোনবার চেষ্টা করে ঘরের মধ্যে কোন শব্দ শোনা যায় কিনা।

কিন্তু না, ঘরের মধ্যে কোন শব্দই নেই।

ঘরের দরজার ল্যাচ্-কিটা ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল।

অন্ধকার ঘরটা।

হাতের মুঠোর মধ্যে ধৃত পেনসিল-টর্চের গায়ে স্প্রিংটা টিপতেই সরু একটা আলোর অনুসন্ধানী রশ্মি তীরের মত গিয়ে যেন ঘরের অন্ধকারকে ভেদ করলে। একটু চেষ্টা করতেই, আলোর রশ্মি যেখানে বাঁদরের মূর্তিগুলো পর পর পাশাপাশি বসানো আছে সেখানে গিয়ে পড়ল।

দুবার মূর্তিগুলোর উপরে কিরীটী আলোর রশ্মি ফেললে।

আশ্চর্য! আশ্চর্য!

দেওয়ালের গায়ে সুইচটা যে কোথায় কিরীটীর জানা। এগিয়ে গিয়ে সুইচটা টিপে দিতেই উজ্জ্বল আলোয় কক্ষখানি ঝলমল করে ওঠে।

কিরীটী আবার তাকাল বাঁদরের মূর্তিগুলোর দিকে।

এ কি!

চারটি মূর্তি নেই! আছে মাত্র ছটি মূর্তি!

অকারণ একটা আশঙ্কায় সহসা যেন কিরীটীর বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

আরও একটা মূর্তি ইতিমধ্যে অপসারিত হয়েছে। কিন্তু কখন হল—কখন?

উত্তেজনায় কিরীটীর মনের মধ্যে যেন ঝড় বইতে শুরু করে।

তবে কি আরও একজন ইতিমধ্যে নিহত হয়েছে?

কে? কে নিহত হল আবার? কে এই সামান্য কয়েক ঘণ্টায় আবার কালকূটের তীব্র ক্রিয়ায় ধরাশায়ী?

কে? কে? কে?

হঠাৎ এমন সময় দরজার গোড়ায় একটা সতর্ক পদশব্দ শোনা যায়। বিদ্যুৎগতিতে কিরীটী ফিরে দাঁড়াতেই ও চমকে ওঠে।

দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সৌমিত্রবাবু।

সৌমিত্রও কিরীটীকে ছদ্মবেশে চিনতে না পেরে এবং ঐ সময় গভীর রাত্রে ক্লাবঘরের মধ্যে দণ্ডায়মান দেখে, বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

কে—কে তুই ?

সৌমিত্র কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল।

একেবারে কিরীটীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, এই, কথা বলছিস না কেন ? কে তুই ? এ ঘরে ঢুকলি কি করে ? কেন এসেছিস ?

সে প্রশ্ন তো আমিও পাল্টা আপনাকে করতে পারি সৌমিত্রবাবু ! আপনিই বা এত রাত্রে চোরের মত ক্লাবঘরে অন্যের অজ্ঞাতে এসেছেন কেন ?

কে ! চমকে ওঠে সৌমিত্র।

মৃদু হেসে কিরীটী বলে, চিনতে পারছেন না সৌমিত্রবাবু ?

কে—কে ? কি—রী—

হ্যাঁ, চিনতে পেরেছেন তাহলে ! সত্যিই আমি কিরীটী রায়।

বোবা দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সৌমিত্র কিরীটীর মুখের দিকে।

আমাকে এ সময়ে এখানে দেখতে পাবেন আদপেই আশা করেননি, না ? just a bolt from the blue, না ? তারপর হঠাৎ এইভাবে অসময়ে এখানে চোরের মত আপনার পদার্পণের হেতুটা কি জানতে পারি কি সৌমিত্রবাবু ?

আমি—আমি—

এবারে আবার কাকে কালকূট পরিবেশন করলেন ? কার গলায় এবারে ঢেলে এলেন হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড ?

হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড ! বিস্মিত সৌমিত্রের কণ্ঠ থেকে একটা যেন আর্ত শব্দের মতই কথাগুলো ফুটে বের হল।

আপনি সরকারের একজন অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট, রসায়নে ব্যুৎপত্তি যথেষ্টই আছে বলেই লোকে জানে, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড নামটা কি আপনার কাছে বেশী দুর্বোধ্য ঠেকছে সৌমিত্রবাবু !

আমি—এ—এ আপনি কি বলছেন কিরীটীবাবু ? আপনি—আপনি কি মনে করেন সত্যি-সত্যিই আমিই আমার বন্ধুদের বিষ দিয়ে হত্যা করেছি ?

যদি তাই ভেবে থাকি সৌমিত্রবাবু, খুব কি অন্যায় করেছি ? আপনার চাইতে বিয়ের ক্রিয়া সম্পর্কে আর কার বেশী ও সম্যক্ জ্ঞান থাকতে পারে বলুন ! টকসিকোলজিতে (বিষ-বিজ্ঞান) আপনার চাইতে দলে আর কার বেশী জ্ঞান থাকতে পারে, বলুন ! বিষের প্রয়োগকৌশলেও আপনার চাইতে দলের মধ্যে আর কে বেশী জ্ঞানী থাকতে পারে বলুন ?

এসব আপনি কি বলছেন কিরীটীবাবু ?

আমি যা বলছি নিশ্চয় জেনেই বলছি যে তা আপনার কাছে মোটেই দুর্বোধ্য ঠেকছে না। কিন্তু তারও আগে দুটো প্রশ্নের আমার জবাব দিন তো

সৌমিত্রবাবু !

প্রশ্নের জবাব দেব ?

হ্যাঁ। প্রথম প্রশ্ন আমার, কেন এ সময় চোরের মত লুকিয়ে ক্লাবঘরে এসেছেন ? দ্বিতীয় প্রশ্ন, কলকাতায় উপস্থিত থেকেও অনিলবাবুর জন্মতিথি উৎসবে সে-রাত্রে আপনি যোগ দেননি কেন ?

সৌমিত্র কিরীটীর প্রশ্নে যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে।

চোখে-মুখে অসহায় একটা কারুণ্য যেন ফুটে উঠেছে।

ভাবছেন হয়তো আমি অন্তর্যামী কিনা। না, না মশাই—অন্তর্যামী আমি মোটেই নই। অতি সাধারণ একজন মানুষ, কিন্তু তবু জানতে পেরেছি আপনি সেদিন মানে অনিলবাবুর জন্মতিথি উৎসবের রাত্রে কলকাতাতেই উপস্থিত ছিলেন।

হ্যাঁ, আমি কলকাতাতেই সে-রাত্রে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু তাতেই কি প্রমাণ হচ্ছে যে আমিই সে-রাত্রে সৌরেশকে পানীয় জলের সঙ্গে বিষ দিয়ে হত্যা করেছি ?

ক্ষমা করবেন, আমি ঠিক তা বলিনি। আমি শুধু জানতে চেয়েছি সে-সময় কলকাতায় উপস্থিত থেকেও বন্ধুর জন্মতিথি উৎসবে যোগ দেননি কেন সে-রাত্রে ? অর্থাৎ কোথায় আপনি ছিলেন বা কি আপনার এমন জরুরী কাজ ছিল যাতে করে—আশা করি আমার বক্তব্য আপনি বুঝতে পেরেছেন ?

আমার বিশেষ একটা কাজ ছিল টালিগঞ্জে।

আহা, তাই তো জিজ্ঞাসা করছি কি এমন জরুরী কাজ আপনার ছিল যার জন্যে—

আমার ব্যক্তিগত কাজের জন্যে কোথায় কখন গিয়েছি না-গিয়েছি তারও সকল তথ্য ও জবাবদিহি আপনার কাছে দিতে নিশ্চয়ই আমি বাধ্য নই, মিঃ রায় !

তাহলে ঐটাই আপনার স্থির সিদ্ধান্ত ?

হ্যাঁ।

কিরীটী কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলে, তারপর আবার সম্মুখে দণ্ডায়মান সৌমিত্রের দিকে তাকিয়ে বললে, ঐ বাঁদরের মূর্তিগুলো একবার গুনে দেখুন তো সৌমিত্রবাবু ?

কিরীটী কথায় সৌমিত্র বইয়ের আলমারিটার দিকে তাকাল।

কিরীটী স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করে, একটা রীতিমত বিস্ময় ও বিব্রত ভাব যেন সৌমিত্রর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে।

কি, আর একখানি মানে চারটি মূর্তি চুরি গিয়েছে, না ? পূর্বাপূর্বের মত তাহলে কি এই সত্যটাই আমায় মেনে নিতে হবে—

কিরীটীর মুখের কথা শেষ হয় না, একটা আর্ত অস্ফুট শব্দ নির্গত হয় সৌমিত্রের কণ্ঠ থেকে কতকটা বুঝি তার নিজের অজ্ঞাতেই।

পূর্বের তিনবারের মত এবারে চতুর্থ মূর্তিটি অপসারণের সঙ্গে যদি সত্যি-সত্যিই হত্যার যোগাযোগ থাকে এবং যেটা থাকাই খুব বেশী সম্ভব, তাহলে ধরে নিতে পারি অনায়াসেই যে, এতক্ষণে বোধ হয় আপনাদের মধ্যে আরও একজন তীব্র কালকূট পান করে মৃত্যুর পরপারে চলে গিয়েছেন।

না—না—না। আবার আর্ত কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে সৌমিত্র।

কিন্তু কে বলুন তো? এবারে কাকে বিষ পরিবেশন করা হল? হিরণ্ময়, অনিলবাবু, বিনয়বাবু, ভবানীবাবু, ডাঃ অজিতা দেবী, কমলা দেবী, না মালবিকা দেবী - কাকে? এবারে কে victim হলেন?

আমি জানি না—আমি জানি না। দু'হাতে মুখ ঢাকলে সৌমিত্র, বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, আমি জানি না। সত্যিই আমি কিছু জানি না।

সত্যি বলছেন আপনি কিছু জানেন না সৌমিত্রবাবু?

না—না—না। সত্যিই আমি কিছু জানি না - আমি জানি না।

না-ই যদি জানেন তবে কেন এসেছেন এ-সময় এই ক্লাবঘরে? সত্যি জানেন না বলেই জানতে কি? সহসা কিরীটীর কণ্ঠ যেন বজ্রের মতই কঠিন হয়ে ওঠে, বলুন, জবাব দিন?

বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করুন কিরীটীবাবু কিছুই ও সম্পর্কে আমি জানি না—কিছুই আমিই জানি না।

আপনি একটু আগে এ-ঘরে এসেছিলেন সত্য কিনা বলুন?

আমি এ-ঘরে এসেছিলাম! বিস্মিত কণ্ঠে সৌমিত্র বলে ওঠে।

হ্যাঁ, এসেছিলেন। আপনার জামাকাপড় আমি সার্চ করতে চাই।

এগিয়ে এল কিরীটী সৌমিত্রের অতি সন্নিকটে। বোবা দৃষ্টিতে স্থাণুর মতই দাঁড়িয়ে থাকে সৌমিত্র।

কিরীটী ওর জামাকাপড় অনুসন্ধান করে বলে, না, নেই। আপনার সঙ্গে আর কে ছিল বলুন?

এবারে সত্যি-সত্যিই যেন চমকে ওঠে সৌমিত্র।

কিরীটীর তীক্ষ্ণ, সজাগ দৃষ্টিকে কিন্তু সৌমিত্র ফাঁকি দিতে পারে না।

বলুন, চুপ করে রইলেন কেন? সঙ্গে আপনার, একটু আগে যখন এ-ঘরে এসেছিলেন আর কে ছিল?

আমি—মানে—

বৃথা লুকোবার চেষ্টা করবেন না সৌমিত্রবাবু। বলুন। আর কে আপনার সঙ্গে ছিল?

কেউ না, কেউ না—আমি একা, একাই এসেছি।

বাঘের মতই গর্জন করে ওঠে কিরীটী কঠিন কণ্ঠে, মিথ্যা কথা! আপনি একা ছিলেন না। বলতে বলতে কিরীটী ঘরের মেঝের উপর থেকে একটা ছোট কালো রঙের বড় বেকালাইটের বোতাম কুড়িয়ে নিয়ে সৌমিত্রের চোখের সামনে তুলে ধরলে, এই ছোট বোতামটিই তার প্রমাণ! বলুন, কে এসেছিল

আপনার সঙ্গে রেইন্ কোট বা বর্ষাতি গায়ে দিয়ে ? না কোটটা আপনার গায়ে ছিল, কোথাও খুলে রেখে এলেন এইমাত্র ?

সহসা আবার সৌমিত্র চিৎকার করে ওঠে, কিরীটীবাবু, বিশ্বাস করুন আমাকে—বিশ্বাস করুন। সত্যি-সত্যিই আমি কিছু জানি না। সত্যিই কিছু আমি জানি না—

ভেঙে পড়ল সৌমিত্র।

* * *

সত্যি—সত্যিই আমি কিছু জানি না।

কল্পপুরী স্টুডিও থেকে ফিরে কমলা তার নিজের কক্ষে অন্ধকারে একটা আরাম-কেদারার ওপরে গা-টা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে পড়ে ছিল। ক্লান্ত, অবসন্ন, দু'চোখের পাতায় বোধ হয় তন্দ্রা নেমে এসেছিল।

সহসা কমলা আপন মনেই তন্দ্রার ঘোরে অস্ফুট কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, সত্যি—সত্যিই আমি কিছু জানি না।

তন্দ্রাটা ভেঙে গেল নিজের কণ্ঠনির্গত অস্ফুট চিৎকারে।

অন্ধকার কক্ষ। তৃষ্ণায় কণ্ঠতালু শুকিয়ে গিয়েছে। উঠে দাঁড়াল কমলা।

ঘরের কোণে ছোট টুলের উপরে সোরাইয়ে জল থাকে। গ্লাসে জল ঢালতে গিয়ে দেখলে সোরাই শূন্য। দরজা দিয়ে বের হল কমলা। সামনেই টানা বারান্দা। ওর কক্ষের দুটি কক্ষের পরে অর্থাৎ চতুর্থ কক্ষের মধ্যে ওর দাদা অতুল্য ও বৌদি বিনতা থাকে।

ছিন্ন মেঘান্তরাল থেকে বাঁকা চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। বর্ষণক্লান্ত মেঘলা আকাশ থেকে সেই ক্ষীণ চন্দ্রালোক বারান্দায় অপূর্ব একটি আলোছায়ার মায়া যেন রচনা করে তুলেছে।

কমলা এগিয়ে চলল স্টোর-রুমের দিকে। দাদার ঘরের বন্ধ জানলার খড়-খড়ির ফাঁকে মৃদু নীলাভ কোমল একটা আলোর দ্যুতি প্রকাশ পাচ্ছে।

সহসা সুমিষ্ট মেয়েলি হাসির একটা শব্দ কানে এল কমলার।

বৌদি বিনতা হাসছে।

ওরা বোধহয় এখনও জেগে—স্বামী-স্ত্রী।

যাও! যত বুড়ো হচ্ছ তত যেন তোমার রঙ্গ বাড়ছে। বিনতার মিষ্টি কৌতুকভরা প্রতিবাদ।

নিজের অজ্ঞাতেই স্তব্ধ অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে গেল কমলা।

হেন বাক্য উচ্চারণ করো না—করো না দেবী! সর্বদেহে আজও আমার যৌবন সদম্ভে তার গৌরব ঘোষণা করছে। চিরযৌবন আমার সাথী। আমি সখি, সখা চিরবসন্তের!

আবার মিষ্টি কৌতুকঝরা হাসির ঝরণা যেন উপচে উঠল বিনতার মিষ্টি কণ্ঠে।

সেই গানটা গাও না বিনু—

এই মাঝরাত্রে গান ! সত্যি-সত্যিই তুমি ক্ষেপে গেলে নাকি ?

না না, লক্ষ্মীটি। গাও না সেই গানটি—

মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী
সখি জাগো !

ছিঃ ছিঃ, কমলী তার ঘরে আছে—শুনতে পাবে যে !

শোনে শুনুক। তোমাকে গাইতেই হবে। গাও লক্ষ্মীটি। গাও।

না, ছিঃ !

বেশ, না গাইলে ! অতুল্যর কণ্ঠে অভিমান।

কি ছেলেমানুষ বল তো তুমি ! খুব আস্তে আস্তে গাইব কিন্তু।

বিনতা গেয়ে ওঠে ঃ

মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী
সখি জাগো !
মেলি রাগ অলস আঁখি
সখি জাগো !

জলপান আর করা হল না, মাতালের মতই টলতে টলতে নিজের অন্ধকার কক্ষে ফিরে এল কমলা। যৌবন নিকুঞ্জে পাখী কি সত্যিই আর গান গাইবে না ! বুকের মধ্যে এ কি মরুতৃষ্ণা !

এগিয়ে গিয়ে ঘরের সমস্ত জানলাগুলো খুলে দিল কমলা।

বাতাস—একটু বাতাস !

একুশ

একটু বাতাস ! উঃ, কি অসহ্য গুমোট !

শয্যার ওপর উঠে বসল মালবিকা।

অন্ধকার কক্ষ।

চোখে কিছুতেই ঘুম আসে না। চোখ-মুখ যেন জ্বালা করছে, মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে।

ঘরের নীল আলোটা জ্বালিয়ে দিল মালবিকা। ড্রেসিং টেবিলের মসৃণ আরশির কাচের ওপর সম্পূর্ণ নিজের ছায়াটা প্রতিফলিত হল।

রুক্ষ এলোমেলো চুলের রাশ, একটা বিপর্যয়ের চিহ্ন যেন চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে। পায়ে পায়ে মালবিকা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে রক্ষিত টুলটার ওপরে এসে উপবেশন করল।

ঐ তো সামনে আরশির বক্ষে প্রতিফলিত ওর নিজের ছায়া !

সেদিনও লক্ষ্য করেছিল ওর নিজের দেহে ভাঙন ধরেছে, ক্ষয়িষ্ণু যৌবন প্রান্তসীমায় পেঁছে এঁকে দিয়েছে তার দেহের ওপরে যেন 'শেষ বিদায়ের লিখনটুকু।

চলে গিয়েছে! দেহ-দেউলের কষ্টিপাথরে আজ রিক্ত ও ব্যর্থ জীবনের গতপ্রায় বসন্তের শেষ ও চরম সত্যটুকু পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, নির্মম কঠোর হয়েই যেন প্রকাশ পাচ্ছে।

আজও দেহের প্রান্তে যৌবনের বাকি উদ্বৃত্ত যেটুকু পড়ে আছে, তা নিয়ে আর যাই চলুক ঘর বাঁধা চলবে না।

আরশির মসৃণ কাঁচ স্পষ্টই বলছে, তোর দেহের শ্রেষ্ঠ সম্ভার, শ্রেষ্ঠ গৌরব থেকে তুই আজ চিরজন্মের মত বঞ্চিতা হয়েছিস মালবিকা।

আজও হয়তো তোর জীবনে ফল ধরতে পারে কিন্তু বসন্তের যে ফুলসম্ভার, প্রাচুর্য, সে তো আর কোনদিনই জীবনে তোর দেখা দেবে না।

মালবিকার দু'চোখের তারায় তারায় যেন অতৃপ্ত, অসহ্য কামনার বহ্নিশিখা জেগে ওঠে।

মনে পড়ে সৌমিত্র, শিশির, সৌরেশ আর অনিলকে।

হিরণ্ময় দিয়েছে নীরব প্রত্যাখ্যান (?)—হ্যাঁ, প্রত্যাখ্যান বৈকি। ইদানীং হিরণ্ময়ের হিমশীতল উপেক্ষা, কঠিন উদাসীনতা, নির্মম অনাসক্তি মালবিকা কি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারেনি!

হ্যাঁ, পেরেছে বৈকি।

অনিল—অনিল ঠিক হিরণ্ময়ের মত না হলেও, ফিরেও তাকায় না আজকাল আর ওর দিকে।

শিশির তো ইদানীং কথায়-বার্তায়, ঠারে-ঠারে সুস্পষ্ট ব্যঙ্গই করত।

একমাত্র শেষ আশা সৌমিত্র। চরম নিষ্ঠুর আঘাত হেনেছে সেই সৌমিত্রও।

সৌমিত্র!

উঠে গিয়ে আলমারির ড্রয়ার থেকে ভেলভেটের একটা বাক্স খুলে সৌমিত্রর চিঠিখানা বের করে চোখের সামনে মেলে ধরল মালবিকা।

তোমাকে ভালবেসেছিলাম অন্তর দিয়ে, কিন্তু প্রতিদানে কিছুই পেলাম না তোমার কাছ থেকে। কত গল্পে, কাহিনীতে পড়েছি এবং মানুষের জীবনে দেখেছি ও শুনেছি, নারী কোমলা, প্রেমময়ী—কিন্তু তুমি, রক্ত-মাংসের শরীরে নারী হলেও অন্তরে নিশ্চয়ই সে শ্রেণীভুক্তা নও···

না—না—না। আমি তাই গো—আমি তাই। আমিও নারী। আমারও দেহের মধ্যে নারীর চিরন্তন ক্ষুধা, প্রেম, ভালবাসা সেদিনও ছিল, আজও আছে।

আমার বাইরের অভিনয়টাই তুমি দেখেছিলে সৌমিত্র, অন্তরের সত্যটা জানতে পারলে না কেন? কেন—কেন জোর করে আমায় অধিকার করলে না, আমার দম্ভের সকল অভিনয়টুকু মাটিতে লুটিয়ে দিলে না?

রূপ আমার ছিল না, ছিল না আমার স্বাভাবিক নারীর দেহসৌন্দর্য।

নারীর যে দেহ পুরুষকে ভোলায়, মাতাল করে তোলে, সেই সম্পদটুকুই

যে আমার ছিল না ; তাই তো বার বার প্রত্যেককে তোমাদের ভয়ে সঙ্কোচে আমি প্রত্যাখ্যান করেছি, এড়িয়ে গিয়েছি। তাই তো করেছি অভিনয়। আমার অভিনয়টাই তোমরা কেবল দেখলে, অন্তরের সংবাদটা নিলে না !

মালবিকার দু'চোখের তারায় আগুন, তবু সেই আগুনকে ছাপিয়েই ঝরতে থাকে বেদনার অশ্রুধারা।

সমস্ত অন্তরাত্মা যেন অসহায় বেদনার্ত করুণ কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, না—না—তা হবে না। হতে আমি দেব না। আমার ব্যর্থতার চরম দৈন্য নিয়ে তোমরা মুখ টিপে টিপে হাসবে, তিলে তিলে আমার নারীদেহের সকল অতৃপ্ত কামনা, নারীমনের চরম ক্ষুধা নিঃশেষে ব্যর্থ হয়ে যাবে এ আমি হতে দেব না। না—না—

হ্যাঁ, প্রতিশোধ—আমি প্রতিশোধ নেব।

এ উপেক্ষার—এ অপমানের জ্বালা মালবিকা ভুলতে পারবে না। না।

ক্ষুধিতা বাঘিনীর মতই টুলটা ছেড়ে উঠে পড়ে মালবিকা। সৌমিত্রের পত্রখানা মুঠোর মধ্যে দলামোচা করে পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের কোণে।

ঢং ঢং করে দেওয়াল-ঘড়িটা রাত্রি বারোটা ঘোষণা করল।

চমকে ওঠে মালবিকা।

না, আর দেরি করা চলবে না।

আজ রাত্রেই—

তাড়াতাড়ি কোনমতে মালবিকা শাড়িটা গুছিয়ে পরে, মাথার চুলটা আঁচড়িয়ে, চপ্পলটা এঁটে নিল। কক্ষের দরজা খুলে মালবিকা যখন বারান্দায় এসে দাঁড়াল, মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা চারিদিকে যেন ভারী হয়ে বসেছে।

হোস্টেলের কেউ কোথাও জেগে নেই। নিশ্চিন্ত ঘুমে সকলেই আচ্ছন্ন।

মালবিকা আর দেরি করে না, সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে নিঃশব্দে সদর দরজাটা খুলে একেবারে অন্ধকার নির্জন রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়াল। জনপ্রাণীহীন রাস্তাটায় যতদূর দৃষ্টি চলে কেউ কোথায়ও নেই।

কেবল রাস্তার দু'পাশে গ্যাসের বাতিগুলো জ্বলছে একচক্ষু মেলে যেন।

চারিদিকে একটা অসহ্য গুমোট ভাব।

মাথার উপরে রাত্রির আকাশ জুড়ে ছিন্ন মেঘের দল ইতস্তত সঞ্চরণশীল। হয়তো আবার বৃষ্টি নামতে পারে।

হনহন করে হেঁটে চলল মালবিকা।

আজ রাত্রে—হ্যাঁ, আজ রাত্রেই—

এ জীবনের শেষ মীমাংসা তাকে করতেই হবে।

অনেক—অনেক ভুল করেছে সে, আর নয়—আর ভুল নয়।

সে-রাত্রে হিরণ্ময়ের চোখেও ঘুম ছিল না।

বাড়িতে ফিরে আসবার পর সৌমিত্র তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা

তার নির্দিষ্ট ঘরে চলে গেল, হিরণ্ময়ও এসে ঢুকল তার শয়নকক্ষে। কারও সঙ্গে বাক্যালাপ করতেও যেন মনে এতটুকু ইচ্ছা নেই।

ভৃত্য এসে জিজ্ঞাসা করল, আজ কি রান্না হবে বাবু. ঠাকুর জিজ্ঞাসা করছে!

আমার আজ খিদে নেই নারাণ, সৌমিত্রকে জিজ্ঞাসা কর।

তিনি তো একটু আগে আমায় ডেকে বললেন যে, আজ রাত্রে আর কিছু খাবেন না।

ও, তাহলে তোমরা নিজেদের মত যা রাঁধবার রেঁধে নাও গে।

নারাণ চলে গেল।

মাথার মধ্যে কত চিন্তাই না ঘুরপাক খেয়ে ফিরছে।

বিবাহ করেনি হিরণ্ময়, সংসারে একা মানুষ।

আত্মীয় বলতেও সংসারে এমন কেউ নেই যার জন্যে তাকে মাথা ঘামাতে হবে, চিন্তা করতে হবে। সংসারে সে সত্যই একা। বন্ধনকে কোন দিনই সাধ করে টেনে নেয়নি জীবনে।

বৎসর কয়েক আগে প্রথম যৌবন চোখে রঙীন নেশা ধরেছিল একবার মালবিকার সাহচর্যে। বুঝতে পারেনি নিজেকে সেদিন হিরণ্ময়, কিন্তু ভাগ্যই তাকে রক্ষা করেছে—মালবিকা নিজ থেকেই তার নীরবতা দিয়ে অস্বীকার জানিয়ে।

লজ্জা তার হয়েছিল সেদিন সত্য, কিন্তু তার চাইতেও স্বস্তি সে বেশী পেয়েছিল পরে স্থিরমস্তিষ্কে যখন আগাগোড়া ব্যাপারটা সে ভেবেছিল।

প্রফেসারী করে ও ভাল মাইনেই পায়। বরং যা পায় একা তার পক্ষে সচ্ছলই বলতে হবে। অবসর-সময়টুকু লেখাপড়া, 'নন্‌সেন্স ক্লাব' ও বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে আনন্দের মধ্যেই এতকাল কেটে যাচ্ছিল। বাকী জীবনটাও এভাবেই কাটিয়ে দেবে এই আশা ছিল।

এমন বন্ধুভাগ্য জীবনে ক'জনারই বা হয়! অনিল, শিশির, সুজিত, সৌরেশ, সৌমিত্র, বিনয়, ভবানী!

সহসা এ কি কালো ঝড় জাগল আকাশে! সুখের নীড়ে আগুন জ্বলল!

নেই—সৌরেশ, শিশির ও সুজিত তিনজন আজ আর নেই।

আলোটা নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে শয্যার ওপরে শুয়ে পড়ল হিরণ্ময়। বোজা চোখের পাতায় অন্ধকার দৃষ্টিপথে ভেসে ওঠে সৌরেশ, শিশির আর সুজিতের মুখ।

কেন এমন হল? মনে মনে যেন নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে, কে আমরা ওদের—তিন বন্ধুকে হত্যা করলাম?

সত্যিই কি আমরাই কেউ তিনটি বন্ধুকে আমাদের হত্যা করেছি?

ক্লান্ত-অবসন্ন হিরণ্ময় একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সহসা ঘুমটা ভেঙে যায়, বন্ধ দরজায় কার যেন মৃদু করাঘাতে।

কে?

ধরফড় করে শয্যার ওপরে উঠে বসে হিরণ্ময়। চিরদিনই ওর বড় পাতলা ঘুম, সামান্য শব্দেও ঘুম ভেঙে যায়।

আবার মৃদু করাঘাত।

কে?

কিন্তু কোন সাড়া নেই।

হিরণ্ময় অন্ধকারেই শয্যা থেকে উঠে প্রথমেই সুইচ টিপে আলোটা জেবলে দিল। বাইরে আবার বৃষ্টি নেমেছে, সোঁ সোঁ করে ক্ষ্যাপা হাওয়া বইছে।

টেবিলের ওপরে টাইম-পিসটা টক্‌টক্‌ করে শব্দ জাগিয়ে চলেছে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, রাত তিনটে বাজে।

হিরণ্ময় এগিয়ে গিয়ে দরজাটা অর্গলমুক্ত করে সামনে দৃষ্টিপাত করতেই চমকে যেন দু'পা পিছিয়ে এল। বিস্মিত কণ্ঠ থেকে অর্ধস্ফুট একটা শব্দ বের হয়ে এল, এ কি! তুমি, এত রাত্রে?

হ্যাঁ, আমিই। আমিই এসেছি হিরন্ময়।

কিন্তু—

নিশ্চয়ই তুমি ভোলনি হিরণ্ময়, একদিন তুমি আমাকে ডেকেছিলে। ও কি, অমন করে চেয়ে আছ কেন? আমাকে কি চিনতে পারছ না? আমি—আমি মালবিকা!

হিরণ্ময় ততক্ষণে তার মুহ্যমান ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। মালবিকার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল। বৃষ্টির জলে সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছে, পরিধেয় শাড়িটা ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে।

হাওয়ায় মাথার সমস্ত চুল এলোমেলো হয়ে গিয়েছে, বিস্রস্ত কুন্তলে বৃষ্টির জলের চূর্ণগুলি ঘরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় চিকচিক করছে। মালবিকার চোখ দুটো যেন ধারাল ইস্পাতের ফলার মত ঝক্‌ঝক্‌ করে জ্বলছে।

উত্তেজনায় আবেগে সমগ্র মুখখানি যেন রাঙা থমথম করছে।

ইস্‌, তোমার সর্বাঙ্গ যে ভিজে গিয়েছে মালবিকা! আমার ঘরে তো শাড়ি নেই—দাঁড়াও একটা ধুতি দিই, কাপড়টা বদলে ফেল।

হিরণ্ময় আলমারির দিকে অগ্রসর হতেই মালবিকা বাধা দিয়ে ওঠে, ব্যস্ত হয়ো না হিরণ্ময়।

না না, এমনি করে ভিজেছ—অসুখ করবে যে!

না, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

কিন্তু মালবিকা—

শোন হিরণ্ময়, তুমি আমার কাছে একদিন যা চেয়েছিল তাই আজ তোমায়

আমি দিতে এসেছি।

মালবিকার কণ্ঠস্বর যেন ভেঙে পড়ে।

বস মালবিকা। ঐ চেয়ারটার ওপরে বস। তোমাকে বড্ড পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে।

এতক্ষণ কোনমতে উত্তেজনার আবেগে মালবিকা নিজেকে যেন সোজা করে রেখেছিল, আর পারলে না—ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল সে, তুমি—তুমিও কি শেষ পর্যন্ত আজ আমাকে প্রত্যাখ্যানই করবে হিরণ্ময়! তোমারও সেদিনের স্বপ্ন কি ভেঙে গিয়েছে! আজ আর কোন প্রয়োজনই কি নেই আমাকে তোমার! কিছুই—কিছুই কি সত্যি আজ আর আমার কাছে তোমার চাইবার মত নেই! চেয়ে দেখ—চেয়ে দেখ হিরণ্ময়, আমি—আমি তো সেই মালবিকাই আছি!

মালবিকা—মালবিকা শান্ত হও, স্থির হও।

না, না—আমার প্রশ্নের জবাব দাও। সৌরেশ, তুমি, শিশির, সৌমিত্র—তোমরা সকলেই তো একদিন আমায় চেয়েছিলে। তবে কি তোমাদের সেদিনকার সে চাওয়া মিথ্যা? ক্ষণিকের মোহ মাত্র? ক্ষণিকের এই দেহটার জন্যে একটা আসক্তি মাত্র? বল, বল—জবাব দাও? কেন চুপ করে আছ?

মালবিকা, শোন, উত্তেজিত হয়ো না—আমার কথা শোন।

শুনব? কি শুনব? তোমাদের সেটা মোহ? তোমরা সত্যি করে কোনদিন আমায় চাওনি, এই তো? এই তো বলবে? বলতে বলতে সহসা মালবিকা ক্রুদ্ধা নাগিনীর মতই হিলহিল করে ওঠে, পুরুষ বলেই কি তোমাদের এত দম্ভ এত অহংকার?

মালবিকা!

হ্যাঁ, সৌরেশ, শিশির, সুজিত, তাদের সমস্ত অহংকারই আজ ধুলোয় লুটিয়ে গিয়েছে। তোমার সৌমিত্র আর অনিল—তোমাদেরও যাবে। কিন্তু কি আছে কমলার? রূপ? এই তো! বাইরের রূপটাতেই তোমাদের চোখ ঝলসে গেল?

মালবিকা—মালবিকা, এ সব কি তুমি বলছ? চিৎকার করে ওঠে হিরণ্ময়।

তোমরা সকলেই জান আমি কি বলছি। কিন্তু রূপটাই শুধু দেখেছ তোমরা, আগুন দেখনি। এবারে তাই দেখবে—তাই দেখবে—তাই দেখবে। বলতে বলতে একপ্রকার ঝড়ের মতই যেন মালবিকা ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মালবিকা, শোন—শোন, দাঁড়াও। চিৎকার করতে করতে ছুটে মালবিকার পিছনে পিছনেই ঘর থেকে বাইরে আসে হিরণ্ময়।

কিন্তু কোথায় মালবিকা?

সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে ততক্ষণে খোলা দ্বার পথে বৃষ্টিঝরা অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে মালবিকা।

অন্ধকার। নিশ্ছিদ্র জমাট-বাঁধা কালির মতো কালো ঘন অন্ধকার।

টিপটিপ করে ঝরছে বৃষ্টি আর বইছে এলোমেলো অবিশ্রাম সোঁ সোঁ ক্ষ্যাপা হাওয়া। কি গর্জন তার! হাজার সাপ যেন শিস্ দিয়ে দিয়ে ফিরছে অন্ধকারে প্রকৃতি জুড়ে।

হঠাৎ হিরণ্ময়ের খেয়াল হল ভৃত্য নারায়ণের ডাকে, দিদিমণি চলে গেলেন বুঝি বাবু?

হ্যাঁ, দরজাটা বন্ধ করে দে।

সৌমিত্রবাবু তো এখনও ফিরলেন না বাবু। দিদিমণি কড়া নাড়তে আমি ভেবেছিলাম সৌমিত্রবাবুই বুঝি ফিরে এলেন!

চমকে নারায়ণের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে হিরণ্ময়, সৌমিত্র বাইরে গিয়েছে নাকি?

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ – তা প্রায় দু-তিন ঘণ্টা হবে। আমাকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে বলে চলে গেলেন।

ও!

হিরণ্ময় বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

হাওয়ার ক্রুদ্ধ সোঁ সোঁ গর্জন একটানা রাত্রির অন্ধকারকে যেন দীর্ণ করে চলেছে। সাঁ সাঁ করে চাবুকের পর চাবুক হেনে চলেছে যেন কারা ক্রুদ্ধ আক্রোশে।

দরজাটা বন্ধ করে দেব বাবু?

অ্যাঁ! হ্যাঁ, দে।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ক্ষ্যাপা হাওয়ার এখনও বিরাম নেই, তেমনি একটানা এলোমেলো বয়ে চলেছে সোঁ-সোঁ। সমস্ত আকাশটা লাল মেঘে যেন ছেয়ে আছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক। বৃষ্টিও হচ্ছে।

অনেক রাত্রে কিরীটী শয্যায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। সহসা ঘুম ভেঙে গেল টেলিফোনের ক্রিং-ক্রিং শব্দে।

আঃ, এত রাত্রে কে আবার ফোন করে!

একান্ত বিরক্তিভরে কিরীটী পাশ ফিরে শুল, কিন্তু ফোনের বিরাম নেই, একটানা বেজে চলছে তো চলছেই, ক্রিং ক্রিং ক্রিং···

আঃ!

হাত বাড়িয়ে কিরীটী ফোনটা তুলে নিল, হ্যালো?

কিরীটী রায়?

হ্যাঁ, কে – কে আপনি?

কে আমি!

হ্যাঁ, কে আপনি? কি চান?

বিশেষ কিছুই নয়। শোনেননি বোধ হয় অনিল চৌধুরী—শিল্পী অনিল

চৌধুরী মারা গেছেন ?

অ্যাঁ ! অস্ফুট আর্তকণ্ঠে কিরীটী বলে ওঠে ।

হ্যাঁ, এবারও আপনার হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড !

সঙ্গে সঙ্গে ফোনে ওপাশ নীরব হয়ে গেল ।

হ্যালো ! হ্যালো ! শুনছেন ? শুনছেন ?

নাঃ, কোন সাড়া নেই ওপাশে ।

কিরীটী হতভম্বের মত শয্যার ওপরে কিছুক্ষণ বসে থেকে অবশেষে ফোনটা নামিয়ে রেখে দিল ।

মেঘলা আকাশেও ভোরের আলোর অস্পষ্ট ইঙ্গিত ।

বাইশ

বাতাস এখন থামেনি, সমস্ত আকাশ জুড়ে তীক্ষ্ন শিস্ দিয়ে দিয়ে যেন ফিরছে সাপের মত ।

আকাশ জুড়ে মেঘও এখনো তেমনি ছেদহীন, পিঙ্গলবর্ণ যেন এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত জমাট বেঁধে আছে । ক্ষ্যাপা এলোমেলো হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখনও থেকে থেকে পসলা পসলা বর্ষণ হচ্ছে ।

জলে ও কাদায় আকীর্ণ রাস্তাঘাট প্যাচ প্যাচ্ করছে, তার মধ্যেই যান-চলাচল ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে । রাস্তার ধারের প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়া গাছটা হাওয়ার ঝাপটায় যেন ওলট-পালট হচ্ছে ।

কানের মধ্যে এখনও বাজছে টেলিফোনের সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর ঃ অনিল চৌধুরী—শিল্পী অনিল চৌধুরী মারা গিয়েছে, এবারেও সেই হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষ ।

জংলী ধুমায়িত এক কাপ চা নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল ।

জংলী, হীরা সিংকে গাড়ি বের করতে বল্ !

এই ঝড়জলের মধ্যে কোথায় যাবেন বাবু ?

জরুরী কাজ আছে, যা ।

জংলী গজগজ করতে করতে হীরা সিংকে প্রভুর আদেশ জানাতে চলে গেল ।

হাত-মুখ ধুয়ে এক কাপ চা পান করে কিরীটী গাড়িতে চেপে অনিল চৌধুরীর গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করল ।

একবার ভাবলে রসা রোড থেকে তালুকদারকে তুলে নিয়ে যাবে, পরক্ষণেই মনে হল, আগে ব্যাপারটা গিয়ে নিজে দেখা যাক । তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই হবে ।

ঘটনা যদি সত্যই হয়, কে তাকে ফোন করে জানাল !

ফোনে সব সময় গলা চেনা মুশকিল. কিন্তু ফোন যে-ই করে থাক তাকে, কি উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে ফোন করলে ?

কেবল কি সংবাদটা জানিয়ে দেওয়াই যে অনিল চৌধুরী নিহত হয়েছেন বিষপ্রয়োগে ? না কিরীটীকে হত্যাকারীর সদম্ভ আহ্বান এটা ?

সারাটা রাত্রির বর্ষণ ও বৃষ্টিসিক্ত সমস্ত শহরটা যেন সকালের ঘন মেঘের অন্তরাল হতে বিচ্ছুরিত চাপা আলোয় অপূর্ব মনে হয়।

শহরের দোকানপাট কিছু কিছু খোলা হয়েছে বটে এবং যানবাহন, লোক-চলাচল শুরু হলেও সর্বত্র যেন একটা সংকোচ ভরা শিথিলতা।

গাড়িটা এসে অনিল চৌধুরীর বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

বড় রাস্তার উপরেই বাড়িটা। অনিলের বাড়ির সদর দরজাটা খোলাই আছে দেখা গেল এবং এও কিরীটী লক্ষ্য করলে, দরজার সামনেই ওর পূর্ব-পরিচিত অনিলের ভৃত্য বঙ্কিম ও নন্দু তো আছেই, আরও আছে বোধ হয় অনিলের রাঁধুনী বামুন ও সোফার। লোকগুলো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জটলা পাকাচ্ছে।

কিরীটীকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে বঙ্কিমই এগিয়ে এল, কারণ কিরীটীকে সে চিনতে পেরেছিল।

বাবু !

কি ব্যাপার বঙ্কিম ?

কিছুই বুঝতে পারছি না বাবু, আমাদের বোধ হয় সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।

কি হয়েছে ?

বাবু - বাবু তাঁর ছবি আঁকবার ঘরে মরে পড়ে আছেন—

হুঁ, কখন জানতে পারলে ?

আজ্ঞে সকালবেলা চা নিয়ে বাবুর শোবার ঘরে ঢুকে বাবুকে দিতে গিয়ে দেখি ঘরে কেউ নেই, ভাবলাম বোধ হয় বাবু বাথরুমে গিয়েছেন কিন্তু এক ঘণ্টা পরেও যখন আবার বাবুর দাড়ি কামাবার জন্যে জল নিয়ে গিয়ে বাবুকে দেখতে পেলাম না—, একটু থেমে বঙ্কিম আবার বললে, আমি খোঁজ করতে গিয়ে বাবুকে তাঁর ছবি আঁকবার ঘরের মধ্যে মরে পড়ে আছেন দেখি।

হ্যাঁ, তারপর ?

আমি তো বাবু হতভম্ব। প্রথমটায় বুঝতে পারিনি কি করব, শেষটায় ওদের সকলকে এসে খবর দিয়েছি।

আচ্ছা, তুমি আগে আমাকে বাবুর ছবি আঁকবার ঘরটা দেখিয়ে দেবে চল, তারপর—বলে কিরীটী পকেট থেকে নোট বইটা বের করে সেটা থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে খসখস করে কি তাতে লিখে কাগজটা বঙ্কিমের হাতে দিয়ে বললে, এই চিঠিটা নিয়ে এখানকার দারোগাবাবুর হাতে পৌঁছে দিয়ে এস। চট্‌পট্‌ যাবে আর আসবে, বুঝলে ?

আজ্ঞে।

এখন চল, আমাকে ঘরটা আগে দেখিয়ে দাও।

আগে বঙ্কিম, পশ্চাতে কিরীটী তাকে অনুসরণ করে অনিল চৌধুরীর

শয়নকক্ষে এসে প্রবেশ করল।

শয়নকক্ষের সংলগ্নই স্টুডিও-ঘরটা। ঘরের মধ্যে দুজনে প্রবেশ করল। ঘরের সমস্ত জানলাগুলোই উন্মুক্ত, হাঁ-হাঁ করছে। এক কোণে স্ট্যাণ্ডের উপরে ডোমাবৃত একটা সবুজ বাতি তখনও জ্বলছে।

মাঝারি গোছের ঘরখানি, ঘরের মেঝেতে বিস্তৃত দামী কার্পেট। ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় অনিল চৌধুরীর নিষ্প্রাণ দেহটা পড়ে আছে! পাশেই একটা জলশূন্য কাঁচের গ্লাস পড়ে আছে।

মৃতদেহের হাত-পা ঈষৎ বেঁকে গিয়েছে, হাতের পাতা মুষ্টিবদ্ধ, বিস্ফারিত চক্ষুতারকা, বন্ধ ওষ্ঠের পাশ দিয়ে লালামিশ্রিত ক্ষীণ একটা রক্তের ধারা কালো হয়ে জমাট বেঁধে আছে।

কিছুক্ষণ অপলকে ভূশায়িত অনিল চৌধুরীর নিষ্প্রাণ কঠিন দেহটার দিকে তাকিয়ে থেকে কিরীটী এগিয়ে গিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে দেহটা স্পর্শ করতেই, সর্বাঙ্গ বেয়ে যেন ওর একটা শিহরণ বয়ে গেল। হিমশীতল। বোঝা যায় মৃত্যু অনেকক্ষণ হয়েছে।

হাত-পা নেড়ে বুঝতে পারে রাইগার মর্টিস্ ইতিপূর্বেই মৃতদেহে তার আধিপত্য বিস্তার করেছে। হাত, পা, চোয়াল শক্ত, কঠিন।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস রোধ করে কিরীটী উঠে দাঁড়াল, আচ্ছা বঙ্কিম, তুমি তাহলে থানায় গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি খবরটা দিয়েই চলে এস, কেমন?

কিরীটী দেখলে, বঙ্কিমের চোখ দু'টো ছলছল করছে।

উপচীয়মান অশ্রুকে হাত দিয়ে মুছে নিয়ে বঙ্কিম বললে, যে আজ্ঞে—

হ্যাঁ দেখ, চাকর ঠাকুর ওদের বলে দিয়ে যেও দারোগাবাবু না আসা পর্যন্ত ওরা কোথাও না যায় কেউ, বাড়িতেই যেন সব থাকে। বুঝলে?

যে আজ্ঞে। তারপর একটু ইতস্তত করে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে ডাকলে, বাবু?

অ্যাঁ! কিরীটী চমকে ফিরে তাকাল, আমাকে কিছু বলছ?

আজ্ঞে সত্যি সত্যিই কি আমাদের বাবু আর বেঁচে নেই?

না।

কিরীটী আবার সমগ্র কক্ষটার চতুষ্পার্শ্বে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। দেওয়ালের গায়ে টাঙানো কত বিচিত্র সব ছবি—কোনটা ওয়াটার-কলার, কোনটা অয়েলপেণ্টিং, কোনটা ড্রাইব্রাশ, কোনটা পেন অ্যাণ্ড ইংক, কোনটা কেবলমাত্র পেনসিল-স্কেচ।

সহসা ওর দৃষ্টি দেওয়ালের গায়ে গিয়ে নিবদ্ধ হল একটা ক্যানভাসের ওপরে অঙ্কিত পোর্ট্রেট্-এর ওপর। কে যেন তীক্ষ্ণ কিছুর সাহায্যে হিংস্র আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে রেখেছে সেটা। দ্বিতীয় ক্যানভাসের উপরে অঙ্কিত পোর্ট্রেট্‌টিও ছিন্নভিন্ন না হলেও অক্ষত নয়, তৃতীয়টিরও প্রথমটির

অবস্থা, অর্ধসমাপ্ত চতুর্থ পোর্ট্রেট্‌টিরও একই অবস্থা, পঞ্চমটি অক্ষত, তবে ছবিটিও শেষ হয়নি—কিছু পেনসিলের আখর পড়েছে মাত্র. বোধ হয় সবে শুরু করা হয়েছিল ছবিটা, পরে পর পর ছটি রক্ষিত সাদা ক্যানভাস—শিল্পীর হাতের তখনও কোন আঁচড় পড়েনি।

স্তম্ভিত হয়ে কিরীটী কিছুক্ষণ ক্ষতবিক্ষত ক্যানভাসগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

নিষ্ঠুর হিংসায় নখরাঘাতে কে যেন উন্মাদের মতই ক্যানভাসগুলো ছিন্ন-ভিন্ন করে রেখে গিয়েছে।

আরও কাছে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই পায়ের জুতোয় কি যেন একটা লাগল, নিচু হয়ে তাকাতেই দেখলে, আগের দিন কল্পপুরী স্টুডিওতে যেমন খালি একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের ছিপিহীন শিশি কুড়িয়ে পেয়েছিল, ঠিক তেমনি একটি খালি শিশি।

আলগোছে পকেট থেকে রুমালটা বের করে মেঝের উপর থেকে শূন্য শিশিটা কুড়িয়ে নিল কিরীটী।

অবিকল সেই পূর্বের মতই শিশিটা। এবং শিশিটার গায়ে পূর্বের মতই একটা লেবেল লাগানো ঃ পালসেটিলা টু'হান্‌ড্রেড। এবারেও পালসেটিলা টু'হান্‌ড্রেডের শিশিতেই মৃত্যুবিষ হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড পরিবেষিত হয়েছে তা হলে!

সেই তীব্র হলাহল হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড এবং শূন্য কাঁচের শিশিটিই সাক্ষ্য দিচ্ছে এবারেও সেই তৃষ্ণার পানীয়ই বোধ হয় তো হয়েছিল বিষের বাহন!

সত্য, হত্যাকারীর বাহাদুরি ও কল্পনা আছে স্বীকার পেতেই হবে। পর পর চারবারই তীব্র হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষ। চার-চারবারই বাহন তার তৃষ্ণার পানীয়—দু'বার চা, দু'বার জল।

প্রতিবারেই নিহত হয়েছে অন্তরঙ্গ (?) বন্ধুদের মধ্যে একজন এবং হত্যা করেছে নিজেদের মধ্যেই একজন।

তবে প্রথম তিনবার হত্যাকারী অনেকের দৃষ্টির সামনে চরম দুঃসাহসিক-তার সঙ্গে, চিত্তের দৃঢ়তায়; এবং শেষবার বোধহয় মাত্র পরস্পরের উপস্থিতিতে।

স্থান নির্বাচনের মধ্যেও চমৎকারিত্ব আছে বলতে হবে বৈকি।

প্রথমবার জন্মতিথির উৎসবের মধ্যে, দ্বিতীয়বার হাজার লোকের চোখের সামনে উজ্জ্বল আলোকাকীর্ণ রঙ্গমঞ্চের উপরে, তৃতীয়বার কল্পপুরী স্টুডিওতে বহু চোখের সামনে, চতুর্থবার শিল্পীর স্টুডিওর মধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় অপহৃত বাঁদরের মূর্তিগুলোর কথা ও সেই সঙ্গে গতরাত্রে 'নন্‌সেন্স ক্লাব'-ঘর থেকে চতুর্থ-মূর্তিটি অপহৃত হওয়ার ব্যাপারটা।

আক্ষেপ হয় কিরীটীর, ইস্, একবারও কাল রাত্রে সকলের যদি সে খোঁজটা

নিত ! অন্ততঃ তার তো বোঝা উচিত ছিল, মূর্তির অপসারণ মানেই আর একজনের প্রাণহানি !

সৌমিত্রের কথা মনে পড়ল, সৌমিত্রের পকেটে বা জামাকাপড়ের মধ্যে কোথাও সে অপহৃত মূর্তিটি পায়নি। সৌমিত্র কেন অত রাত্রে ক্লাবঘরে গিয়েছিল তাও স্বীকার যায় নি সে শেষ পর্যন্ত।

সৌমিত্র তার বিনাঅনুমতিতে কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাবে না ঐ প্রতিশ্রুতিতেই গত রাত্রে কিরীটী সৌমিত্রকে ছেড়ে দিয়েছিল।

শয়নকক্ষ দিয়ে স্টুডিও-ঘরে প্রবেশ ছাড়া এ-ঘরে প্রবেশের আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই তা কিরীটী পূর্বেই বুঝতে পেরেছিল।

হত্যাকারী তাহলে শয়নকক্ষ দিয়েই এ-ঘরে এসে প্রবেশ করেছে সন্দেহ নেই তাতে বিন্দুমাত্রও।

নানা চিন্তা কিরীটীর মাথার মধ্যে ঘুরপাক দিয়ে ফিরতে থাকে।

চিন্তান্বিত কিরীটী আবার ছিন্নভিন্ন ক্যানভাসগুলোর সামনে এসে দাঁড়ায়। তীক্ষ্ন অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে বিনষ্ট ক্যানভাসগুলো।

পোর্ট্রেটগুলো যে কেবল ছিন্নভিন্নই করা হয়েছে তা নয়, প্রথমে লাল রং দিয়ে পোর্ট্রেটগুলো নষ্ট করা হয়েছে, তারপর তীক্ষ্ন ধারাল কোন কিছুর সাহায্যে ছেঁড়া হয়েছে।

সহসা একটা পোর্ট্রেটের ছিন্ন একটুকরো ঝুলন্ত ক্যানভাসের সঙ্গে একটা বস্তু জড়িয়ে থাকতে দেখে সেটা কিরীটী খুলে নিল সযতনে এবং এতক্ষণ পরে ওর চোখে মুখে যেন একটা চাপা উল্লাস দেখা দেয়।

অস্ফুট কণ্ঠে নিজে নিজেই বলে, পেয়েছি—পেয়েছি ! আমার অনুমান তাহলে ভুল হয়নি ! I am not wrong—I am not wrong !

বাইরে জুতোয় শব্দ শোনা গেল। মহেন্দ্র বিশ্বাস বোধহয় এলেন। সত্যি, নিকটবর্তী থানা-ইনচার্জ মহেন্দ্র বিশ্বাসই কক্ষের মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে এসে প্রবেশ করলেন।

মহেন্দ্র বিশ্বাস লোকটি বেশ চওড়া, পূর্ববঙ্গে যশোর জেলায় বাড়ি এবং গলাটা বেশ বাজখাঁই। বছর পাঁচেক যদিচ ক্যালকাটা পুলিসে কাজ করছেন, কিন্তু নিজের দেশ-স্থানের ভাষাটা এখনও ভুলতে পারেননি।

এই যে কিরীটীবাবু, বলি মশায় ব্যাপারডা কি কন-দি ? বলি কেডা আবার খুন হল ?

এই যে মহেন্দ্রবাবু, দেখুন ঐ যে সামনেই পড়ে আছেন বাড়ির মালিক স্বয়ং।

আরে সত্যি তো ! ব্যাপারটা কি কন-দি ? কেডা—খুন করল কেডা ?

মৃদু হেসে কিরীটী জবাব দিল, খুনী তো এখানে নেই, বলি কেমন করে

বলুন ?

তা তো বুঝলাম, কিন্তু আপ্‌নে ব্যাপারটা জানলেন ক্যাম্নায় ? আপনারে সংবাদ দেল কেডা ?

কিরীটী এবারে সংক্ষেপে আগাগোড়া সমগ্র ব্যাপারটা যথাসম্ভব মহেন্দ্রের গোচরীভূত করলে।

ওঃ, তাই কন। আঃ, কি ঝামেলা মশায় দেহেন দেহি ! প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করে উঠতি-না-উঠতি—নাঃ, শালার পুলিশের চাকরি আর করন যাইব না দেখ্‌তা আছি। আরে মশাই এই বাড়িতেই তো অল্প কিছুদিন আগে ওই ওনার এক বন্ধু খুন হয়েছিলেন, আপনি জানেন কি না ?

জানি।

জানেন। তা দেহেন দেহি কি ফ্যাসাদেই পরন গেল। সেই খুনেরই আজ পর্যন্ত কিনারা হয় নাই, এবার কত্তা হলেন খুন। ভদ্রলোক সুইসাইড্ করেন নাই তো ?

কি জানি, দেখুন ! কিরীটী ঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্যে উদ্যত হয়।

ও কি ! আপনে চললেন নাকি ?

হ্যাঁ, আমার বিশেষ কতকগুলো জরুরী কাজ আছে। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

আমারে প্রাতঃকালে ডাইকা আইনা এক ফ্যাসাদের মধ্যে ছাইড়া দিয়া চললেন ! বেশ আছেন মশাই !

ভয় নেই। একেবারে নিখোঁজ হচ্ছি না। আমার ফোন নাম্বার তো জানেন, দরকার হলে ফোন করলেই আমাকে পাবেন।

কিন্তু একডা শলা-পরামর্শ—

শলা-পরামর্শ কি আর নতুন করে দেব বলুন ? সেবারে খুনী আমাদের চোখে ধুলো নিক্ষেপ করে গেলেও এবারে কিছু চিহ্ন রেখে গিয়েছে।

চিহ্ন রাইখ্‌খা গেছে ! চিহ্নডা আবার কি বেটায় রাইখ্‌খা গেল ?

একটি খালি হোমিওপ্যাথির পালসেটিলা টু'হানড্রেডে লেবেলযুক্ত ছোট্ট শিশি ও একগাছি চুল ও সেই সঙ্গে ঐ যে চেয়ে দেখুন—ছিন্নভিন্ন তিনটি পোর্ট্রেট্ আর পোর্ট্রেট্‌টার উপরে লাল কালির দাগ। খুঁজে দেখুন না, হয়ত আরও কিছু চিহ্ন পেতে পারেন।

কিরীটীর মুখের দিকে ফ্যালক্যাল করে তাকিয়ে মহেন্দ্র বিশ্বাস একটা ঢোক গিলে বললেন, কেবল ছোট্ট একটি দু'অক্ষরের কথা, আইজ্ঞা—

হ্যাঁ, ঐ প্রমাণগুলোই যথেষ্ট হবে চার-চারটি নৃশংস খুনের হত্যাকারীকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেবার জন্যে। আচ্ছা, আমি তাহলে চলি মহেন্দ্রবাবু।

কিরীটী আবার যাবার জন্যে পা বাড়াল।

ও মশায়, শোনেন শোনেন ! একটা কথা বইলা যান দিকি, খুনী হারাম-

জাদাডারে তবে চেনছেন কন্ ? একটা ঢোক গিলে বলেন, মানে বোঝছেন—কোন্ হালায় খুন করছে ?

তা বুঝেছি বৈকি। প্রমাণ যখন হস্তগত !

অঃ তা হল কেডা কন-দি ?

কিরীটী আবার হেসে ফেলে, কেন ? শুনে কি করবেন ?

শোনব ক্যান ? কন কি ! বেটারে ধরবার লাগব না ? ধইরা আইনা জ্যালে না পোরলে হালায় ডুব মারব না ! তহন বেটার পাত্তা পাবেন ক্যামনে ? হালায় খুন করেছে যহন অ্যামনে ধরা দিব ভাবেন নাকি ?

পালাবে না, সে পালাবে না।

পালাবে না ? বড় বড় চক্ষু দুটি ছানাবড়ার মত করে তাকিয়ে থাকে মহেন্দ্র বিশ্বাস কিরীটীর মুখের দিকে।

না। আচ্ছা চলি।

কিরীটী ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

সিঁড়ির নিচে বঙ্কিমের সঙ্গে দেখা হতেই কিরীটী তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করে।

কাল রাত্রে তোমার বাবু কখন বাড়িতে ফিরে আসেন বঙ্কিম ?

রাত তখন গোটা-দশেক হবে বাবু।

শুতে যান কখন বল তো ?

কাল রাত্রে তো খাওয়া-দাওয়া করেননি, এসেই শোবার ঘরে গিয়ে ঢোকেন।

তুমি ঘুমাতে যাও কখন ?

আমার শুতে শুতে প্রায় রাত বারোটা হয়েছিল বাবু।

আচ্ছা, কাল রাত্রে তোমার বাবুর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল কি ?

হ্যাঁ, একজন নয়, দু'জন এসেছিলেন কাল রাত্রে।

দু'জন ?

হ্যাঁ বাবু, কালকের রাতটায় যে কি হল—রাত যখন একটা কি দেড়টা হবে, গায়ে বর্ষাকোট মাথায় বর্ষাটুপি চোখে কালো চশমা পাকানো গোঁফ এক ভদ্রলোক এসে বললেন, বাবুর সঙ্গে তাঁর বিশেষ প্রয়োজন, পুলিসের লোক, তক্ষুনি দেখা করতে চান !

কিরীটী অবাক হয়ে বঙ্কিমের কথা শুনতে থাকে, তারপর ?

তা আমি বাবু দরজা খুলে দিলাম, বাবু উপরে সোজা চলে গেলেন।

বাবুটি গেলেন কখন ?

তা প্রায় আধঘণ্টাটাক পরে। সেই বাবুটি চলে যাবার আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার পরেই এলেন মালবিকাদিদি—

কি—কি বললে !

আজ্ঞে মালবিকা দিদিমণি এলেন।

অত রাত্রে ?

আজ্ঞে। এসেই সোজা ওপরে চলে গেলেন।

ওঃ, তা কতক্ষণ ছিলেন তিনি ?

তা ঠিক বলতে পারব না বাবু, আমি দিদিমণিকে দরজা খুলে দিয়েই শুতে যাই। কখন যে তিনি চলে গেছেন জানি না। আজ সকালে উঠে দেখি দরজা হাঁ-হাঁ করছে খোলা। তারপর উপরে বাবুর চা নিয়ে গিয়ে দেখি—

আচ্ছা বঙ্কিম, আর একটা কথা, সেই পুলিসের লোক বাবুটি আসবার পর তুমি কোন গোলমাল বা চিৎকার শুনেছ ?

আজ্ঞে না। এত জোরে কাল রাতে বাতাস বইছিল যে কিছুই শুনতে পাইনি।

আচ্ছা সেই বাবুটিকে এর আগে কখনও দেখেছ বলে মনে হয় ?

আজ্ঞে না।

তেইশ

হিরণ্ময় কিরীটীর মুখে অনিলের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

অনিল! শেষ পর্যন্ত অনিলও হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডের দ্বারা নিহত হল!

সৌরেশ নিহত হয়েছে, শিশির নিহত হয়েছে, সুজিত নিহত হয়েছে, শেষে অনিলও নিহত হল!

সৌরেশ, শিশির, সুজিত ও অনিল চারজনেই আজ মৃত!

বিশ্বাসের অযোগ্য, তবু বিশ্বাস না করে উপায় নেই। কারণ সূর্যের আলোর মতই তা সত্য।

গতকাল রাত্রে দশটার পর যে বিদায় নিয়ে গেল, ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে সে আর নেই—মৃত্যু তাকেও ওদের মধ্য থেকে ছিনিয়ে নিল।

মুহ্যমানের মত অদূরে উপবিষ্ট কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে হিরণ্ময় প্রশ্ন করে, এবারে—এবারে কার পালা আমাদের মধ্যে কিরীটী ?

নাটক শেষ হয়ে গিয়েছে হিরণ্ময়, শেষ অঙ্ক কাল ঝড়ের রাতেই অভিনীত হয়ে গিয়েছে—এখন কেবল যবনিকা নামতে বাকি। তবু এ ধরনের মানসিক বিকৃতিতে বিশ্বাস নেই, তাই আমাদের খুব সাবধানে শেষ দৃশ্যের শেষটুকুর জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু তার আগে তোমাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটা কথা আমার জিজ্ঞাস্য আছে!

কিরীটীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে তাকায় হিরণ্ময়।

খুনী—হত্যাকারী যে কে আমি ধরতে পেরেছি বটে, কিন্তু হত্যার আসল

উদ্দেশ্যটা (motive) এখনও আমার চোখে সুস্পষ্টভাবে ধরা দেয়নি। তোমাদের 'নন্‌সেন্স ক্লাবে'র বানরের মূর্তিগুলোর সঙ্গে সত্যিই এই চার-চারটি নৃশংস হত্যার কোন যোগাযোগ আছে কিনা এবং থাকলেও সেটা কি, ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে অস্পষ্ট হয়েই আছে। একটু থেমে কিরীটী আবার বললে, অনিলবাবুর বাড়ি থেকে বের হয়ে তাই সর্বপ্রথম তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তোমার পর একে একে সৌমিত্রবাবুর সঙ্গে, তারপর ক্রমে ভবানীবাবু, বিনয়বাবু, মালবিকা দেবী, অজিতা দেবী ও কমলা দেবীর সঙ্গেও দেখা করব। আর একটা কথা, আগামী কাল সন্ধ্যায় আমরা সকলে তোমাদের 'নন্‌সেন্স ক্লাবে'র ঘরে মিলিত হব এবং এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের উপরে কাল সেখানেই যবনিকাপাত হবে। ঠিক রাত সাড়ে সাতটায় আমরা সেখানে সকলে গিয়ে মিলিত হব!

একটা কথা কিরীটী এবং এটা আমার তোমার কাছে বিনীত অনুরোধও, যদি সত্যিই তুমি ধরতে পেরে থাক আমাদের মধ্যে কে ঐ চারজন বন্ধুকে হত্যা করেছি—কেন তাকে তুমি ধরিয়ে দিচ্ছ না? কেন তার আসল রূপটা সকলের চোখের সামনের উদ্ঘাটিত করে দিচ্ছ না? এ নিদারুণ যন্ত্রণার শেষ করে দাও ভাই। মনের মধ্যে এই যে অহরহ বৃশ্চিক-দংশন এ আর সহ্য করতে পারছি না ভাই।

দু হাতের মধ্যে হিরণ্ময় মুখ ঢাকল।

তোমাদের সকলের মনের মধ্যে যে কি হচ্ছে সবই আমি বুঝতে পারছি ভাই, কিন্তু কি করবে বল—এ রহস্যের মীমাংসা করতে হলে তোমাদের আজকের রাত ও কালকের দিনটা অপেক্ষা করতেই হবে। শোন, অধীর হয়ো না, আমার একটা কথার জবাব দাও।

বল।

তোমাদের আটজন পুরুষ বন্ধুর মধ্যে মালবিকা, কমলা ও অজিতাকে নিয়ে কখনও কি প্রকাশ্যে বা অন্তরে কারও গোলযোগ ঘটেছিল কোন দিন?

এ কথা বলছ কেন কিরীটী?

একমাত্র তুমি ও মালবিকা তোমাদের পরস্পর বন্ধু ও বান্ধবীদের মধ্যে প্রেম-ঘটিত ব্যাপারের ইঙ্গিত দিয়েছ তোমাদের লিখিত জবানবন্দির মধ্যে। আর কেউই কোন কিছু ও-সম্পর্কে উচ্চবাচ্যও করেননি।

একটু চুপ করে থেকে হিরণ্ময় জবাব দিল, ও সম্পর্কে আমি তোমাকে কোন কথাই বলতে পারব না কিরীটী, কারণ সত্যিই আমি ও-সম্পর্কে কিছু জানি না।

আচ্ছা আর একটা কথা, কমলা দেবী তোমাদের ক্লাবের একজন সভ্যা না হলেও সভ্যার মতই পরিচয় ছিল তাঁর এবং অন্যান্য সভ্য ও সভ্যাদের মত তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগও ছিল তাঁর, তবে তাঁরও একটা প্রতীক মূর্তি ক্লাবঘরে রাখা ছিল না কেন?

প্রথমতঃ কমলা আমাদের ক্লাবের সঙ্গে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ হবার বছর দুই আগেই ঐ মূর্তিগুলো তৈরি করা হয়েছিল, দ্বিতীয়তঃ আমাদের ক্লাবের দশম বাৎসরিক অনুষ্ঠান হবার কথা ছিল এই সামনের দোলপূর্ণিমাতে এবং সেই উৎসবেই কমলাকে পাকাপোক্তভাবে ক্লাবের সদস্য করে নেওয়া হবে ও তার প্রতীক মূর্তিটা তৈরি করা হবে ঠিক হয়েছিল—

কমলা দেবীর সঙ্গে তো তোমাদের পরিচয়ও দু'বছরের মত, তবে এতদিন তাঁকে পাকাপোক্তভাবে সভ্যাশ্রেণীভুক্তা করে নাওনি কেন ?

কমলাই গা করেনি। মূর্তির ব্যাপারেও তার বিশেষ একটা অনিচ্ছাই বরং ছিল—

কি রকম ?

সে বলত, ডাঃ অজিতার যুক্তি মেনে নিতে সে নাকি ঠিক পারে না। বলেছিল আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা বানরের সমগোত্র ও সমশ্রেণী ছিলেন কথাটা মনে করে রাখবার মধ্যে আর যাই থাক না কেন, কোন গৌরব তো নেই—বরং আছে একটা বিকৃত মনোবৃত্তিরই পরিচয় ও দুর্বলতা। বরং আমি বলি ঐ কুৎসিত মূর্তিগুলো সরিয়ে ফেলে আমাদের প্রত্যেকের সত্যিকারের এক-একটা করে মিনিয়েচার মূর্তি আমাদের শিল্পী-বন্ধু অনিলই তৈরি করে দিক্। সে মূর্তিগুলোর থাকবে একটা আলাদা স্বাতন্ত্র্য, আভিজাত্য ও স্বীকৃতি। কিন্তু কমলার কথায় প্রতিবাদ তুলল সর্বপ্রথম মালবিকাই –

আশ্চর্য ! ডাঃ অজিতা রায় নয়—মালবিকা দেবীই আপত্তি জানালেন ?

হ্যাঁ, মালবিকা বললে, নতুন সভ্য কেউ যদি আমাদের মধ্যে আসতেই চান, তাঁকে আমাদের এতকালের সব কিছুকে প্রাণ দিয়ে স্বীকার করে নিয়েই আসতে হবে।

জবাবে কি বললেন কমলা দেবী ?

কোন একটা কিছুকে কিছুকাল ধরে স্বীকৃতি দেওয়ার মানে এই নয় যে, চিরদিনই তাকে স্বীকৃতি দিয়ে যেতে হবে ! নিত্য নব নব অভিনবত্বের প্রকাশের মধ্যে দিয়েই জীবনের অগ্রগতি ও পরিপূর্ণতাকে আমরা বুঝতে পারি, গুহাবাসী যুগের বানর যদি আজ মানুষের অভিনব পর্যায়ে এসে থাকে, তবে মূর্তিরও আজ পরিবর্তন হবে না কেন ? বর্তমান বাঁচবার রসদ গ্রহণ করবে ভবিষ্যতের গর্ভ থেকেই – অতীতের শিলালিপি থেকে নয়।

হুঁ, যুক্তিটা অকাট্য বলতেই হবে। প্রগতিশীলও তো বটেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছিল কি ?

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ব্যাপারটা তরল হাস্য-পরিহাসের মধ্যেই সৌরেশ ও বিনয় মীমাংসা করে দেয় এবং ঠিক হয় একাদশ বাঁদরের মূর্তিই তৈরি করা হবে, একাদশ সভ্যা কমলার প্রতীক হিসাবে।

আর একটা কথা হিরণ্ময়, মালবিকা অজিতা ও কমলার মধ্যে পরস্পরের সম্পর্কটা ঠিক কেমন ছিল ?

সহজ প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্কই ছিল বলে তো মনে হয়, অন্য রকম কিছু কই কখনও চোখে পড়েছে বা শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না।

আচ্ছা হিরণ্ময়, তাহলে একবার সৌমিত্রবাবুকে এ-ঘরে ডেকে দাও, তাঁর সঙ্গেও গোটাকতক কথা আছে—তিনি তো বাড়িতেই মানে তোমার এখানেই আছেন না?

হ্যাঁ। ডেকে দিচ্ছি।

সৌমিত্র ও কিরীটী।

গতরাত্রের মত তাহলে এখনও আপনি বদলাননি সৌমিত্রবাবু?

না, কোন কারণ তো হয়নি বদলাবার!

একটা কথার জবাব দেবেন সৌমিত্রবাবু?

বলুন!

এবারে কলকাতায় ঠিক কবে এসেছেন?

একটু ইতস্তত করে সৌমিত্র বললে, অনিলের জন্মতিথি উৎসবের আগের দিন দুপুরে পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতায় এসে পেঁছিই।

আপনি অনিলবাবুর জন্মতিথি উৎসবের কথা জানতেন?

হ্যাঁ, চিঠি দিয়ে বার বার আমাকে অনুরোধ জানিয়ে অনিল ঐদিন কলকাতায় এসে উৎসবে যোগ দিতে বলেছিল। কারণ ইতিপূর্বে তো কখনও আমি ঐ উৎসবে অনুপস্থিত থাকিনি।

পরে অনিলবাবুকে এ কদিনের মধ্যে আপনি কি বলেছিলেন যে, আপনি এখানে এসে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জন্মতিথি উৎসবে উপস্থিত কেন হননি বা হতে পারেননি?

না।

কেন?

কারণ ছিল।

কারণটা জানতে পারি কি?

ব্যক্তিগত।

অর্থাৎ কারণটা বলতে রাজী নন, এই তো?

যেমন মনে করেন।

আচ্ছা আর একটা কথা, মালবিকা, ডাঃ অজিতা রায় ও কমলা দেবীর সঙ্গে নিছক বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন প্রকার সম্পর্ক—মানে হৃদয় বা মনের দিক থেকে কোন ঘনিষ্ঠতা বা বলতে পারেন কোনরূপ দুর্বলতা ঘটেছে বা এসেছিল আপনার কি কোন দিন?

সৌমিত্র চুপ করে থাকে এবং তাকে চুপ করে থাকতে দেখে কিরীটী বললে, সৌমিত্রবাবু জানি প্রশ্নটা অত্যন্ত ডেলিকেট, কিন্তু আমার দিক থেকে ঐ প্রশ্নটির জবাবের এত বেশী প্রয়োজনীয়তা আছে যে একান্ত বাধ্য হয়েই

আমাকে—আশা করি আমার ডিফিকালটিস্ আপনি বুঝতে পারছেন।

একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও আপনার প্রশ্নের জবাবটা আমি দিচ্ছি মিঃ রায়। পাটনায় বদলি হয়ে যাবার কিছুকাল পূর্ব থেকেই দলের মধ্যে মালবিকা সম্পর্কে আমার একটা হৃদয়দৌর্বল্য দেখা দিয়েছিল—

দিয়েছিল কেন বলছেন, এখন কি আর নেই ?

না। সে মোহই বলুন বা হৃদয়দৌর্বল্যই বলুন, সেটা কিছুকাল আগেই আমার কেটে গিয়েছে।

হঠাৎ সেটা চলে যাওয়ার মানে ?

তা ঠিক আপনাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না, তবে বর্তমানে অনেক দিন থেকেই আমার সেটা আর নেই এইটুকুই আপনাকে আমি বলতে পারি। তার সম্পর্কে কিছুমাত্র আকর্ষণ বা মোহই আমার আজ আর অবশিষ্ট নেই। আর সে কথা তাকে এতদিন না জানাতে পারলেও কয়েকদিন হল জানিয়ে দিয়েছি।

জানিয়ে দিয়েছেন ?

হ্যাঁ। কারণ যে বস্তুর প্রয়োজন আজ সম্পূর্ণ ফুরিয়েই গিয়েছে, অতীতে একদা সেটা হৃদয়ের অনেকখানি স্থান জুড়ে থাকলেও—নিঃশেষে প্রয়োজনের শেষে হৃদয়ের বা মনের মধ্যে সেটাকে আঁকড়ে থাকাটাকে আমি এক ধরনের অমার্জনীয় অপরাধ বলেই মনেই করি।

খুব ভাল। তা মালবিকা দেবী—

সে আবার কি বলবে! সে তো কোনদিনই পূর্বের ব্যাপারটার মধ্যে এতটুকু গুরুত্বও দেয়নি। সে আমার কথা শুনে বললে, বেশ।

এ তো গেল মালবিকার কথা, আর কমলা দেবী ? তাঁর সম্পর্কে আপনার মনে কোনদিনও কোনও দুর্বলতা জাগেনি ?

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে সৌমিত্র ধীরে ধীরে জবাব দেয়, না।

কাল রাত্রে 'নন্‌সেন্স ক্লাব' থেকে সোজা আপনি এখানেই ফিরে এসেছিলেন তো ?

হ্যাঁ।

আগামী কাল সন্ধ্যায় ঠিক সাড়ে সাতটায় আমরা সকলে 'নন্‌সেন্স ক্লাবে' মিলিত হব,—আসবেন, ভুল যেন না হয়।

বেশ, যাব।

মালবিকার হোস্টেলে কিরীটী যখন পেঁছিল বেলা তখন প্রায় সাড়ে দশটা।

রবিবার নার্শারী স্কুল বন্ধ।

মালবিকাকে সংবাদ পাঠিয়ে কিরীটী হোস্টেলের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে থাকে।

কিছুক্ষণ বাদেই মালবিকা কক্ষে এসে প্রবেশ করল।

মাত্র এক রাত্রির মধ্যে অদ্ভুত, আশ্চর্য রকমের একটা পরিবর্তন যেন ঘটে গিয়েছে মালবিকার। এবং চোখে মুখে চেহারার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই যেন সেটা প্রকট হয়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টিতে একটা অসহায় ক্লান্তি ও অবসন্নতা যেন ফুটে বের হচ্ছে। চোখের পাতা ভারী, কালো কালো রেখা, অনিদ্রা ও দুশ্চিন্তার সুস্পষ্ট চিহ্ন। যদিও এ-ঘরে আসবার পূর্বে যথাসম্ভব বেশভূষা ঠিক করে এসেছে মালবিকা, শরীর ও মনের ক্লান্তিটা কিন্তু ঢাকা পড়েনি।

নমস্কার। বসুন মালবিকা দেবী।

নমস্কার। কোনমতে কথাটি উচ্চারণ করে মালবিকা।

গলার স্বরটা তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেমন কেঁপে ওঠে।

বসুন।

মালবিকা কিরীটীর ঠিক সামনাসামনি না বসে পাশের দিকে একটা চেয়ারে উপবেশন করে।

কিরীটী মালবিকার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্যে কি যেন ভেবে তারপর সহসা বললে, শুনেছেন—অনিলবাবুও নিহত হয়েছেন, এবং—

কিরীটীর কথাটা শেষ হল না, মালবিকার এতক্ষণের সযত্নরক্ষিত সকল ধৈর্যের বাঁধই যেন ঐ একটিমাত্র কথার আঘাতেই সহসা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। দু'হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে অবরুদ্ধ কান্নার আবেগে জড়িত স্বরে বলে উঠল, না না না আমি বিশ্বাস করি না, আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না কিরীটীবাবু। আপনি মিথ্যা কথা বলছেন।

মিথ্যা কথা যে বলিনি আপনি কি আমার চাইতে বেশী জানেন না মালবিকা দেবী।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই এবারে মালবিকা মুখের উপর থেকে হাত সরিয়ে সপ্রশ্ন ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে এবং অর্ধস্ফুট আর্তকণ্ঠে বললে, অ্যাঁ!

হ্যাঁ, জানেন বৈকি। কিরীটীর কণ্ঠস্বর যেন বজ্রকঠিন।

কিন্তু সেও মুহূর্তের জন্যে, পরক্ষণেই কিরীটীর কণ্ঠস্বর যেন অদ্ভুতরকম বদলে গেল, বললে, যাক। কেন যে গতরাত্রে আপনি অনিলবাবুর ওখানে ঐ ঝড়জলের মধ্যে গিয়েছিলেন আপাতত সেটা আমার না জানলেও চলবে, কিন্তু আগামী কাল সন্ধ্যায় 'নন্‌সেন্স ক্লাবে' আসতে ভুলবেন না যেন, ঠিক সাড়ে সাতটায়। নমস্কার।

বিহ্বল, বিমূঢ় মালবিকাকে দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণেরও অবকাশমাত্রও না দিয়ে কিরীটী সহসা কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ধীর মন্থর শান্ত পদবিক্ষেপে।

অতুল্যর বাড়িতে এসে কিরীটী শুনল, কমলা একাই বাড়িতে আছে, অতুল্য ও তাঁর স্ত্রী কোথায় বেড়াতে গিয়েছেন। কমলার ভৃত্যের পিছু পিছু

কিরীটী কমলার দোতলার শয়নকক্ষে যখন এসে পৌঁছল প্রথমটায় কমলা ওর দৃষ্টিতেই পড়েনি।

সুমিষ্ট মেয়েলী গলায় একটা সাদর আহ্বান শুধু কানে এল, আসুন, আসুন—কি সৌভাগ্য!

কণ্ঠস্বরকে অনুসরণ করে কিরীটীর দৃষ্টি মুগ্ধ বিস্ময়ে যেন একেবারে স্থির হয়ে গেল। কক্ষের ঠিক দক্ষিণ কোণে একটা প্রকাণ্ড সোফার কোটরে কমলা একেবারে যেন ডুবে আছে।

কোলে একটা লোমওলা বিড়ালছানাকে নিয়ে কমলা আপন মনে তাকে আদর করছে।

সত্যিই অপরূপ সুন্দরী কমলা। এত রূপ সচরাচর বড় একটা চোখে পড়ে না। তপ্ত কাঞ্চননিভ গাত্রবর্ণ।

অপর্যাপ্ত কুঞ্চিত কেশরাশি বিনুনির আকারে বক্ষের দু'পাশ দিয়ে সাপের মতই যেন এলিয়ে আছে। পরিধানে আজ কমলার লাল, রক্তবর্ণ একটা সিল্কের শাড়ি, গায়ে সাদা সিল্কের হাতা-ঢিলে ব্লাউজ। বিস্রস্ত শাড়ি ও ঢিলে ব্লাউজের অন্তরাল থেকে দেহ ও বিশেষ করে বক্ষসৌন্দর্য যেন প্রকট হয়ে উঠেছে।

একটা তীব্র গন্ধ যেন সহসা কিরীটীর নাসাপথে এসে প্রবেশ করে।

বসুন মিঃ রায়? দাঁড়িয়ে কেন?

কিরীটী উপবেশন করল।

ঘরের বিস্তৃত কার্পেটের উপরে কমলার আবরণহীন দুখানি পাদপদ্ম যেন লক্ষ্মীর দুখানি অলক্তরঞ্জিত চরণকমল। সামনেই একজোড়া কালো ভেলভেটের চপ্পল। কমলার গায়ে ও কোলের কাছে জড়ো হয়ে আছে ফিকে নীল রঙের একটা লক্ষ্ণৌই চাদর।

কক্ষের বাতাসে যে উগ্র গন্ধটা ভেসে বেড়াচ্ছে, কক্ষে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই যে গন্ধটা কিরীটীর নাসাপথে প্রবেশ করেছিল—সেটা ইউক্যালিপটাস্ অয়েলের গন্ধ। এতক্ষণে ধরতে পারে সেটা কিরীটী।

হ্যাঁ, গন্ধটা ইউক্যালিপটাস্ অয়েলেরই!

কিরীটীরও খুব প্রিয় গন্ধটা। কিরীটী ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কিভাবে তার বক্তব্য শুরু করবে।

কক্ষের চতুষ্পার্শ্বে আর একবার তাকায় কিরীটী। সমগ্র কক্ষখানি জুড়ে আভিজাত্য, ঐশ্বর্য ও রুচির যেন সুস্পষ্ট একটা পরিচয় ছড়িয়ে আছে।

বিড়ালছানাটাকে আদর করতে করতে কমলাই কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে, তারপর বলুন মিঃ রায়, হঠাৎ এ অধীনের গৃহে পদধূলি আপনার পড়ল যে! পরক্ষণেই প্রসঙ্গটাকে যেন একপাশে ঠেলে দিয়ে একটা আড়ামোড়া ভাঙতে ভাঙতে বললে, কাল থেকে কি বিশ্রী আবহাওয়াই পড়েছে!

কিরীটী কমলার কথার কোন জবাব দেয় না, কেবল তাকিয়ে থাকে কমলার মুখের দিকে।

কমলার চোখেও রাত্রি-জাগরণের সুস্পষ্ট ক্লান্তি। শুধু ক্লান্তিই নয়—চোখের পাতা দুটো ভারী, যেন ফোলা ফোলা। কমলাও কি সারারাত কাল ঘুমোয়নি, না সারাটা রাত কেবলই কেঁদেছে ?

সহসা কমলাই আবার কথা বলে, এ মাসের শেষেই আমি বিলেত যাচ্ছি কিরীটীবাবু।

বিলেত যাচ্ছেন !

হ্যাঁ, এখানকার সমস্ত আনন্দই তো শেষ হয়ে গেল। কমলার কণ্ঠস্বর যেন বেদনার অশ্রুতে বুজে আসে।

নীল পদ্মের মত দুটি আঁখিতে অশ্রুজল ছলছল করে ওঠে।

কোন আকর্ষণই আর নেই আমার এখানে, বিলেত থেকে নার্শারী ট্রেনিং নিয়ে এসে ভেবেছিলাম মালুর নার্শারী স্কুলেই জয়েন করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু মালবিকা—

শেষের কথা দুটো খুব ধীরে এবং অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হলেও কিরীটীর শ্রবণেন্দ্রিয়কে কিন্তু এড়িয়ে যেতে পারে না।

সহসা ঐ সময় সিঁড়িতে অত্যন্ত দ্রুত চঞ্চল পদশব্দ শোনা গেল এবং দ্রুত-পদে সঙ্গে সঙ্গে সৌমিত্র এসে কক্ষে প্রবেশ করেই, অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করে সোজা কমলার দিকে তাকিয়ে ব্যগ্র দ্রুতকণ্ঠে বললে, শুনেছ কমলা, অনিল—অনিলও কাল রাত্রে মারা গিয়েছে !

অ্যাঁ ! অনিল নেই ? সে—সেও—

বাকি কথাগুলো কমলার আর শেষ হল না। সহসা কিরীটী লক্ষ্য করলে, কমলার চোখের পাতা দুটো বুজে গেল, কমলার মাথাটা শ্লথভাবে সোফাটার উপরে এলিয়ে পড়ল।

বিস্মিত, হতভম্ব সৌমিত্র কমলাকে জ্ঞান হারাতে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল সোফার দিকে, কমলা, কমলা—কি, কি হল ?

হঠাৎ সংবাদটা শুনে অজ্ঞান হয়ে নিয়েছেন বোধ হয়।

কে ? ফিরে তাকাতেই এতক্ষণে সৌমিত্র কক্ষমধ্যে কিরীটীর উপস্থিতি টের পায় আপনি—কিরীটীবাবু ? মুহূর্তে যেন সৌমিত্রর সমস্ত দেহটা পাথরের মতই জমাট বেঁধে যায়।

হ্যাঁ, ঐ যে কুঁজোয় জল আছে কিনা দেখুন, চোখ-মুখে জলের ছিটে দিন। এখুনি ঠিক হয়ে যাবে।

তথাপি সৌমিত্র নড়ে না। কেমন যেন অসহায় দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে কিরীটীর মুখের দিকে তখনও তাকিয়ে থাকে।

কিরীটী এরপর নিজেই এগিয়ে গিয়ে কুঁজো থেকে কাঁচের গ্লাসে জল ঢেলে, জলভর্তি গ্লাসটা সৌমিত্রর হাতে এনে তুলে দিয়ে কতকটা যেন নির্দেশের সুরেই বলে, নিন, ওঁর চোখে-মুখে জলের ছিটে দিন—ধরুন !

এবারে সৌমিত্র কতকটা যেন যন্ত্রচালিতের মতই এগিয়ে গিয়ে কমলার সামনে দাঁড়িয়ে জলের গ্লাস থেকে জল নিয়ে কমলার চোখে-মুখে ছিটিয়ে দেয়।

কিরীটী কক্ষের ফ্যানটা চালিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ পরই কমলা ক্লান্তিভরে চোখ মেলে তাকাল, উঃ, মাগো!

কমলা, কমলা? সৌমিত্র ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকে।

কে? ক্ষীণ স্বরে কমলা বলে।

আমি সৌমিত্র। এখন একটু সুস্থ বোধ করছ কি?

হ্যাঁ। তারপরই ক্ষীণ স্বরে ডাকে, কিরীটীবাবু?

সৌমিত্রও ফিরে তাকাল, কিন্তু কিরীটীকে কক্ষমধ্যে দেখা গেল না। ইতিমধ্যে কখন একসময় কিরীটী নিঃশব্দে কক্ষ ত্যাগ করে গিয়েছে টেরও পায়নি ও।

ঐদিনই কিরীটী, অজিতা ও তাঁর স্বামী ভবানী রায় অজিতাদের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে অনিলের গতরাত্রে বিষপ্রয়োগে নিহত হওয়া সম্পর্কেই আলোচনা করছিল।

সংবাদটা যেন স্বামী-স্ত্রীকে একেবারে হতচকিত, স্তম্ভিত করে দিয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ স্বামী-স্ত্রী কারোরই মুখ দিয়ে কথা ফোটে না।

শেষ পর্যন্ত অনিল। অনিলও নিষ্ঠুর বিষের প্রক্রিয়ায় নিহত হল এবং তাদেরই মধ্যে একজনের হাতে!

এবারেও বিষপ্রয়োগ হয়েছে তৃষ্ণার পানীয়ের সঙ্গেই সম্ভবত—যখন মৃতের সামনে একটা শূন্য কাঁচের গ্লাস এবারেও পাওয়া গিয়েছে!

সহসা একসময় ভবানীই প্রশ্ন করে, তাহলে এবারেও আপনি অনিলের হত্যার ব্যাপারে আমাদের একজনকেই সন্দেহ করছেন কিরীটীবাবু?

কিরীটী ভবানীর প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না, শুধু একটিবার ভবানীর মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকায়।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

কে যেন আসছে। বিনয় এসে কক্ষে প্রবেশ করল, চোখে-মুখে তার সুস্পষ্ট উদ্বেগের চিহ্ন।

ঘরের মধ্যে উপবিষ্ট ভবানী, অজিতা ও কিরীটী তিনজনেই যুগপৎ নিঃশব্দে চোখ তুলে বিনয়ের দিকে তাকাল।

তাহলে তোমরাও শুনেছ অনিলের মৃত্যুর কথা? কথাগুলো যেন প্রায় নিঃশব্দেই উচ্চারণ করলে বিনয়।

ভবানী বা অজিতা বিনয়ের কথার কোন জবাব দিল না।

প্রশ্ন করলে কিরীটী, অনিলবাবুও যে মারা গেছেন জানলেন কি করে মিঃ মুখার্জী?

আশ্চর্য ব্যাপার কিরীটীবাবু! ঠিক প্রায় ভোররাত্রের দিকে টেলিফোনে কে যেন আমাকে সংবাদটা দিলে।

টেলিফোনে! বিস্মিত, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় কিরীটী বিনয়ের দিকে।

হ্যাঁ, মাথার কাছেই আমার টেলিফোন থাকে। গত রাত্রে ঐ দুর্ঘটনার পর কল্পপুরী স্টুডিও থেকে ফিরে সোজা বাড়ি চলে যাই। মানসিক উদ্বেগে প্রায় সারাটা রাত ছটফট করে শেষটায় শয্যায় শুয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানতে পারিনি। হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। অতি দ্রুত ভারী গলায় কে যেন বললে—আপনি তো অমুক কাগজের সম্পাদক? জবাবে বললাম—হ্যাঁ। কণ্ঠস্বর এবারে বললে—সংবাদ হিসাবে News Editorকে একটা জরুরী সংবাদ পাঠিয়ে ছাপাতে বলে দিন—বিখ্যাত শিল্পী অনিল চৌধুরীকে রহস্যজনকভাবে তার স্টুডিও-ঘরে মৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, মৃত্যুর কারণ হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড।

একটু থেমে বিনয় আবার বলতে শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে ফোন-কানেকশন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ ধরে আগাগোড়া ব্যাপারটা ভাবলাম। কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে শেষটায় ঠিক করলাম অনিলের ওখানেই যাব। হাত-মুখ ধুয়ে চা পান করে অনিলের ওখানে গিয়ে—

দেখলেন পুলিস এসে গিয়েছে, না? কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, এবং সেখান থেকেই সোজা এখানে আসছি।

আপনি এসে গিয়েছেন এখানে একপক্ষে কতকটা আমার শ্রমের লাঘব হল মিঃ মুখার্জী। আগামী কাল সন্ধ্যা ঠিক সাড়ে সাতটায় পাংচুয়ালী আমরা সকলে আপনাদের 'নন্‌সেন্স ক্লাবে' মিট করব। এবং কালই এ নৃশংস হত্যা-রহস্যের ওপরে যবনিকাপাত করতে চাই।

চব্বিশ

পরের দিন সন্ধ্যারাত্রে।

নন্‌সেন্স ক্লাবে'র বন্ধ দরজার সামনে।

কালো রংয়ের সুট-পরিহিত কিরীটী 'নন্‌সেন্স ক্লাবে'র দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। মুখে তার পাইপ ও দৃষ্টি বাঁ হাতের রেডিয়াম ডায়েল দেওয়া হাত-ঘড়ির প্রতি স্থির-নিবদ্ধ। কিরীটীকে ঘিরে চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে হিরণ্ময়, কমলা, ডাঃ অজিতা রায়, বিনয় মুখার্জী ও মালবিকা। সাড়ে সাতটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি আছে।

সৌমিত্র এখনো এসে পৌঁছয়নি।

সৌমিত্র আসছে না কেন?

সিঁড়িতে যে বেশী শক্তির বৈদ্যুতিক বাল্‌বটা ছিল সেটা পূর্বাহ্নেই কিরীটী

বদল করে স্বল্প-শক্তির একটা বাল্‌ব লাগিয়ে দিয়েছিল।

স্বল্পালোকে সমস্ত সিঁড়িপথ ও সামনের চিল্‌তে দাঁড়াবার মত বারান্দা-টুকু যেন অদ্ভুত রহস্যময় মনে হচ্ছে। সমস্ত স্থানটি জুড়ে মৃত্যুর মতই ভারী শ্বাসরোধী একটা স্তব্ধতা।

উপস্থিত সকলেরই মন ও চক্ষু যেন কিরীটীকে কেন্দ্র করে একাগ্রীভূত হয়ে আছে।

ঢং করে ক্লাবকক্ষের অভ্যন্তরস্থিত ওয়াল-ক্লকে ঠিক সাড়ে সাতটা ঘোষণা করল। উপস্থিত সকলের বক্ষে যেন অতর্কিত মুগুরের আঘাত হানল।

সাড়ে সাতটা! এবার আমরা ঘরের মধ্যে ঢুকব। কিন্তু সৌমিত্রবাবু এখনও এলেন না! ভারী, অস্বাভাবিক কণ্ঠে যেন কিরীটী কথাগুলো উচ্চারণ করলে।

ঠিক ঐ সময় সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল।

কিরীটী যেন কি বলতে যাচ্ছিল, সিঁড়ির পথে সেই জুতোর শব্দে তারও দৃষ্টি নিচের দিকে সিঁড়িপথে গিয়ে নিবদ্ধ হল।

শুধু কিরীটীর দৃষ্টি ও শ্রবণেন্দ্রিয়ই নয়, অন্যান্য সকলের দৃষ্টি ও শ্রবণেন্দ্রিয়ও ঐ একই দিকে আকর্ষিত হয়।

হ্যাঁ, সৌমিত্রই। সৌমিত্রই সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। বেশ দ্রুত সিঁড়ি অতিক্রম করবার জন্যে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সৌমিত্র হাঁপাচ্ছে।

আসুন সৌমিত্রবাবু। একমাত্র কিরীটীর কণ্ঠেই আহ্বান ধ্বনিত হল।

আমি—আমার একটু দেরি হয়ে গেল—

সৌমিত্রকে বাধা দিয়ে কিরীটী বললে, ঠিক আছে। হ্যাঁ একটু আগে আপনাদের আমি যা বলছিলাম—এবার আমরা ঘরের মধ্যে ঢুকব। আগে প্রবেশ করব আমি, তারপর আপনারা সকলে আমাকে অনুসরণ করবেন।

ঘরের দরজায় একটা তালা লাগানো ছিল, কিরীটী চাবি দিয়ে তালাটা খুলে ফেললে, ক্যাঁচ করে একটা মৃদু শব্দ শোনা গেল।

ঈষৎ ঠেলা দিতেই দ্বার উন্মুক্তই হল। অন্ধকার কক্ষ।

মৃত্যু যেন মুখব্যাদান করে আছে করাল ক্ষুধায়।

হাতে টর্চ নিয়ে সর্বপ্রথম কিরীটী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল, আসুন সকলে।

একে একে সকলেই অন্ধকার কক্ষমধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে।

ঘরের দরজাটা আমি আটকালাম না। অন্ধকারেই সকলের কর্ণে কিরীটীর ভারী কণ্ঠস্বর প্রবেশ করে।

সকলেই প্রায় কাছাকাছি অন্ধকারে কক্ষমধ্যে দাঁড়িয়ে, কিন্তু কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। অথচ একটা অদৃশ্য বন্ধনী যেন ওদের সকলকে ঘিরে রেখেছে একত্রে।

ছোঁয়া যায় না, দেখা যায় না—কিন্তু অনুভব করছে যেন প্রত্যেকেই সেই বন্ধনীটা।

আবার কিরীটীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, হ্যাঁ, দরজা বন্ধ করলাম না, কারণ সকলকেই আপনাদের আমি বিশ্বাস করছি এই মুহূর্তে।

সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর হস্তধৃত টর্চবাতির তীব্র জোরালো আলোর সন্ধানী রশ্মিটা গিয়ে অদূরস্থিত আলমারির মাথায় পড়ল।

চেয়ে দেখুন, ছটি বাঁদরের প্রতিমূর্তি, তার পাশে ছিন্নভিন্ন চারটি ক্যানভাস্। ক্যানভাসগুলির উপরে আপনাদেরই অন্তরঙ্গ এক শিল্পী বন্ধু আপনাদের চারজনের প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। তার পাশে দেখুন, একটি আস্ত কাঁচের গ্লাস, একটি ভাঙা কাঁচের পেয়ালা ও আরও দুটি ভাঙা কাঁচের গ্লাস, আর তার পাশে দেখুন একটা প্লেটের উপরে দুটি খালি হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশি। একটানা কথাগুলো বলে গেল কিরীটী।

মৃত্যুশীতল পাথরের মত ভারী একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ যেন চতুর্দিকে ঘন জমাট বেঁধে উঠেছে।

আবার কিরীটীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, হাতের টর্চবাতিটা কিরীটী আবার নিভিয়ে দিয়েছে তখন।

মানুষের বুকের কল্যাণ, শুভ-বুদ্ধি, প্রেম ও ভালবাসা যখন এমনি অন্ধকারে পথ হারায়– তখন সে নিকটতম আত্মীয় বা বন্ধু কেন, নিজেকেও হত্যা করতে বোধহয় দ্বিধা বোধ করে না। অন্তরতম বন্ধুকে হত্যা করা তীব্র বিষপ্রয়োগে আর নিজের কণ্ঠে বিষের পেয়ালা তুলে নেওয়ার মধ্যে হয়ত কোন পার্থক্যই নেই। আছে কিনা আপনারাই বলুন।

একটু থেমে কিরীটী আবার বলতে শুরু করে, মাত্র কয়েকদিন আগে এই ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আপনাদের প্রত্যেকের শুভবুদ্ধি ও বিবেকের দোহাই দিয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম, আপনারা যে যা জানেন কোন কিছু গোপন না করে আমাকে খুলে বলতে। আপনারা সকলেই মাত্র দু-একজন ছাড়া নীরব হয়ে রইলেন। কিন্তু যদি সেদিন আপনারা আমায় সাহায্য করতেন তাহলে হয়ত সুজিত ও অনিলবাবুকে অমনি করে নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণ করে নিতে হত না। শেষের দুটো হত্যার জন্যে হত্যাকারী তো বটেই, আপনাদের প্রত্যেককেই আমি দায়ী করছি। হ্যাঁ, আপনারা প্রত্যেকেই দায়ী। বন্ধুহত্যার মহাপাতকে লিপ্ত হয়েছেন। লজ্জায় বা সঙ্কোচে যে কোন কারণেই হোক আপনারা প্রত্যেকেই সত্যকে গোপন রেখে মৃত্যুকে অবাধ গতিতে এগিয়ে যেতে দিয়েছেন। শ্বাপদের মত হিংস্র হত্যাকারীকে নিজেদের বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের এবং দুর্বল সৌজন্যের বর্মে ঢেকে রেখে তার নিষ্ঠুর পৈশাচিক হত্যালীলায় সাহায্য করেছেন। Murder ও abatement of murder আইনের চোখে দুটোই সমান অপরাধ। কিন্তু এত করেও সত্য গোপন রইল না। আমার দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সত্য আজ। I know, yes, I know–আমি জানি হত্যাকারী কে!

দপ করে এমন সময় কক্ষের আলোটা জ্বলে উঠল।

এতক্ষণ অন্ধকারে পরস্পর পরস্পরের কাছে যেন গোপন হয়ে ছিল, সহসা তীব্র আলোয় অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের মধ্যে সে আড়ালটুকু মুহূর্তে যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকায়।

প্রত্যেকের দৃষ্টি জুড়েই যেন ফুটে উঠেছে একটা আশঙ্কা, একটা সন্দেহ, একটা সংশয়।

কে কে হত্যাকারী?

কে আমাদের মধ্যে হত্যাকারী?

হিমতীক্ষ্ণ একটা স্তব্ধতা যেন পাষাণের মতই ভারী হয়ে প্রত্যেকের বুকের মধ্যে চেপে বসেছে, কারও কণ্ঠে সামান্য শব্দটুকু পর্যন্ত নেই।

পাষাণে গড়া মূর্তির মত দাঁড়িয়ে সকলে ভাষাহীন, বোবা।

হঠাৎ এমন সময় দেখা গেল খোলা দ্বারপথে একজন ভৃত্য একটা ট্রেতে করে আটটি ধূমায়িত চা-ভর্তি কাপ নিয়ে কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল।

চা এনেছিস? দে ওঁদের। Gentlemen and Ladies! আসুন, নিশ্চয়ই সকলে আপনারা তৃষ্ণার্ত। গলাটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক, কি বলেন?

বলতে বলতে সর্বাগ্রে কিরীটীই একটা কাপ তুলে নিয়ে অন্য সকলের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, আপনারাও নিন।

কম্পিত হস্তে সকলেই ট্রের উপর থেকে এক-একটি করে কাপ তুলে নেয় একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন।

একটু দাঁড়ান! সহসা কিরীটীর কণ্ঠ যেন বজ্রকঠিন হয়ে ওঠে। হস্তধৃত চায়ের পেয়ালা। —তৃষ্ণার ঐ পানীয়ের সঙ্গেই আপনাদের মধ্যে একজন চার-চারবার তীব্র হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষ মিশিয়ে চারজন বন্ধুকে হত্যা করেছেন। একবার চিন্তা করে দেখুন—the idea behind it! The ghastly idea of putting one's life to end! আজ যদি তেমনি আপনাদের সকলের হস্তধৃত কোন একটি কাপে সেই তীব্র হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে!

মুহূর্তে প্রত্যেকের হাত থেকে চা-ভর্তি কাপগুলো মাটিতে পড়ে ঝন্‌ঝন্ শব্দে চুরমার হয়ে গেল। এবং সকলের কণ্ঠ থেকেই যুগপৎ বের হয়ে এল অস্ফুট আর্তনাদ।

এখনও—এখনও বলুন কে আপনারা হত্যা করেছেন? কে? কে?

কিরীটীর কথা শেষ হল না, একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরিধানে ভদ্রলোক কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন।

ভদ্রলোকের এক হাতে ধরা একটা বর্ষাতি টুপি, অন্য হাতে ধরা সংবাদপত্র দিয়ে মোড়া একটি পুলিন্দা।

আচ্ছা, তুমি যেতে পার। ভদ্রলোকের হাত থেকে জিনিসগুলো নিয়ে

কিরীটী বললে।

ভদ্রলোক চলে গেলেন।

কিরীটী পুলিন্দাটার মধ্যে থেকে বের করল একজোড়া নকল গোঁফ এবং ভগ্ন বাঁদরের মূর্তির টুকরো কতকগুলো।

অতঃপর কিরীটী বর্ষাতিটা হাতে নিয়ে বললে, এই বর্ষাতিটা গায়ে চাপিয়ে এবং মুখে এই নকল গোঁফ লাগিয়ে ছদ্মবেশে গতরাত্রে হত্যাকারী অনিলবাবুর গৃহে পুলিসের আত্মপরিচয় নিয়ে গিয়ে প্রবেশ করে। পুলিসের আত্ম-পরিচয় দেওয়ায় ভৃত্য গৃহপ্রবেশে বাধা দেয়নি। হত্যাকারী সোজা তখন সিঁড়ি বেয়ে উঠে অনিলবাবুর স্টুডিও-কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করে এবং প্রবেশ করবার মুখেই আবার ছদ্মবেশ খুলে ফেলেছিল বলেই বোধ হয় অনিলবাবু তাকে সাদরে কক্ষমধ্যে আহ্বান জানান। একবার ভেবে দেখুন, বেচারা অনিলবাবু স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি তীব্র কালকূট হাতে অন্তরতম এক বন্ধু তার কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করল।

একটু থেমে আবার কিরীটী বলা শুরু করে—

আর এই মূর্তিগুলো দেখলেই সকলে আপনারা বুঝতে পারবেন, এগুলোই আপনাদের প্রতীক এই ক্লাবঘর থেকে অপহৃত বাঁদরের মূর্তিগুলো। হত্যা-কারী একটির পর একটি হত্যা করেছে, আর একটির পর একটি মূর্তি সরিয়ে ফেলেছে অন্যের অলক্ষ্যে। কিন্তু কেন? সত্যিই কি ঐ মূর্তিগুলোর অপসারণের সঙ্গে চার-চারটি হত্যার কোন যোগাযোগ বা এই চুরির মধ্যে হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্তর্নিহিত কোন উদ্দেশ্য ছিল? না। স্থূলভাবে বিচার করে দেখতে গেলে, না। কোন উদ্দেশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখতে গেলে বলব, ছিল। এবং হত্যা ও মূর্তি চুরি যাওয়ার সঙ্গে একটা যোগাযোগ থাকাটাই—was the most puzzling factor in this case!

কিরীটী একটু থেমে আবার বলতে লাগল, হত্যার ব্যাপারে এই অপহৃত মূর্তিগুলোই প্রথমটায় আমাকে সত্যি বোকা বানিয়ে ফেলেছিল। এই সভ্য জগতে মানুষ ভদ্রতার ও শিক্ষার সামাজিক মুখোসটা মুখে এঁটে ঘুরে বেড়ালেও, কত সময় যে-নিভৃত অন্তরে থাকে তার রক্তলোলুপ হিংস্র একটা হত্যাকারী খুনী মানুষ—সে কথা চিন্তা করলেও বুঝি স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়! সত্যিই তাদের চিন্তা ও প্রবৃত্তির ধারা আরও বিচিত্র! ডাঃ অজিতা রায় ঠিকই বলেছিলেন, আসলে আজ আমরা সভ্য হলেও এখনও আমাদের মনের মধ্যে অনেকেরই একটা গুহাবাসী প্রস্তরযুগের অসভ্য পশুমন আছে —হত্যাকারী তাদেরই একজন। একটা বাঁদরের মতই কুৎসিত জন্তু তার অবচেতন মনের মধ্যে ছিল এবং তার সেই অবচেতন মনের জান্তব প্রবৃত্তি—rather the animal instinct or tendency-ই তাকে এই নৃশংস হত্যার ব্যাপারে লিপ্ত করেছে। সে তার মনোগত বৃত্তিরই পরিতৃপ্তি সাধন করেছে

বারংবার। কিন্তু কথা হচ্ছে, কি করে তার সেই অবেচতন মনের গোপন লিপ্সা -rather the animal cruelty জেগে উঠল! And why? আগুন জ্বালাবার জন্যে যেমন একটা ম্যাচস্টিক বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন হয়, এক্ষেত্রে সেই প্রয়োজনের তাগিদ মিটিয়েছে খুনীর হিংসা। বিকৃত যৌন-ক্ষুধার অতৃপ্তিজনিত পাশবিক জিঘাংসা। প্রেমের পথ বন্ধুর, জটিল। নরনারীর প্রেম—

সহসা এমন সময় কিরীটী বাধা দেবার আগেই দুম করে একটা শব্দ হল ও সঙ্গে সঙ্গে ঘরের একটিমাত্র আলোর বাল্‌ব্‌টা ভেঙে চুরমার ছত্রাখান হয়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে, জমাট নিশ্চিদ্র আঁধারে মুহূর্তে সমগ্র কক্ষখানি অন্ধকারে প্লাবিত হয়ে গেল।

সবাই স্তম্ভিত।

ঘরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে শ্বাসরোধকারী একটা হিমশীতল স্তব্ধতা যেন।

কিরীটীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, অন্ধকার দিয়ে হত্যার পাপকে ঢাকা দেওয়া যায় না। এখান থেকে আপনি পালাতে পারেন, দরজা খোলাই আছে কিন্তু কোথায় পালাবেন? পৃথিবী মস্ত বড় আর এইটিই পালাবার একমাত্র ও শেষ দরজা নয় জানবেন!

কোন সাড়াশব্দ নেই।

নিস্তব্ধ নিঝুম অন্ধকার যেন সব কিছু গ্রাস করেছে।

কিরীটী আবার বলে, হ্যাঁ, আপনারা যে খুশি যেতে পারেন, কাউকে বাধা দেওয়া হবে না।

তার পরই একে একে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল।

সকলে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল বোধহয়।

হঠাৎ হিরণ্ময়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল অন্ধকারে, কিরীটী!

তুমি যাওনি হিরণ্ময়? কিরীটী প্রশ্ন করে।

না, কিন্তু আমি দেখেছি কে আলমারির উপর থেকে একটা মূর্তি ছুঁড়ে ঘরের আলোর বাল্বটা ভেঙে দিল।

দেখেছ!

হ্যাঁ। তবে—তবে কি ঐ—

হ্যাঁ, উনিই হত্যাকারী হিরণ্ময়। প্রেমের পথে হিংসা বড় বিচিত্র, অত বড় তীব্র বিষ বোধহয় toxicology—বিষশাস্ত্রেও নেই। দয়া, মায়া, বিবেক, সৌজন্য, বিচার, বুদ্ধি, শিক্ষা—মানুষের যাবতীয় সুন্দর বৃত্তি নিমেষে ঐ বিষের ক্রিয়ায় কালো হয়ে যায়। একটা কথা কি জান হিরণ্ময়, নার্সিসাসের মত সকলেই একদিন নিজেকে ভালবাসে, কিন্তু তারপর ভালবাসার সেই সাধ মিটে গেলে অন্যের ভালবাসা পেয়ে সে তৃপ্ত, সার্থক হতে চায়। কিন্তু যার ভাগ্যে তা জোটে না সে ঐ ভালবাসার তৃষ্ণায় নিজেকে সংযমের মধ্যে না বাঁধতে পারলে অন্ধ দুর্বার হয়ে ওঠে। ওরও হয়েছিল তাই এবং ঐরকম যখন

তার মনের অবস্থা—ওর মনে হল তার সকল কিছুর অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে তারই মত একজন। কল্পিত, মনগড়া একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম নিয়েছিল ভয়াবহ এক হিংসাবৃত্তির উপরে, যার ফলে পর পর এই নৃশংস হত্যা! I am really sorry হিরণ্ময়, সুজিতবাবুর মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত আমি একটিবারও ভাবিনি—so innocen a face can meke such a horrible crime! অথচ বললাম না, প্রেমের এই যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সবটাই সম্পূর্ণ ওর মনগড়া, কল্পনাপ্রসূত! Romantic মনের প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যাবার ফল। মূর্তি তৈরির ইতিবৃত্ত যেদিন সর্বপ্রথম তোমার মুখে শুনি, সেদিনই ঐ জিনিসটা আমার মনে strike করে এবং আমি সেই পথ ধরে চলতে শুরু করি। আসলে যদিও হত্যাকারী তার পশুবৃত্তি চরিতার্থ করতেই মূর্তিগুলো চুরি করেছিল, ভেঙেছিলও মূর্তিগুলো সেই কারণেই। তোমাদের প্রস্তাব খুনীর vanityতে আঘাত করেছিল। মনের মধ্যে তার ঐ animal instinctটা ছিল বলেই সে তোমাদের ঐ প্রস্তাবটা সহ্য করতে পারেনি প্রথম কারণ, এবং সহ্য করতে না পারার দ্বিতীয় কারণ ছিল প্রস্তাবটা—যার কাছ থেকে এসেছিল, তাকেও সে সহ্য করতে পারেনি। সব কিছু মিলে মূর্তি চুরি করা ও পরে ভেঙে কতকটা আত্মতৃপ্তি লাভ করবার কল্পনাটা ওর মনে রূপ নিয়েছিল। This is the whole story behind these horrible murders! এদের সঙ্গে আসলে হোমিসাইডাল ম্যানিয়াকদের মূলগত ও প্রকৃতিগত কোন পার্থক্যই নেই, তাই বার বার তোমাদের আমি সাবধান করেছি। একবারও তোমাদের পাঁচজন যদি বলতে, উনিও তোমাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছেন—কিন্তু তোমরা প্রত্যাখ্যান করেছ ওকে, তাহলে—তাহলে হয়তো এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডগুলো দ্বিতীয় হত্যার পরই বন্ধ করতে পারতাম। কিন্তু দেখলাম নিয়তিই প্রবল, আমরা অতি তুচ্ছ নিয়তির হাতে আমরা কাঠের পুতুল মাত্র!

পঁচিশ

অন্ধকার ঘরে কখনও হাসছে কখনও কাঁদছে সে।

প্রকৃতির প্রতিশোধ বড় নির্মম, বড় ভয়ংকর।

হঠাৎ চিৎকার করে একসময় বলে ওঠে, হ্যাঁ, সৌরেশ শিশির সুজিত অনিল চারজনকে আমি খুন করেছি। কিন্তু কেন খুন করেছি!

অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে কিরীটী এসে প্রবেশ করল।

কেন খুন করেছেন আপনি কি তা জানেন না?

কে? চমকে ওঠে বক্তা।

আমি কিরীটী রায়। কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন বোধহয় কত বড় ভুল আপনি করেছেন! নিরপরাধ তারা, কোন দোষে দোষী নয়। আপনারই মনের

বিকৃত কল্পনায় আপনি ভেবেছিলেন তারা অপরাধী, আপনার প্রেমের ব্যাপারে তারা সাড়া দিচ্ছে না—অথচ আপনার এত রূপ এত আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও অন্যের প্রতি তারা আকৃষ্ট হচ্ছে! বুঝতে পারছেন কি এখন কী মহাভুল আপনি করেছিলেন?

না—না—ভুল আমি করিনি।

হ্যাঁ, ভুল আপনি করেছেন। প্রথম ভুল আপনি করেছেন, তাদের নিরপরাধ চারজনকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে। দ্বিতীয় মারাত্মক ভুল আপনি করেছেন, আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীর উপরে প্রতিহিংসা নিতে গিয়ে। আপনি জানতেন না আপনি যাকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে এই হত্যাসমরে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার নিজের জীবনেও কত বড় শোচনীয় পরাজয় তাকে অপমানিত, নির্যাতিত ও উন্মাদিনী প্রায় করে তুলেছিল। Sexually she was how much impotent!

না, না—আপনি জানেন না কিরীটীবাবু, আপনি জানেন না!

জানি, কারণ তার চিঠির মধ্যে দিয়ে জবানবন্দিই আমার কাছে তাকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু আপনার মত আমারও দুর্ভাগ্য, আমিও প্রথমটায় ভুল করেছিলাম এবং তাই সন্দেহটা আমার শিশিরবাবুর মৃত্যুর পর আপনাদের দুজনের উপরেই গিয়ে পড়েছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে অনিলবাবুর মৃত্যুর পর তার স্টুডিও-রুমে গিয়ে পরের দিন প্রত্যুষে প্রবেশ করলাম, সকল সন্দেহের আমার নিরবসান হল। But it was too late! চার-চারজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে আপনার পশুজনোচিত বিকৃত মানসিক প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতার রোষানলে হত্যা করে ফেলেছেন তখন already!

আমি বিশ্বাস করি না—বিশ্বাস করি না আপনার কথা।

ক্ষতি নেই তাতে। আপনি জানেন, আমিও জানি এবং অন্যান্য সকলেই আজ জেনেছে আপনি খুনী। চার-চারটি হত্যা আপনি করেছেন। এবং যে নৃশংস কাজ আপনি করেছেন, পৃথিবীতে আজও এমন কোন আইন তৈরি হয়নি আপনার অপরাধের বিচার করতে পারে। কিন্তু তবু আইন আপনাকে নিষ্কৃতি দেবে না, তাই আপনাকে আমি আইনের হাতেই তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছি।

কিরীটীর কথা শেষ হল না, দলবলসহ পুলিস ইন্সপেক্টার কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

পরের দিন জেলের মধ্যে দেখা গেল হত্যাকারী একেবারে ঘোর উন্মাদ।

কখনও হাসছে কখনও কাঁদছে।

কে! কে! কি চাও?

এখানে এস না, বিষ—ভয়ংকর বিষ!

চিৎকার করে বলে, সৌরেশ শিশির সুজিত অনিল—দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি আসছি।

সৌমিত্র কেঁদে ফেলে, হিরণ্ময়, আমার—আমারই দোষ, আমিই কমলাকে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড এনে দিয়েছিলাম ?

তুমি ! তুমি হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড এনে দিয়েছিল ?

হ্যাঁ। তখন তো বুঝিনি কমলা কেন চেয়েছে—কমলা ও আমার বিবাহের সব ঠিক হয়েছিল তোমার জন্মতিথি উৎসবের আগের রাত্রে। আমাদের জাত এক নয়, আমি জাতে কৈবর্ত, আর ওরা কায়স্থ। অতুল্য ঘোষ এ বিবাহে তাই রাজী হননি। তাই লুকিয়ে আমরা বিবাহ করব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে সোজা ওর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করতে গিয়ে শুনলাম—শুনলাম কমলা শিশিরের বাসায় গিয়েছে। সেখানে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনলাম কমলা শিশিরকে বিবাহের অনুরোধ জানাচ্ছে। মুহূর্তে অন্তর আমার বিষিয়ে উঠল। চলে এলাম। পাগলের মতই সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম রাস্তায় রাস্তায়। সন্ধ্যার সময় বিনয়ের সঙ্গে মার্কেটে দেখা হলেও তাই অনিলের জন্মতিথি উৎসবে যাইনি। পালিয়ে গিয়েছি। কিন্তু তখন তো জানি না, কমলা শুধু একা আমাকেই নয়—সৌরেশ সুজিত অনিল শিশির প্রত্যেককেই প্রলোভিত করেছে ! কিন্তু তারাও কমলাকে বোধ হয় চিনতে পেরেই—কি শ্রেণীর মেয়ে সে জানতে পেরেই—প্রত্যাখ্যান করেছে।

এসব কথা তুমি আমাকে আগে বলনি কেন সৌমিত্র ?

দুর্ভাগ্য আমার। লজ্জায়, অপমানে, মনঃকষ্টে আমি মুখ খুলতে পারিনি তোমাদের কাছে !

দুর্ভাগ্যই শুধু নয় এটা সৌমিত্রবাবু ! সহসা কিরীটীর কণ্ঠস্বরে যুগপৎ সকলে চমকে ফিরে তাকায়।

হ্যাঁ, নইলে আপনিই বা সেদিন রাত্রে 'নন্‌সেন্স ক্লাবে' স্বীকার করেননি কেন আমার কাছে—একটু আগে কমলাদেবীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল ? তাহলে হয়ত অনিলবাবুকে শেষ পর্যন্ত মরতে হত না ! তাই বলছিলাম সবই নিয়তি ! নিষ্ঠুর নিয়তির হাতের ক্রীড়নক মাত্র আমরা। আমাদের সকল কিছু ইচ্ছা, প্রচেষ্টা ও সাধনার আড়ালে এমন একটা শক্তি সর্বদা আমাদের তার ইচ্ছামত পরিচালিত করে যে তাকে এড়িয়ে যাওয়া আমাদের দুঃসাধ্য ! নইলে মালবিকাদেবীকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে প্রেমের ব্যাপারে কেন কমলাদেবী এই-ভাবে একের পর এক চারজনকে নিষ্ঠুর, পৈশাচিকভাবে হত্যা করবেন। অথচ মালবিকাদেবী এদের চারজনের মতই নিরপরাধ। কী ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা ভাবতেও গা শিউরে উঠে ! আর এই যে—আজ কমলাদেবী রাতারাতি ঘোর উন্মাদ হয়ে গেলেন, এও নিয়তিরই দেওয়া চরম দণ্ড ! তাঁর কৃত অপরাধের এর চাইতে বড় শাস্তি আর কী হতে পারত ? স্মৃতিভ্রংশের যে বেদনা তার তো তুলনা নেই। দেহভরা অতুলনীয় সৌন্দর্য নিয়ে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে বড় হয়েও এই যে পরিণতি—এই যে চরম ব্যর্থতা কমলা তার বাকি জীবন দিয়ে বয়ে বেড়াবে, এ তার নিজ হাতেই তুলে নেওয়া কালকূটের

বিষময় জ্বালা। যে কালকূট সে অন্যদের পরিবেশন করেছে, সেই কালকূটই আজ তার কণ্ঠে ফিরে এল।

এর চেয়ে কমলার মৃত্যুও বোধহয় ছিল ভাল কিরীটী! কথাটা কোনমতে বলে হিরণ্ময়।

এও মৃত্যুই বইকি। বেঁচেও ও মরে থাকবে। এর চাইতে শোচনীয় মৃত্যু আর কি হতে পারে! মৃত্যুর চাইতেও বেশি। কিরীটী বলে।

মিথুন লগ্ন

এক

চিন্তা ও কল্পনার বাইরে এক এক সময় একটা ব্যাপার বা ঘটনা ঘটে যায় যে হঠাৎ যেন কেমন বিমূঢ় করে দেয়।

সংবাদটা শুনে মায়ামঞ্চ থিয়েটায়ের প্রোপ্রাইটার সৌরীন কুণ্ডু ঠিক তেমনই বিমূঢ় হয়ে যায় যেন।

সংবাদটা এনেছিল তার থিয়েটারের কেয়ারটেকার লোকনাথ।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সৌরীন কুণ্ডু চায়ের কাপটা সামনে নিয়ে ঐদিনকার সংবাদপত্রে অ্যামিউজমেণ্ট কলমটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে সবে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় চোখ বুলোচ্ছে এমন সময় লোকনাথ যেন ঝড়ের মত এসে ঘরে ঢুকল।

তার গৃহে লোকনাথের অবারিত দ্বার।

লোকনাথ সোজা একেবারে উপরে তার বসবার ঘরে এসেই ঢুকেছিল।

পদশব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে লোকনাথের দিকে চেয়েই চমকে উঠেছিল সৌরীন কুণ্ডু।

চোখে-মুখে একটা আতঙ্ক যেন স্পষ্ট।

মাথার চুল এলোমেলো। পরনের শার্টের বোতামগুলো ভাল করে লাগায়নি পর্যন্ত।

লোকনাথ, এই সকালে কি ব্যাপার ?

শীগ্‌গির একবার থিয়েটারে চলুন স্যার! কথাটা বলতে বলতে লোকনাথের গলাটা যেন বুজে আসে।

থিয়েটারে কেন—কি হয়েছে ?

সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে স্যার!

সর্বনাশ!

হ্যাঁ মায়া—

মায়া—কি—কি হয়েছে মায়ার ?

জানি না ঠিক কি হয়েছে তার—তবে—

কি তবে ?

মায়া নেই।

মায়া নেই! তার মানে ? কোথায় গেছে ?

মায়া বেঁচে নেই স্যার।

সে কি! সৌরীন কুণ্ডু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে!

হ্যাঁ স্যার, থিয়েটারের সাজঘরের মধ্যে মায়ার মৃতদেহ পড়ে আছে।

মায়ার মৃতদেহ! সৌরীন কুণ্ডু আবার বসে পড়ে, কি বলছো তুমি পাগলের মত যা-তা লোকনাথ!

চলুন স্যার, আপনি এক্ষুনি একবার চলুন। মনে হচ্ছে সে আত্মহত্যা করেছে।

মায়া আত্মহত্যা করছে!

সেই রকমই মনে হচ্ছে—

কিন্তু কেন—মায়া আত্মহত্যা করবে কেন?

তা জানি না স্যার, আপনি চলুন এখুনি একবার।

সৌরীন কুণ্ডু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তারপর ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি যাও, আমি আসছি।

ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ও চিন্তার অতীত হলেও ঘটেছে এবং সেই কথাটাই জানিয়ে দিয়ে গেল লোকনাথ। লোকনাথ চলে গেল কিন্তু সৌরীন কুণ্ডু তখনও বসে থাকে চেয়ারটার ওপরে।

একটু বেলা করেই আজ ঘুমটা ভেঙেছিল সৌরীন কুণ্ডুর।

গত রাত্রে নতুন নাটকের শততম রজনী উৎসব গিয়েছে। পর পর দুটো নাটকে মার খাবার পর বর্তমান নাটকটি যে জমেছে বুঝতে পারা গিয়েছিল গত পঞ্চাশ রাত্রি থেকেই। ক্রমশঃ জমে উঠেছে নাটকটি।

অথচ নতুন নাট্যকার, নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী, সব কিছুই নতুন। নামমাত্র খরচে ও প্রয়াসে সৌরীন কুণ্ডু নতুন নাটকটি খুলেছিল। বড় বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মাসে মাসে একরাশ করে টাকা দিয়ে নাটক করবার মত কোমরের জোর সত্যিই যেন কমে গিয়েছিল সৌরীন কুণ্ডুর।

কিন্তু তাহলেও জনা দুই-তিন যে বড় বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রী ছিল তার মঞ্চে তাদের ছাড়াতে পারেনি সৌরীন কুণ্ডু।

তাদের বলেছিল, একটা ভাল নাটক দেখে শুনে ভাল করে একটু রিহার্সেল দিয়ে পুজোর আগে শুরু করা যাবে। মাঝখানে কটা মাসের জন্য একটা স্টপ গ্যাপ হিসাবে যেমন-তেমন একটা নাটক করব ভাবছি।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা বলেছিল, বেশ তো, তাই করুন।

আর তাতেই এই নাটক শুরু করেছিল সৌরীন কুণ্ডু।

নতুন একটি ছেলে প্রদীপ। অ্যামেচার ক্লাবে এখানে ওখানে কিছু অভিনয় করেছে। চেহারাটা সুন্দর দেখে ছেলেটিকে পছন্দ হওয়ায় কয়েক মাস ধরে তাকে সামান্য মাইনে দিয়ে সৌরীন কুণ্ডু বসিয়ে রেখেছিল।

সেই প্রদীপকেই মেন রোল দিয়ে ও তাদেরই অ্যামেচার গ্রুপের সম্পূর্ণ নতুন একটি মেয়ে—মায়া, তাকে নায়িকার রোলটি দিয়ে, সামান্য কয়েকদিন রিহার্সেল দিয়ে পুরানো সেট-সেটিংস নিয়েই খুলে দিয়েছিল সৌরীন কুণ্ডু নাটকটা।

সত্য কথা বলতে কি, সৌরীন কুণ্ডু থেকে শুরু থেকে ঐ নতুন নাটকের উপরে থিয়েটারের সকলেরই কেমন যেন একটা স্পষ্ট তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল।

কেউ যেন ওদিকে তাকানোও প্রয়োজন বোধ করেনি। বরং কেউ কেউ তো

মুখ বেঁকিয়ে বলেছে, সৌরীনবাবুর মতিচ্ছন্ন হয়েছে। বড় বড় নাট্যকারের নাটক, বাঘা বাঘা অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়েই যখন জমানো গেল না তখন—

সৌরীন কুণ্ডু নিজেও কোন উৎসাহ বা উত্তেজনা পোষণ করেনি।

নিয়মিত যেমন থিয়েটারে আসে তেমনি আসছিল। হঠাৎ এক শনিবার নাটকের সেল দেখে চমকে উঠেছিল সৌরীন কুণ্ডু।

নাটকটির তখন চল্লিশ রজনী চলছে।

নতুন নাটক খুললেও সে নাটকের উপরে কোন আস্থা ছিল না বলেই তখনও সৌরীন কুণ্ডু নতুন নাটক খুঁজছে। মুখ্য অভিনেতা অশোক মুখার্জীর সঙ্গে প্রায়ই তার ঘরে ভবিষ্যৎ প্ল্যান সম্পর্কে আলোচনা চলছে। ভেবে ভেবে কোন কুলকিনারাই যেন মিলছে না।

এমন সময় অনিল পাল বুকিং থেকে এসে ঐদিনকার সেলের স্টেটমেণ্টটা রাখল, স্যার, হাউস ফুল—পর পর দুটো শোই।

হাউস ফুল? সৌরীন কুণ্ডু তাকাল অনিলের দিকে।

নাটকটা বোধ হয় ধরে যাবে স্যার। কারণ আজকের অ্যাডভান্সও দেখে মনে হচ্ছে সামনের বৃহস্পতিবারও হাউস ফুল যাবে।

সামনের বৃহস্পতিবার কোন ছুটি আছে নাকি অনিল? সৌরীন কুণ্ডু প্রশ্ন করে।

না স্যার। আমি বলছিলাম কি—

কি?

কিছু বড় পোস্টার ছাড়লে হত না স্যার?

পোস্টার!

হ্যাঁ, স্যার। ভাল করে একটু পাবলিসিটি দিতে পারলে—

ঠিক আছে, তুমি যাও বুকিংয়ে।

অনিল পাল ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সৌরীন কুণ্ডু তার ঘর থেকে উঠে স্টেজ বক্সে গিয়ে বসল। এতদিন নাটকটা চলেছে, কোনদিন এদিকে পা বাড়ায়নি।

বক্স থেকেই তার নজরে পড়ে, গম গম করছে একেবারে হাউস যেন। তিল ধারণেরও যেন স্থান নেই।

বসে বসে সৌরীন কুণ্ডু অভিনয় দেখতে লাগল। নতুন ছেলেটির ও মেয়েটির অভিনয় যেন ভালই লাগে সৌরীন কুণ্ডুর। সেই চিরাচরিত লাউড্ অভিনয় নয়—অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভাবে অভিনয় করছে ছেলে ও মেয়ে দুটি। ঠিক যেন ঘরোয়া পরিবেশে দুজনে কথাবার্তা বলছে।

দর্শকরা নিঃশব্দে বসে শুনছে। হাততালি নেই, চেঁচামেচি নেই।

শেষ পর্যন্ত অভিনয়টা সে রাত্রে সৌরীন কুণ্ডু দেখল। বক্সে বসেই দেখল।

দুই

বুকিংয়ের অনিল পাল ছোকরাটি মিথ্যে বলেনি।

সত্যিই পরের বৃহস্পতিবার শোর ঘণ্টা দুই আগেই হাউস ফুল হয়ে গেল। তারপরের শনি ও রবিবারও প্রত্যেকটি হাউস ফুল।

প্রতি রাত্রেই সৌরীন কুণ্ডু ঐ রাতের পর অভিনয় দেখেছে। ভেবেছে এবং বুঝতে পেরেছে ঐ নতুন ছেলে-মেয়ে দুটির টিম ওয়ার্ক সহজ ও স্বাভাবিক অভিনয়ই নাটকটি জমিয়ে দিয়েছে।

ব্যবসায়ী মানুষ সৌরীন কুণ্ডু। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করে, ব্যবসা সে বোঝে। পাবলিসিটি অফিসার ফণি ঘোষকে ডেকে পাঠাল সৌরীন কুণ্ডু। ঘণ্টা দুই তার সঙ্গে পরামর্শ করল—তারপরই নাটকের পাবলিসিটি শুরু হল।

অনিল মিথ্যে বলেনি, পাবলিসিটিতে কাজ হল। নাটক জমে গেল সত্যি সত্যিই। যাকে বলে একেবারে রমরমা।

শুধু জমা নয়, গত দশ বছরে সৌরীন কুণ্ডু অত পয়সা পায়নি···। সারাটা শহর জুড়ে কেবল ঐ নাটকের কথা সকলের মুখে মুখে।

মায়া-মঞ্চের নতুন নাটক—'প্রথম ও শেষ'।

মায়া-মঞ্চের সর্বপ্রধান অভিনেতা অশোক মুখার্জী কিন্তু মৃদু হেসে বলেছিল, ও কিছু না বাবা। স্রেফ মানুষ একটু হুজুগ তুলেছে, ও দু'দিনেই ঠাণ্ডা হয়ে এল বলে। দেখে নিও।

কিন্তু সেও যখন দেখল নাটকের সেল কমা তো দূরে থাক আরও যেন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, তখন একদিন যেন কৌতূহলের বশেই স্টেজ বক্সে গিয়ে বসল অশোক।

প্যাক্‌ড্‌ হাউস।

পাকা অভিনেতা অশোক মুখার্জী। উনিশ বছর বয়েসে স্টেজে এসেছিল। আজ তার বয়স আটচল্লিশ পার হতে চলেছে।

বলতে গেলে একটা যুগ সে স্টেজ. নাটক ও অভিনয় নিয়েই আছে। আজ অভিনেতা হিসাবে তার নাম ও খ্যাতি মধ্যগগনে। তার নামেই আজ টিকিট বিক্রি হয়।

অশোক মুখার্জীর বুঝতে দেরি হয় না যে নাটকটি জমেছে এবং দীর্ঘ দিন ধরে চলবে আরও।

নাটকের টিম ওয়ার্কটি অদ্ভুত হয়েছে। প্রত্যেকেই বলতে গেলে নতুন। সামান্য দু'চারজন পুরনো অভিনেতা। বিশেষ করে ঐ নতুন মেয়েটির অভিনয় যেন অশোককে সত্যিই মুগ্ধ করে। মেয়েটি যেন স্বচ্ছন্দ এক ঝর্ণার মত, আপন খুশিতে হেসে গেয়ে নেচে চলেছে মঞ্চের উপরে। কোন প্রয়াস বা কৃত্রিমতা নেই।

মেয়েটির বয়সও তো বেশী নয়। বড়জোর আঠারো-উনিশ হবে। রোগা পাতলা চেহারা। লম্বাও খুব নয়। পাঁচ ফুট দু-এক ইঞ্চির বেশী নয়। গায়ের রঙও কালোই বলতে হবে। কিন্তু চোখ দুটি যেমন অপূর্ব, তার চাউনি ও ভঙ্গি তেমন মিষ্টি। আর গলার স্বরে যেন একটা আদিরস ঝলকে উঠেছে। কোন প্রয়াস কিছু নেই। সহজ স্বাভাবিক।

অভিনয় করে করে আজ এতগুলো বছর পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এমন আদিরস-ভরা গলার স্বর অশোক বুঝি ইতিপূর্বে কোন অভিনেত্রীর কণ্ঠেই পায়নি।

শ্রোতাদের যেন মুগ্ধ বিস্মিত করে রেখেছে মায়া।

অশোক বুঝতে পারে এ নাটক এখন চলল। রাতের পর রাত চলবে এ নাটক এখন অব্যাহত গতিতে।

একসময় অভিনয় শেষ হল।

একে একে দর্শকরা হল—প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল।

কিন্তু অশোক বসে থাকে। আরও অনেকক্ষণ পরে অশোক স্টেজ বক্স থেকে বের হয়ে সোজা সৌরীন কুণ্ডুর ঘরে এসে ঢুকল ধীরে ধীরে।

অনিল পাল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সৌরীন কুণ্ডুকে তখন বলছে, সামনের বৃহস্পতিবার হাউস ফুল হয়ে গেল স্যার। বুঝলেন স্যার—

আর যেন কি বলবার ইচ্ছা ছিল অনিলের কিন্তু অশোককে ঘরে ঢুকতে দেখে থেমে গেল। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল অনিল। যাবার সময় আড়চোখে একবার তাকিয়ে গেল অশোকের মুখের দিকে।

সৌরীন কুণ্ডু অশোকের মুখের দিকে তাকায়, এই যে অশোক, কখন এলে?

অভিনয় দেখছিলাম। বলতে বলতে একটা চেয়ার টেনে বসল অশোক।

দেখলে নাটকটা? প্রশ্নটা করে সৌরীন অশোকের দিকে আবার তাকায়।

হ্যাঁ।

সত্যি, আশাই করতে পারিনি পাবলিক এমন করে নাটকটা নেবে!

হুঁ। অশোক একটা সিগারেট ধরায়, সে যেন একটু অন্যমনস্ক।

সৌরীন কুণ্ডু বলে, সেল যেমন দেখছি তাতে মনে হচ্ছে এবার দু পয়সা পাব।

হুঁ।

সত্যি কথা বলতে কি অশোক, এ থিয়েটার লিজ্ নেওয়া অবধি এমন আমি সেল দেখিনি। আমি কি ভাবছি জান?

কি?

কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রীকে তো বসিয়ে রেখেছি, তাদের নোটিস দিয়ে দিই!

সেটা কি ভাল হবে?

কিন্তু বসিয়েই বা কতদিন আর মাইনে দেব! শুধু শুধু আসবে, যাবে আর মাইনে নেবে!

তা ঠিক।

তারপরই যেন একটু ইতস্ততঃ করে বলে সৌরীন কুণ্ডু, তুমিও তো বলছিলে অশোক, তোমার শরীরটা ইদানীং ভাল যাচ্ছে না। কিছুদিন ছুটি পেলে ভাল হত। তা আমি বলছিলাম কি—

অশোক সৌরীন কুণ্ডুর মুখের দিকে তাকাল।

তুমিও বরং কিছুদিনের ছুটি নাও না।

ছুটি!

হ্যাঁ। যাও, কোথাও ছ-সাত মাসের জন্য ঘুরে এস—ছ-সাত মাসের মধ্যে নতন নাটকের কথা যখন আর ভাববার প্রয়োজন হচ্ছে না, কি বল!

দেখি—

না. যাও। আরে বাবা, শরীরটা আগে, বুঝলে না! তোমাদের গিরিশ ঘোষই তো বলে গেছেন, দেহপট সনে নট সকলি মিলায়। তা দেহটাই যদি ভেঙে যায়—

বিজ্ঞের হাসি হাসে সৌরীন কুণ্ডু।

অথচ ঐ সৌরীন কুণ্ডই কয়েক মাস আগে ছুটি নেওয়ার কথায় অশোককে বলেছিল, বল কি, ছুটি নেবে! তার চাইতে গলায় আমার পা দিয়ে চলে যাও না কেন!

এখন সেই সৌরীন কুণ্ডুর গলাতেই অন্য সুর।

হাতের সিগারেটটায় কয়েকটা টান দিয়ে অশোক মৃদু কণ্ঠে ডাকে, দেখ সৌরীন—

কিছু বলছ? সৌরীন অশোকের মুখের দিকে তাকায়।

বলছিলাম কি—

কি বল তো?

তোমার এই নাটকে ঐ যে স্মাগলারের রোলটা আছে—

হ্যাঁ হ্যাঁ, চমৎকার করেছে ছেলেটি। নতুন ছেলে, অথচ—

পার্টটার মধ্যে জিনিস আছে। তেমন করে অভিনয় করতে পারলে নাটকে একটা ক্যারেক্টার সৃষ্টি করা যায়।

ছেলেটি অভিনয় করছে সত্যিই ভাল, তাই না?

হুঁ। তবে আরো ভাল হতে পারত। ভাবছি—

কি?

ঐ রোলটা আমি করব।

তুমি!

হ্যাঁ। অভিনয় দেখতে দেখতে ঐ কথাটাই ভাবছিলাম। বুঝলে, রোলটার মধ্যে এমন আবেগ, এমন একটা ডেপ্‌থ আছে—যেটা হয়ত সত্যিকার অভিনয়

করতে পারলে একটা বৈচিত্র্যের চমক—

কিন্তু—সত্তর রজনী পার হয়ে গেল, আজ এ সময় টিম ভাঙা কি উচিত হবে ?

অশোক যেন আশ্চর্য হয়েই সৌরীন কুণ্ডুর মুখের দিকে তাকায়।

তার মত একজন অভিনেতা সামান্য একটা সাইড রোল স্বেচ্ছায় করতে চাইছে, অথচ—

সৌরীন কুণ্ডু ইতস্ততঃ করছে।

অবিশ্যি রোলটা তুমি করলে একটা হৈ হৈ পড়ে যাবে জানি। কিন্তু জমা জিনিস—সৌরীন আমতা আমতা করে বলে আবার।

আরো জমিয়ে দেব, বুঝলে ? তুমি পোস্টার কালই ছাড়। তাহলে সেই কথাই রইল, বুঝলে ! কাল-পরশু দুদিন একটু রিহার্শেল দিয়ে নেব, তারপর বৃহস্পতিবারের শোতে নামব।

কথাটা বলেই উঠে দাঁড়াল অশোক।

ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

তিন

শো অনেকক্ষণ ভেঙে গিয়েছে। অভিনেতারাও যে যার চলে গিয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলা থেকে নেমে কম্পাউণ্ড পার হয়ে অশোক রাস্তায় এসে নামল।

শীতের রাত—দশটা বেজে গিয়েছে। গাড়ি, ট্রাম, বাস চলছে বটে তবে মানুষজনের ভিড় কমে এসেছে। অন্যান্য দিন অশোক ট্যাক্সিতে চেপেই বাসায় যায়। আজ কিন্তু কোন ট্যাক্সি নিল না। ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল।

বাগবাজারে বাসা। থিয়েটার থেকে খুব একটা দূর নয়।

বার বার যেন ঐ মায়া মেয়েটির যৌবনোচ্ছল দেহবল্লরী তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

দেহের কি লীলায়িত ভঙ্গি ! হাঁটা-চলা কথা-বার্তা—প্রতিটি মুভমেণ্টের মধ্যে যেন অপূর্ব এক যৌবন-সুষমা তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছিল। আর কি আদি-রসাত্মক কণ্ঠস্বরটি !

সেই সুনন্দা ডাকটি যেন এখনো দু কান ভরে বাজছে।

অভিমানের সেই সিনটি—চাপা কণ্ঠস্বর মৃদু বেদনার অভিমান জড়ানো কথাগুলো শুনতে শুনতে যেন সত্যিই শিহরণ তুলেছিল অশোকের সারা দেহে।

স্ত্রীলোক সম্পর্কে অশোকের কোন দিনই কোন প্রেজুডিস নেই। মঞ্চে ও ছায়াছবিতে অভিনয় করতে করতে আজ পর্যন্ত তার জীবনে বহু মেয়েই এসেছে, আবার চলে গিয়েছে।

কাউকে দুদিন, কাউকে হয়ত দশদিন নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে কিন্তু কই—মনে পড়ছে না তো অশোকের, কেউ আজ পর্যন্ত তার মনের মধ্যে সত্যিকারের কোন তৃষ্ণা জাগিয়েছে।

অথচ ঐ মায়া মেয়েটি—কি অদ্ভুত আকর্ষণ মেয়েটির!

নাটকে ঐ মেয়েটিই প্রাণ। মৌচাকের ঐ মক্ষীরাণী। ওকে ঘিরেই উৎসব। নাটকের বর্তমান সাফল্যের মূলে ঐ মায়া মেয়েটিই।

মায়া—কি যেন মেয়েটির পুরো নাম! মায়া শিকদার।

প্রথম দিন মেয়েটিকে দেখে অশোকের মনে হয়েছিল অত্যন্ত সাধারণ, অত্যন্ত তুচ্ছ একটা মেয়ে। রোগা, কালো, চোখে-মুখে একটা বোকা বোকা ভাব। অদ্ভুত শান্ত—যেন প্রাণহীন। ঐ মেয়েটিই তরুণী নায়িকার রোল করছে শুনে সেদিন হেসে উঠেছিল অশোক সৌরীন কুণ্ডুর সামনেই।

বলেছিল, সুইসাইডিং পলিসি—

অন্যান্য যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তারাও হেসেছিল। সমর্থনই করেছিল তাকে।

অথচ সেই মেয়েটিকেই আজ মঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোয় যেন সম্পূর্ণ অন্য মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল ও যেন অনন্ত-যৌবনা। পুরুষের মনে ওরাই জাগিয়েছে তৃষ্ণা চিরদিন সত্যিকারের! ওদের জন্যই বুঝি পুরুষ পাগল হয়েছে, যেমন ঐ নাটকের তরুণ নায়ক সুনন্দ হয়েছে।

সুনন্দ আর জয়তী—

আর তাদের মাঝখানে ঐ স্মাগলার লোকটি—ভবানীশঙ্কর।

শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি নাটকে ভবানীশঙ্করেরই জয়। অর্থের বিনিময়ে সে-ই একদিন কিনে ছিনিয়ে নিয়ে গেল জয়তীকে। ভালবাসার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে গেল।

কিন্তু দেহটাই পেল বটে জয়তীর ভবানীশঙ্কর, জয়তীকে পেল না। জয়তীর যে দেহের মধ্যে প্রাণ একদিন কানায় কানায় উছলে উঠছিল, আজ ভবানীশঙ্করের মনে হল সেই জয়তীকে ঘরে এনে তার ওপর আধিপত্য করার পর ও বুঝি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

মরা জয়তী। মৃত, নিস্পন্দ, পাথর জয়তী।

রাতের পর রাত তারপর ভবানীশঙ্করের মৃত জয়তীকে নিয়ে শব-সাধনা। অবশেষে একদিন ক্লান্ত হয়ে থামল ভবানীশঙ্কর।

জয়তীকে বললে, বের হয়ে যাও, আমার বাড়ী থেকে তুমি বের হয়ে যাও।

জয়তী যেন ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না—তার উপলব্ধিকে স্পর্শ করছে না ব্যাপারটা। সেও কেমন যেন বোবা অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ভবানীশঙ্করের দিকে।

ও তো জানে না ভবানীশঙ্কর আজ হেরে গিয়েছে!

দুর্দান্ত বেপরোয়া স্মাগলার ভবানীশঙ্কর—যাকে পুলিস কোন দিন

ধরতে ছুঁতে পারেনি, সকলের চোখের উপর দিয়ে যে নির্ভীক ভাবে এগিয়ে গিয়েছে—সে আজ সামান্য একটা মেয়ের কাছে হেরে গেছে।

যে মানুষটা কখনও কিছুতে ব্যর্থকাম হয়নি, চিরদিন মুঠো ভর্তি করে পেয়েছে, আজ তারই পরাজয় ঘটেছে ঐ তুচ্ছ একটা মেয়ের কাছে। জয়তীর কাছে আজ তার হার হয়েছে।

আজ যেন প্রথম উপলব্ধি করল স্মাগলার ভবানীশংকর, জীবনের সবচাইতে বড় স্মাগলিংয়েই সে ফাঁকিতে পড়েছে।

হঠাৎ আপন মনেই পথ চলতে চলতে অশোক হেসে ওঠে।

বোকা। ভবানীশংকর বোকা। আর তাই সে জয়তীর মধ্যে মৃত্যুকে ডেকে এনেছে। সে জানে জয়তীকে বাঁচাবার মন্ত্র।

একটা হোঁচট খেল অশোক।

আর এতক্ষণে তার প্রথম খেয়াল হল, বাড়ির পথে না গিয়ে সে এতক্ষণ উল্টো পথে হেঁটে এসেছে।

সৌরীন কুণ্ডু কিন্তু অশোকের সে রাত্রের প্রস্তাবটা নাকচ করতে পারল না। অশোককে চটাবার মত সাহস তার ছিল না।

মঞ্চজগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট। আজ না হলেও দুদিন বাদে আবার তাকে প্রয়োজন হবে। যে কারণেই হোক বর্তমান নাটকটি জমে গেছে বলেই ওদের নিয়ে পরবর্তী নাটকও যে জমবে তার কোন গ্যারাণ্টিও নেই।

কে বলতে পারে এ নাটকটা একটা স্রেফ অ্যাক্সিডেণ্ট!

সৌরীন কুণ্ডু পরের দিনই থিয়েটারে এসে পোস্টারের ব্যবস্থা করল।

অশোকের নামে পোস্টার পড়ল। এবং নির্দিষ্ট দিনে অশোক ভবানী-শংকরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল।

দর্শকরা একটা প্রত্যাশা নিয়ে সে রাত্রে শো দেখতে এল। কিন্তু দেখা গেল, নাটক যেন সে রাত্রে তেমন জমলই না।

অশোক সমস্ত প্রাণ দিয়ে অভিনয় করছিল, তবু যেন জমল না নাটক। প্রেক্ষাগৃহে একটা গুঞ্জন ওঠে। কোনমতে সে রাতটা কাটল।

পরের রাত্রে অশোক আরো সতর্ক হয়ে তার সমস্ত শক্তি ঢেলে দিয়ে অভিনয় করে। কিন্তু তবু নিজেই যেন বুঝতে পারে নাটক জমছে না।

নিজে নিজেই অশোক বিশ্লেষণ করে বোঝবার চেষ্টা করে, কেন জমছে না নাটক—অভিনয়ে কোথায় ত্রুটি, ঘাটতি কোথায়।

আরও তিন রাত্রি চলে গেল।

কাগজে কাগজে তার অভিনয় সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরুল। ভবানী-শংকর অশোকের জীবনের এক অনবদ্য সৃষ্টি। অভূতপূর্ব অভিনয়-স্বাক্ষর।

কিন্তু অশোক নিজে বুঝতে পারে, সে যা মনে মনে আশা করেছিল তা হচ্ছে না। মনের মধ্যে যে রূপটি সে কল্পনা করেছিল অভিনয়ে সেটা সে

ফুটিয়ে তুলতে পারছে না। কিন্তু কেন— কেন তা সে পারছে না?

অকস্মাৎ সে যেন আবিষ্কার করে, তার ব্যর্থতার মূলে রয়েছে মায়া।

মায়া তার পার্শ্ব-অভিনেত্রী। শুধু তাই নয়, নাটকে তার যে সব দৃশ্যগুলি সবচাইতে জমাট হয়ে ওঠবার কথা সে সব দৃশ্যেই মায়া উপস্থিত।

মায়ার সঙ্গেই তার অভিনয়।

বিশেষ করে ঐ দৃশ্যগুলোই যেন বিশেষ করে ঝুলে যাচ্ছে। কেমন প্রাণহীন জলো হয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন নিরুত্তাপ। মন্থর, শিথিল।

স্টেজ বক্সে বসে বসে মায়ার মধ্যে যে অভিনয়-প্রতিভা, অভিনয়ের মধ্যে যে প্রাণসঞ্চার দেখেছিল, ক্ষণে ক্ষণে তার চোখের মুখের ভাবের পরিবর্তন, লীলাচাঞ্চল্য তাকে নেশার মত আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তার যে কিছুই এখন সে দেখতে পাচ্ছে না মায়ার মধ্যে!

যে দুর্বার আকর্ষণ তাকে মায়ার প্রতি নেশাগ্রস্ত করে তুলেছিল, তার কিছুই যেন সে পাচ্ছে না মায়ার অভিনয়ের মধ্যে।

জয়তী যেন প্রথম দৃশ্য থেকেই মৃতা। একটা প্রাণহীন চরিত্র যেন মঞ্চে তার সঙ্গে নড়েচড়ে কথা বলে যাচ্ছে, হেসে যাচ্ছে মাত্র।

॥ চার ॥

সেদিন অভিনয়ের পর অশোক ড্রেসার অমূল্যকে দিয়ে ডেকে পাঠাল মায়াকে তার সাজঘরে।

মায়া এসে হাজির হল। দরজার ওপাশ থেকে তার গলা শোনা গেল, অশোক বাবু, আপনি আমাকে ডেকেছেন?

অশোক তখনও তার মেক্‌আপ তোলেনি, শেষ দৃশ্যের পোশাক ছাড়েনি, ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে একটা সিগারেট টানছিল। ক্ষণে ক্ষণে ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হচ্ছিল। অস্থির একটা আক্ষেপে যেন মধ্যে মধ্যে মাথার বড় বড় এলোমেলো তৈলহীন রুক্ষ চুলগুলো টানছিল।

পায়চারি থামিয়ে বললে, ভিতরে এস।

মায়া ভিতরে এসে দাঁড়াল।

শোন, তোমার অভিনয় এরকম হচ্ছে কেন?

আজ্ঞে—

মায়া অশোকের দিকে মুখ তুলে তাকায়।

বলছি আজ কদিন থেকে তোমার অভিনয় আগেকার মত হচ্ছে না কেন? কোন প্রাণ নেই, কোন কিছু নেই।

আমি তো যেমন আমাকে শেখানো হয়েছিল তেমনিই অভিনয় করছি।

শেখানো হয়েছিল তোমাকে?

হ্যাঁ।

মিথ্যা কথা বলো না। তুমি জাত-অভিনেত্রী। তোমাকে কারো অভিনয়

শেখাতে হয় না।

আমি আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

আই ওয়াণ্ট সিন্‌সিয়ার কো-অপারেশন্‌—সম্পূর্ণ সহযোগিতা চাই তোমার অভিনয়ের সময়।

আমি—

শোন, অভিনয়ে তোমার যে চরিত্র তাতে তোমায় আরও প্যাশানেট্‌, আর সেকস্‌ অ্যাপিলিং হতে হবে। আই মীন—বুঝতে পারছ তুমি আমার কথাটা।

মায়া চুপ করে থাকে। মাথা নীচু করে থাকে।

আমার সঙ্গে অভিনয় করতে কি তোমার ভয় হয় ?

না।

তবে অমন প্রাণহীন অভিনয় করছ কেন ?

আপনি বিশ্বাস করুন, আমি আমার যথাসাধ্যই করবার চেষ্টা করি। কিন্তু—

কিন্তু ?

আপনার মধ্যে যেন আমি—

বল, থামলে কেন ?

অলক্তর মধ্যে তার অভিনয়ের যে আবেগ আমি পেতাম সেটা যেন আমি এখন পাচ্ছি না।

অলক্ত !

হ্যাঁ, আপনার আগে যে ভবানীশঙ্কর করছিল।

হুঁ।

কিছুক্ষণ আবার পায়চারি করল অশোক, তারপর ওর মুখের দিকে তাকাল, মায়া !

বলুন।

থ্যাঙ্ক-ইউ ফর ইয়োর কনফেসন্‌। তোমার স্পষ্টবাদিতায় সত্যিই আমি খুশি হয়েছি।

তারপরই একটু মৃদু হাসল। প্রশ্রয়ের হাসি।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন মায়া—বস—ঐ চেয়ারটায়।

মায়া বসে না, দাঁড়িয়েই থাকে।

বস !

ঐ সময় থিয়েটারের ভৃত্য কালী কাপে করে গরম কফি নিয়ে এল। অভিনয়ের মধ্যে এক কাপ গরম কফি পান করা অশোকের বহুদিনকার অভ্যাস।

কফি খাবে মায়া ? অশোক জিজ্ঞাসা করে।

না। মায়া মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়।

বস না !

মায়া এবার বসল চেয়ারটায়।

কালী কফির কাপটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে গিয়েছিল, কাপটা হাতে তুলে নিল অশোক।

কাপে একটা চুমুক দিল।

অনেকেই জানত অশোক অভিনয়ের সময় এতটুকু মদ্যপান করে না, যদিও মদ্যপানের ব্যাপারে তার জুড়ি মেলা দুস্কর।

কিন্তু অনেকেই জানত না ঐ কফিপানই ছিল তার মদ্যপান।

কফির সঙ্গে থ্রি এক্স রাম মিশিয়ে দিয়ে যেত কালী অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে।

বোতলটা কালীর জিম্মাতেই থাকত।

কাপে আর একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে পুনরায় মায়ার দিকে তাকিয়ে ডাকে অশোক, মায়া !

বলুন।

কতদিন তুমি অভিনয় করছ ?

এখানে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার আগে মধ্যে মধ্যে অ্যামেচার ও অফিস ক্লাবে দু-চার -বার অভিনয় করেছি।

ব্যাস !

হ্যাঁ।

তাহলে বলব তুমি জন্ম-অভিনেত্রী, অভিনয়ের একটা প্রতিভা নিয়ে তুমি জন্মেছ। কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মত। এতকাল আমি স্টেজে আছি, কিন্তু একটুও বাড়িয়ে বলছি না, জেনো তোমার মত এমন অভিনয়-প্রতিভা ইতিপূর্বে আমার চোখে পড়েনি।

মায়া মৃদু হাসে।

আমি বলছি একদিন তুমি স্টেজ জ্বালিয়ে দেবে তোমার অভিনয় দিয়ে। ভবিষ্যৎ অভিনেত্রী-সম্রাজ্ঞী তুমি।

মায়া মাথা নিচু করে। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, বাড়ি যেতে হবে।

ব্যস্ত হয়ো না, আমি তোমাকে তোমার বাসায় নামিয়ে দিয়ে যাব। তোমার বাড়ি কোথায় ? কোথায় থাক তুমি ?

নেতাজী কলোনীতে।

কোথায় সেটা ?

বেলগাছিয়ায়।

আমি তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবো'খন। বাড়িতে কে কে আছে তোমার ?

মা বাবা আর ছোট দুটি ভাই বোন।

বাবা কি করেন ?

বাবা প্যারালিসিসে পঙ্গু হয়ে আজ চার বছর প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে আছেন।

বল কি! তাহলে বোধ হয় তুমিই ফ্যামিলির একমাত্র আরনিং মেম্বার?

হ্যাঁ। লেখাপড়া তো শিখতে পারিনি, অভিনয় করে যা পাই তাই দিয়েই কোনমতে সংসার চলে।

মাসে কত দেয় তোমাকে সৌরীন?

এসেছিলাম সত্তর টাকায়, গত মাস থেকে একশো করে দিচ্ছেন।

মাত্র একশ! দাঁড়াও, আমি কালই বলব সৌরীনকে।

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে পোশাক বদলে নিচ্ছিল অশোক। পায়জামা, পাঞ্জাবি, মুখের মেকআপও তুলে নিয়েছিল।

কালী এসে ঐ সময় দরজার ফাঁকে উঁকি দেয়।

কি রে কালী?

ট্যাক্সি এসে গেছে।

যা, আমি আসছি। চল মায়া—

মায়া উঠে দাঁড়াল।

॥ পাঁচ ॥

দুজনে সাজঘর থেকে বেরুতেই প্যাসেজে অলক্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

অলক্ত মায়ার অপেক্ষাতেই প্যাসেজে দাঁড়িয়ে ছিল তখন।

রোজ সে-ই অভিনয়ের শেষে মায়াকে তার গৃহে পেঁছে দেয়। আগে বরাবর অভিনয়ের শেষে অলক্ত মায়ার জন্য অপেক্ষা করত। কিন্তু কিছুদিন থেকে অশোক তার পার্টটা করায় সে বসে আছে। কোন পার্ট নেই তার। তাহলেও সৌরীন কুণ্ডু তাকে ছাড়েনি, মাইনে দিয়ে যাচ্ছে।

রোজই সে থিয়েটারে আসে এবং অভিনয়ের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে। তারপর অভিনয়ের শেষে মায়াকে গৃহে পেঁছে দিয়ে নিজের বাসায় যায়।

সেও মায়াদের বাড়ির কাছাকাছিই থাকে—পাতিপুকুরে।

অলক্তকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ যেন মায়ার ব্যাপারটা মনে পড়ে যায়। থমকে দাঁড়ায় সে। কি বলবে, কি করবে যেন বুঝতে পারে না।

কিন্তু অলক্তই কথা বলে, বাড়ি যাবে না মায়া?

একটু বুঝি ইতস্ততঃ করে সে। কি বুঝি বলবার চেষ্টা করে, কিন্তু তার আগেই অশোকের ব্যাপারটা নজরে পড়ে গিয়েছিল। সে-ই বলে, আমি ওকে পেঁছে দিচ্ছি—এস মায়া।

মায়া মাথা নীচু করে। অশোক এগিয়ে যায়, মায়া তাকে অনুসরণ করে।

পরের দিন মায়া থিয়েটারে এসে নিজের মেকআপ রুমে বসে মেকআপ নিচ্ছে, সৌরীন কুণ্ডুর গলা শোনা গেল।

মায়া দেবী!

কে?

আমি সৌরীন কুণ্ডু।

আসুন, আসুন।

সৌরীন কুণ্ডু এসে ঘরে ঢুকল, অশোককে আপনার মাইনের কথা বলতে গেলেন কেন, আমিই তো ঠিক করে রেখেছিলাম সামনের মাস থেকে আপনার মাইনে আরও কিছু বাড়িয়ে দেব।

মায়া বিব্রত বোধ করে। বলে, আমি তো তাঁকে

আপনাকে সামনের মাস থেকে দুশো করে দেব। খুশি তো?

মায়া কোন জবাব দেয় না।

সৌরীন কুণ্ডু সংবাদটা দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

কিন্তু মায়া সত্যিই, খুশি হয়। এবার একেবারে ডবল—দুশো টাকা করে সে পাবে! যাক এবার আর তত অভাব থাকবে না।

বাবার ওষুধপত্র কেনা যাবে। ভাই-বোন দুটিকেও আবার স্কুলে ভর্তি করা যাবে।

সত্যি, অশোকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা তার ভরে ওঠে। অশোককে ধন্যবাদ একটা জানানোর জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে সে।

সে-রাত্রেও অভিনয়ের শেষে অশোকের ঘর থেকে তার ডাক এল।

তাড়াতাড়ি মেক্‌আপ তুলে বেশ বদল করে মায়া অশোকের সাজঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ভিতরে আসব?

কে, মায়া? এস, এস।

সামনে কফির কাপ রাম-মিশ্রিত। আয়নার সামনে বসে মেকআপ তুলতে তুলতে অশোক মধ্যে মধ্যে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিল।

আমাকে ডেকেছিলেন?

বস।

মায়া আজ আর ইতস্ততঃ করে না। চেয়ারটায় বসে পড়ে।

হ্যাঁ, ফিল্মে অভিনয় করবে?

ফিল্ম!

হ্যাঁ। রোলটা অবিশ্যি ছোট, দিন তিনেকের কাজ।

করব।

ঢোকো এ লাইনে, তারপর তোমার পার্টস আছে, তুমি ঠিক ফিল্ম লাইনেও জায়গা করে নিতে পারবে। তিন দিনের জন্য তোমাকে তিনশো টাকা দেবে।

আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব অশোকবাবু—

অশোক হাসিমুখে ফিরে তাকাল মায়ার দিকে, ধন্যবাদটা এখন তোলা থাক মায়া।

মায়া খুশি ও লজ্জায় মাথা নীচু করে।

অশোক আবার বলে, তাহলে কাল দুপুরে তুমি প্রস্তুত হয়ে থেকো।

কাল ?

হ্যাঁ, কালই তোমাকে স্টুডিওতে যাবার পথে তুলে নিয়ে যাব।

দুপুরে কখন ?

বেলা বারোটা নাগাদ।

থাকব।

সে রাত্রেও দুজনে বেরুতেই অলক্তকে দেখতে পেল।

আজ কিন্তু অলক্তকে দেখে মায়া এতটুকু বিব্রত বোধ করল না বা সংকোচ বোধ করল না।

এ কি. অলক্ত ! তুমি দাঁড়িয়ে আছ বুঝি ? আমি তো অশোকবাবুর সঙ্গে যাচ্ছি।

মায়াই বলে ওঠে নিজের থেকে।

অলক্ত একবার মায়ার দিকে মুখ তুলে তাকায়, কিন্তু কোন সাড়া দিল না।

এসো মায়া—

অশোক ডাকে।

চলুন !

এগিয়ে যায় দুজনা পাশাপাশি।

অলক্ত দাঁড়িয়েই থাকে।

প্যাসেজের মৃদু আলোয় অশোক ও মায়া তার সামনে থেকে মিলিয়ে যায়। প্যাসেজের পরেই কাঠের সিঁড়ি।

ওদের পায়ের শব্দ সিঁড়িতে ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়।

।। ছয় ।।

সবাই প্রায় চলে গিয়েছে তখন।

নীচে সিফটাররা দু-তিনজন মঞ্চের উপর সিনগুলো সব গুছিয়ে রাখছে।

শূন্য মঞ্চ।

টিম্‌টিম্‌ করে একটা আলো জ্বলছে। অলক্ত ধীরে ধীরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। বুকের মধ্যে একটা জ্বালা যেন সে অনুভব করছিল।

মায়ার সঙ্গে তার পরিচয় আজকের নয়। পাড়ায় তাদের একটা থিয়েটার-ক্লাব ছিল। ও আর প্রদীপ দুজনে মিলে গড়ে তুলেছে সে ক্লাব।

এপাড়া ওপাড়া থেকে সব ছেলেমেয়েদের সংগ্রহ করে মধ্যে মধ্যে অভিনয় করত। বলতে গেলে মায়ার অভিনয়ের হাতেখড়ি তাদের 'নিশান' ক্লাব থেকেই।

সুরম্য নাট্যকার, আর প্রদীপ ছিল পরিচালক ক্লাবের।

প্রদীপের সঙ্গে সৌরীন কুণ্ডুর কি করে যোগাযোগ হয়েছিল অলক্ত জানে না।

তবে মাঝখানে সুরম্য শুনেছিল, প্রদীপ মায়ামঞ্চে চাকরি পেয়েছে। একস্ট্রা হিসাবে মাইনে পাচ্ছে বর্তমানে।

হঠাৎ একদিন ক্লাবে গিয়ে অলক্ত দেখে ক্লাবে খুব হৈচৈ হচ্ছে।

প্রদীপ ও সুরম্যকে ঘিরে সবাই ঘনিষ্ঠ হয়ে পরম উৎসাহের সঙ্গে নানা কথা বলছে।

এমনিতে চিরদিন মুখচোরা টাইপের ছেলে সুরম্য। বেশী কথা কোনদিনই বলত না, মুচকি মুচকি কেবল হাসত।

সেদিন যেন সুরম্য অকস্মাৎ বাচাল হয়ে উঠেছিল।

অনেক কষ্টে জানতে পারল অলক্ত, সুরম্যর যে নাটকটা সামনের পুজোয় অভিনয় করা হবে বলে লেখা হয়েছিল সেই নাটকটাই নাকি মায়ামঞ্চে অভিনীত হবে। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে অনেকেই ঐ নাটকে অভিনয়ের চান্স পাচ্ছে।

কটা দিন তারপর কি উত্তেজনা ক্লাবের সকলের ওদের!

কূপের মূষিক হঠাৎ সাগরে গিয়ে যেন পড়েছে।

ক্লাবের পাণ্ডা প্রদীপ আর অলক্ত।

প্রদীপ তো আগেই মায়ামঞ্চে চাকরি করছিল অভিনয় না করলেও, সৌরীন কুণ্ডু আরো অনেককে ও সেই সঙ্গে মায়াকেও ডেকে নিল। এবং মায়াকে মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে ওদের দুজনেরই প্রচেষ্টা ছিল। প্রদীপ ও অলক্ত।

আজ সেই মায়াই তাকে এড়িয়ে গেল!

অলক্তর চোখের কোণ দুটো জ্বালা করছিল।

মঞ্চের নামী অভিনেতা অশোকবাবুর দৃষ্টি আজ মায়ার উপর পড়েছে, তাই মায়া আজ অলক্তকে ভুলে গিয়েছে! মায়া হয়ত আজ নতুন এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে।

কিন্তু মায়া কি জানে না ঐ অশোকবাবু কি চরিত্রের লোক?

ভাল অভিনেতা সে হতে পারে—কিন্তু মদ্যপ, চরিত্রহীন। সকলেই জানে লোকটা একের নম্বরের লম্পট। মায়াও যে শোনেনি কথাটা তাও তো নয়।

এখন অলক্ত বুঝতে পারছে, তাকে নাটক থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তার ঐ চরিত্রে নিজে অশোকের অবতীর্ণ হবার পশ্চাতে ঐ মায়াই লক্ষ্য।

মায়ার উপরে নজর পড়েছে অশোকবাবুর, তাই সে কৌশলে ঐ কাণ্ডটা ঘটিয়েছে—এই সুযোগে সে মায়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারবে।

আর কার্যত তাই দেখা যাচ্ছে।

প্রথমে আক্রোশ হয় অলক্তর, তারপর হয় অভিমান।

ঠিক আছে, মায়া যদি তার ভালটা না বোঝে, নিজের ধ্বংস নিজে টেনে আনে তো আনুক। অশোকবাবুর শখ মিটে গেলেই সে মায়াকে ছেঁড়া জুতোর মত আবার একদিন রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ওদের মত লোকের শখ মিটতে আর কদিন! দুদিনেই শখ মিটে যাবে। মায়ার প্রয়োজনও ওর কাছে ফুরিয়ে

যাবে তখন।

অলক্ত সেই রাত্রেই মনস্থির করে, মায়ার ব্যাপারে আর সে মাথা ঘামাবে না। মায়া যা খুশি করে করুক।

আরো দুটো মাস কেটে গেল। অলক্ত থিয়েটারে যায় আসে, কোন কাজ-কর্ম নেই, উইংসের পাশে বসে অভিনয় দেখে, তারপর একসময় থিয়েটার-শেষে বাড়ি ফিরে আসে হাঁটতে হাঁটতে।

মায়ার সঙ্গে অশোকের আরও ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। থিয়েটারের শেষে দুজনে একসঙ্গেই বাড়ি ফেরে। কোন কোন দিন দুজন একসঙ্গেই থিয়েটারে আসে।

নাটকের সেল বেশ ভালই। মনে হয় শত রজনী গৌরবের সঙ্গে পার হয়ে যাবে।

অশোকের সঙ্গে মায়ার ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা থিয়েটারের সকলেরই চোখে পড়ে। থিয়েটারের পুরনো লোকেরা আড়ালে চোখ টিপে হাসাহাসি করে।

মায়ার যে সেটা নজরে পড়ে না তাও নয়—কিন্তু মায়ার যেন কোন ভ্রূক্ষেপই নেই সেজন্য।

মায়া ইতিমধ্যে দু-একটা ছবিতে অশোকের জন্য ছোটখাটো চান্সও পেয়েছে। মায়ার মধ্যেও একটা পরিবর্তন দেখা যায় যেন।

মায়া যেন আগের সেই লাজুক নম্র শান্ত মায়া আর নেই। ভাল করে সবার সঙ্গে আজকাল আর সে কথাও বলে না। কারো সঙ্গে মেশেও না। যা কিছু তার মেলামেশা ঐ অশোকের সঙ্গেই।

অলক্ত দূরে দূরেই থাকে। মায়ার ধারেকাছেও আসে না।

কিন্তু একদিন অকস্মাৎ প্রদীপের সঙ্গে খিটিমিটি বেধে যায় মায়ার।

প্রদীপ মায়াকে বলে, মায়া, তোর অভিনয় দিন দিন ডেটোরিয়েট্ করছে!

মানে! মায়া গ্রীবা বেঁকিয়ে তাকাল প্রদীপের দিকে।

এর আগের সীনটা তুই ঐভাবে নষ্ট করলি কেন।

নষ্ট আমি করিনি, করেছ তুমি প্রদীপদা।

কি বললি?

হ্যাঁ। যেভাবে আজ ঐ সিনটা আমি অভিনয় করলাম ওটাই কারেক্ট।

না।

হ্যাঁ।

হুঁ, তাহলে আজকাল অশোকবাবুর কাছে নতুন করে অভিনয়ের পাঠ নিচ্ছিস তুই!

প্রয়োজন হয়েছে তাই নিয়েছি—ভুলো না অশোকবাবুর পায়ের তলায় বসে এখনও দশ বছর তুমি অভিনয় শিখতে পার প্রদীপদা।

হঠাৎ প্রদীপ উত্তরে বলে বসে, তাই বুঝি তার সঙ্গে রোজ রাত্রে তার বাড়িতে অভিনয়ের পাঠ নিতে যাস?

যাই তো। তাতে তোমার কি!

ভাল ভাল। তা অভিনয়েরই পাঠ নিস, না আরো কিছু পাঠ নিস ?

মুখ সামলে কথা বলো প্রদীপদা !

কেন, তোর ভয়ে—না তোর অশোকবাবুর ভয়ে ? প্রদীপ গুহ তোদের ভয় করে না বুঝলি ? কথাটা বলে প্রদীপ আর দাঁড়ায়নি।

কিন্তু কথাটা তো মিথ্যে নয় একেবারে।

মায়াকে আজকাল প্রায়ই অশোক তার ফ্ল্যাটে রাত্রে অভিনয়ের শেষে নিয়ে যায় এবং বাসায় ফিরতে তার কোন কোন দিন অনেক রাত হয়ে যায়।

মায়ার মা মৃন্ময়ী দেবীও মেয়েকে প্রশ্ন করেছিল, এত রাত করে ফিরিস কেন ? থিয়েটার তো সাড়ে নটাতেই ভেঙে যায় শুনেছি !

মায়া জবাব দিয়েছে, থিয়েটার ভাঙলেই তো থিয়েটারের কাজ শেষ হয় না, অনেক সময় আবার রিহার্শেল দিতে হয়—তাই রাত হয়ে যায়।

মৃন্ময়ী অতশত বোঝে না। ভাবে, হবেও বা।

কিন্তু মায়ার পঙ্গু বাবা রাধানাথ রাত্রে মেয়ের মধ্যে মধ্যে অত দেরি করে বাসায় ফেরাটা ভালভাবে নিতে পারে না।

স্ত্রীকে বলে, বয়সের মেয়ে, এত রাত করে ফেরে !

কিন্তু সাহস করে কড়া কথা বলতে পারে না মেয়েকে। আজ মেয়ের আয়েই সংসার চলছে। নিজে আজ সে পঙ্গু, একটা পয়সা আনবার ক্ষমতা তার নেই আজ।

সম্পূর্ণ ভাবেই মেয়ের মুখাপেক্ষী তারা।

॥ সাত ॥

এমনি যখন পরিস্থিতি তখনই ঠিক ব্যাপারটা ঘটল।

সকালবেলা থিয়েটারের জমাদার সুখলাল সাজঘর পরিষ্কার করতে এসে মায়ার সাজঘরে ঢুকে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল দরজাটা ঠেলে।

মায়ার সাজঘরটা ছিল আলাদা। ভিতরের দিকে—ছোট ঘরটা।

সাজঘরের মেঝেতে মায়ার মৃতদেহটা পড়ে আছে।

প্রথমটায় ঘটনার আকস্মিকতায় সুখলাল যেন কয়েকটা মুহূর্তের জন্য বোবা হয়ে গিয়েছিল। তারপরই অস্ফুট একটা চিৎকার করে ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

বেলা তখন খুব বেশী হয়নি। সকাল সাড়ে সাতটা মাত্র। টিকিট-ঘর তখনও খোলেনি।

লোকজনের মধ্যে থিয়েটারে তখন দুজন দারোয়ান। জমাদার সুখলাল ও কেয়ারটেকার বোকাবাবু অর্থাৎ লোকনাথ।

বোকাবাবু সৌরীন কুণ্ডুরই কি একরকম দূর আত্মীয়ের ছেলে ! ভাল নাম লোকনাথ। বিশেষ লেখাপড়া করেনি, সাদাসিধে হাবাগোবা মানুষ। থিয়েটারেই সে সর্বক্ষণ থাকে। কেবল দুবেলা খাবার জন্য কিছু সময়ের জন্য

বাইরে যায়।

বোকা ঘুম থেকে উঠে বাইরের লবিতে দাঁড়িয়ে একটা দাঁতন নিয়ে দন্ত-মার্জন করছিল।

সুখলাল হাউ হাউ করে সেখানেই এসে পড়ে বোকাবাবুকে বলে, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে বোকাবাবু!

সর্বনাশ? কি হয়েছে?

মায়া দিদিমণি—

মায়া দিদিমণি—কি হয়েছে তার?

চল শীগ্‌গিরী দেখবে চল—মায়া দিদিমণি নেই—

নেই?

হ্যাঁ। মরে গেছে।

কি পাগলের মত যা-তা বকছিস।

ভয়ে উত্তেজনায় সুখলাল তখন ভাল করে, স্পষ্ট করে সব কথা বলতে পারছে না। কথাগুলো তার জড়িয়ে যায়।

বোকাবাবু কি হবে?

কোথায় দেখেছিস তুই মায়া দিদিমণিকে?

তার সাজঘরে।

সে কি! সাজঘরে?

হ্যাঁ।

চল্, দেখি।

বোকাবাবু এগিয়ে যায় স্টেজের দিকে। সুখলাল ওর পিছনে পিছনে যায়।

বোকাবাবুও মায়ার সাজঘরের মধ্যে ঢুকে থমকে দাঁড়ায়।

সত্যিই মায়া পড়ে আছে তার সাজঘরের মেঝেতে চিৎ হয়ে। চোখ দুটো ঠেলে বের হয়ে এসেছে যেন। মুখটা সামান্য হাঁ করা, কষ বেয়ে পড়েছে খানিকটা রক্তমিশ্রিত লালা। একটা মাছি মুখের ওপরে উড়ছে।

শুধু তাই নয়, সবচাইতে যেটা বেশী আশ্চর্য করে বোকাবাবুকে, গত রাত্রের থিয়েটারের মেকআপ পর্যন্ত তখনো মায়ার মুখে লেগে রয়েছে। পরনে সেই লাস্ট সিনের নীল রঙের সিল্কের শাড়িটা। কপালে ও সিঁথিতে সিঁদুর।

বোকা আর দাঁড়াতে পারে না।

মাথাটা তার ঘুরতে শুরু করেছিল। সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে আসে।

কি করা উচিত? কি এখন করবে বোকাবাবু?

প্রথমেই যে কথাটা তার মনে হয় সেটা হচ্ছে অবিলম্বে সৌরীনদাকে একটা খবর দিতে হবে।

কালই মাত্র নতুন নাটকের মহাসমারোহ করে শততম রজনী অভিনয় হয়ে গিয়েছে। পুরস্কার বিতরণ ছিল। নাট্যকার থেকে শুরু করে মায় গেটকিপার ও সুইপাররা পর্যন্ত সকলেরই পুরস্কার মিলেছে।

এখনো চারিদিকে ফুলের মালা ঝুলছে।

সৌরীন কুণ্ডু ফিরেছিল বেশ একটু রাত করেই। তাছাড়া গতকালই সৌরীনদা বলছিল বাড়ির ফোনটা নাকি আউট অফ্ অর্ডার হয়ে আছে। নচেৎ এখুনি একটা ফোনই করে দেওয়া যেত।

অবিশ্যি খবর না পাঠালেও এখুনি হয়ত সৌরীন কুণ্ডু এসে পড়বে থিয়েটারে। প্রত্যহ সে সকাল আটটা থেকে সোয়া আটটার মধ্যে একবার থিয়েটারে আসেই

বেলা প্রায় বারোটা পর্যন্ত থাকে।

অ্যাড্ভান্স সেল কি রকম হল না হল খবর নেয়।

তাছাড়া সৌরীনের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ঐ সময় সকালের দিকে থিয়েটারে আড্ডা দিতে আসে। মুড়ি সিঙাড়া কচুরীর সঙ্গে চা চলে ও সেই সঙ্গে আড্ডা।

বোকা অর্থাৎ লোকনাথ আর দেরি করে না। তখুনি সৌরীন কুণ্ডুর বাড়ির দিকে ছোটে সংবাদটা দেবার জন্য একটা ট্যাক্সি নিয়ে।

সৌরীন কুণ্ডুকে সংবাদটা দিয়ে ফিরে এল আবার বোকা থিয়েটারে হন্তদন্ত হয়ে।

বোকা ফিরে এসে অফিসঘরের মধ্যেই বসে ছিল। সাজঘরের মধ্যে মায়ার মৃতদেহটা দেখা অবধি বোকা রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিল।

সাদাসিধে সরল প্রকৃতির মানুষ বোকা।

কোন ঘোরপ্যাঁচ বেচারী বোঝেও না, থাকেও না কোন ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে কখনো। সৌরীন কুণ্ডু থিয়েটারটা লীজ নেবার আগে বোকা সৌরীন কুণ্ডুর বাসাতেই থাকত। দু' বেলা দুটি খেত আর টুকটাক কাজ করত। সৌরীন কুণ্ডুই তাকে মাসে মাসে দু-চার টাকা করে হাত খরচা দিত। বোকার তাতেই চলে যেত।

থিয়েটার লীজ নেবার পরে বোকাই বলেছিল, আমাকে একটা কাজ দিন থিয়েটারে।

সৌরীন কুণ্ডু হেসে বলেছিল, কি কাজ তুই করবি থিয়েটারে ?

দিন না যা হয় একটা কিছু।

বেশ, তুই থিয়েটারে কেয়ারটেকার হয়ে থাক্।

সেই অবধি বছর পাঁচেক ধরে বোকা থিয়েটারেই থাকে সর্বক্ষণ। মাসে মাসে গোটা চল্লিশ করে টাকা দিত সৌরীন বোকাকে।

ঐ টাকায় খাওয়া-পরা দিব্যি চলে যায় বোকার।

কখনো দুটো ভাত ডাল সিদ্ধ করে নেয়, কখনো হোটেলে খায় আর সাজ-

ঘরের বাইরে বড় সোফাটার ওপর শুয়ে ঘুমোয়।

সৌরীন কুণ্ডু একটু পরেই এসে হাজির হয় থিয়েটারে।

ইতিমধ্যে বুকিংয়ের গৌরবাবু, প্রম্পটার মণিবাবুও এসে গিয়েছিল। তারা দুজন দারোয়ান ও জমাদার সকলে মিলে লবিতে জটলা করছিল।

সৌরীনকে আসতে দেখে সকলে চুপ করে। ওর মুখের দিকে তাকায়। বোকাও অফিসঘর থেকে বের হয়ে আসে সৌরীনের সাড়া পেয়ে।

বোকার দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করে, কোথায়?

সাজঘরে।

সৌরীন এগিয়ে যায়, বোকা তার পিছনে পিছনে যায়।

মৃতদেহ দেখে এসে কিছুক্ষণ যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সৌরীন, তারপর একসময় আবার নিজের অফিসঘরে ফিরে এসে ঐ এলাকার থানার ও-সি শম্ভু চাটুয্যেকে একটা ফোন করে দেয়।

থানা-অফিসার শম্ভু চাটুয্যে ওর পরিচিত। থিয়েটারে আসা-যাওয়া আছে।

শম্ভু চাটুয্যেও সংবাদটা পেয়ে কম অবাক হয় না। বলে, বলেন কি মিঃ কুণ্ডু।

হ্যাঁ আপনি আসুন।

আমি এখুনি আসছি।

সৌরীন যেন সত্যিই অন্ধকার দেখে।

কাল শনিবার ছিল—আজ রবিবার দুটো শো। সামনের বুধবার আরও দুটো শো।

আজকের দুটো শো'র সব টিকিট তো বিক্রীই হয়ে গিয়েছে। আগামী কাল ও পরের বুধবারের টিকিট অগ্রিম বিক্রী হয়ে গিয়েছে। নাটকটা যেভাবে জমে উঠেছে তাতে করে তিনশো রজনী তো হবেই। কত আশা করেছিল সৌরীন। ঠিক এই সময় এ কি বিভ্রাট ঘটল?

কিন্তু মায়া মেয়েটি সুইসাইডই বা করল কেন?

নিজে তো গেলই, তার থিয়েটারের চালু নাটকটারও সমাপ্তি ঘটিয়ে গেল।

আজকের শো তো মাথায় উঠল। সব টিকিট রিফাণ্ড দিতে হবে। পরেই বা ওই পার্টটা কাকে দিয়ে করাবে সৌরীন!

ওই বয়সের অমন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী তার স্টেজে আর এখন কোথায়?

তাছাড়া যে-ই এখন ওর ওই পার্ট করবে, সে যদি নিঃসংশয়ে ওকে টেক্কা না দিতে পারে তো সব গেল। নাটকের সেল দেখতে দেখতে পড়ে যাবে!

অর্থাৎ নাটকটা মরে গেল। আচ্ছা মেয়েটার কি আক্কেল!

সুইসাইড করতে গেলি কেন?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে সৌরীনের, ইদানীং মেয়েটা নাকি রীতিমত উড়তে শুরু করেছিল। অশোকের সঙ্গে লটঘট শুরু হয়েছিল।

এদের পছন্দের, রুচিরও বাবা বলিহারি ! অশোক তো ওর বাপের বয়েসী !

।। আট ।।

শম্ভু চাটুয্যে এসে ঘরে ঢুকল।

সৌরীনবাবু !

সৌরীনের চিন্তাধারায় ছেদ পড়ে।

এই যে আসুন, চলুন !

কোথায় ডেড বডি ?

সাজঘরে।

চলুন।

দুজনে সাজঘরের দিকে অগ্রসর হল।

সাজঘরে ঢুকে শম্ভু চাটুয্যে বেশ কিছুক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব পরীক্ষা করল। প্রথমে মৃতদেহ ও পরে ঘরটা।

ছোট স্বল্প-পরিসর ঘর।

একটা ছোট বেঞ্চ পাতা আছে একধারে। দেওয়ালে ব্র্যাকেট লাগানো। তার সামনে একটি আরশি ফিট করা। খান-দুই চেয়ার। একটা মাঝারি সাইজের আলমারি।

ঘরে যাতায়াতের জন্য দুটো দরজা—একটা পশ্চিমমুখী, অন্যটা দু'ঘরের মধ্যবর্তী দক্ষিণমুখী। আর একটা ছোট দরজা আছে, ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে যাবার জন্য। বাথরুম দিয়েও বের হয়ে যাওয়া যায় পশ্চিম দিককার প্যাসেজে।

দু'ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা খোলাই ছিল। সুখলাল ওই দরজাপথেই প্রথমে সাজঘরে ঢুকেছিল। বাকি দুটো দরজাই বন্ধ ছিল ভিতর থেকে।

শম্ভু চাটুয্যে সৌরীন কুণ্ডুর মুখের দিকে তাকাল, চলুন, আপনার ঘরে যাওয়া যাক।

চলুন।

ওরা এসে আবার সৌরীন কুণ্ডুর ঘরে বসল।

ইতিমধ্যে থিয়েটারের আরও কিছু কিছু লোক এসে গিয়েছে।

টিকিটঘরের সামনে ভিড়।

টিকিট বিক্রী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মায়া দেবীর আকস্মিক অসুস্থতার একটা নোটিশ হাতে লিখে টিকিটের কাউণ্টারের সামনে টাঙিয়ে দিয়ে।

সৌরীনবাবু !

শম্ভু চাটুয্যের ডাকে সৌরীন ওর মুখের দিকে তাকাল।

ব্যাপারটা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে—

কি ? সৌরীন একটু চাপা উৎকণ্ঠার সঙ্গেই প্রশ্নটা করে।

সৌরীন কুণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে শম্ভু চাটুয্যে বলে, মনে হচ্ছে আত্মহত্যাটত্যা নয়—

তবে কি ?

পিওর কেস অফ মার্ডার ! নিষ্ঠুর নৃশংস হত্যা !

হত্যা ?

হ্যাঁ।

কি বলছেন আপনি ?

হ্যাঁ, অবিশ্য পোস্টমর্টেম্ না করা পর্যন্ত আমরা ডেফিনিট্ হতে পারব না।

আপনি বলছেন মিঃ চ্যাটার্জী, মায়াকে কেউ হত্যা করেছে ? সৌরীন পুনরায় প্রশ্ন করে।

অন্ততঃ বর্তমানে তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু তার আগে আপনাকে এক কাজ করতে হবে।

কি ?

আপনি থিয়েটারের সকলকে ডেকে পাঠান। সকলকেই আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

ডেকে পাঠাবার আর বোধহয় প্রয়োজন ছিল না। কারণ ইতিমধ্যে দুর্ঘটনার সংবাদটা অনেক দূর ছড়িয়ে গিয়েছিল মুখে মুখে। এবং আশেপাশে থিয়েটারের যারা থাকত তারা ইতিমধ্যে থিয়েটারের লবিতে এসে ভিড় করেছিল।

থিয়েটারের লোহার গেট দুটো ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। টিকিট-ঘরের দরজাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও থিয়েটারের সামনে একটা ছেটেখাটো ভিড় জমে গিয়েছিল।

মুখরোচক সংবাদ।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বাদ দিলেও একটা থিয়েটারের কর্মী-সংখ্যা তো নেহাৎ কম নয়।

চার-পাঁচজন সিফ্টার, তিনজন ইলেকট্রিসিয়ান্, বেয়ারা জন-তিনেক।

ভিতরে একটা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য টি-স্টলেট মত আছে—তারাও দুজন এবং দুজন জমাদার। ড্রেস ইত্যাদির ইনচার্জে একজন ও সে-সবের সরবরাহের জন্য একজন—চৌদ্দজন।

তাছাড়া মেয়েদের জন্য একজন ও ছেলেদের জন্য একজন মেকআপ ম্যান এবং মিউজিক হ্যাণ্ডস্ জন-ছয়েক—দুজন প্রম্পটার।

একে একে যারা এসে গিয়েছিল তাদের ডেকে শম্ভু চাটুয্যে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে।

এবং তাদের মুখ থেকে যতদূর জানা গেল—

॥ নয় ॥

গতকাল শনিবার একটা শো ছিল। এবং শো'র সেদিন শততম রজনীর স্মারক-উৎসব। হাউস ফুল ছিল।

রাত নটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে শো শেষ হয়। তারপর যেমন অন্যান্য দিনের মত একে একে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা থিয়েটার থেকে চলে যায় তেমনি সবাই চলে গিয়েছে।

কেউই বলতে পারল না, গত রাত্রে মায়াকে অভিনয়ের শেষে থিয়েটার থেকে বের হয়ে যেতে দেখেছিল কিনা।

অন্যান্য দিন প্রায়ই সবার শেষে থিয়েটার থেকে বের হয় অশোক এবং তার সঙ্গেই বের হয় মায়া। কিন্তু গত রাত্রে অশোক নাকি একাই বের হয়েছিল এবং অন্যান্য দিনের চাইতে একটু আগেই।

জানা গেল আশোককে বাইরে বের হয়ে যেতে দেখেছে দুজন। বেয়ারা অতুল ও ইলেকট্রিসিয়ান্ প্রভাস।

অশোকের সঙ্গে যে ইদানীং মায়ার একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল এবং সেটা সকলেরই নজরে পড়েছিল, তাও শম্ভু চাটুজ্যে জানতে পারে।

আরও কিছু কিছু সংবাদ সংগৃহীত হল।

ঐ মায়া মেয়েটিকে ঘিরে ইদানীং থিয়েটারের মধ্যে বেশ একটা নাকি আবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল। সে আবর্তের মধ্যে তিনজন জড়িয়ে ছিল—অশোক, প্রদীপ ও অলক্ত। অথচ মেয়েটির যতদূর জানা গেল, অশোকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল – প্রথমোক্ত দুজনের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় থাকা সত্ত্বেও।

আপাততঃ তখনকার মত মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে থিয়াটারের সাজঘরটা লক্ আপ করে এবং দুজন পুলিস প্রহরায় রেখে শম্ভু চাটুয্যে তখনকার মত চলে গেল। সৌরীন কুণ্ডুকে বলে গেল, অভিনেতাদের সকলের সঙ্গে একবার কথাবার্তা বলতে চায় সে। কুণ্ডু যেন সকলকে একটা খবর দেয় সন্ধ্যায় থিয়েটারে আসার জন্য ঐ দিনই।

সৌরীন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

শম্ভু চাটুজ্যে চলে যাবার পর সৌরীন তার ঘরের মধ্যেই ঝিম দিয়ে বসে থাকে। সৌরীনের যেন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ হচ্ছিল।

এ কি হল! একটা সাজানো ছক সব ওলট-পালট হয়ে গেল!

তাছাড়া শম্ভু চাটুয্যে যা বলে গেল তাই যদি হয়—মায়া খুনই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তো আর এক ঝামেলা।

কিন্তু তাই বা হবে কি করে? মায়াকে হত্যা করতেই বা যাবে কেন কেউ?

কিন্তু শম্ভু চাটুয্যে যখন বলে গেল, তার ধারণা মায়াকে কেউ হত্যাই করেছে তখন কথাটা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলাও যাচ্ছে না।

সন্ধ্যাবেলা শম্ভু চাটুয্যে আবার থিয়েটারে এল।

মোটামুটি অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলেই এসেছিল। সকলে এসে প্রেক্ষা-

গৃহের মধ্যে জমায়েত হয়েছিল। সকলেই বিস্ময়ে যেন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল।

সবার শেষে এসেছিল অশোক। সকলেই আড়চোখে অশোকের দিকে তাকায়।

অশোক সকলের থেকে পৃথক হয়ে অডিটোরিয়ামের ফ্রণ্ট রো'র একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে সিগারেট টেনে চলে।

শম্ভু চাটুয্যে সৌরীন কুণ্ডুর ঘরে বসে একে একে সকলকে ডেকে পাঠাচ্ছিল।

প্রভাত একজন প্রৌঢ় অভিনেতা। অনেক দিন ধরে ঐ থিয়েটারে আছে। বেঁটেখাটো ফর্সা। টাইপ রোলে অভিনয় করে। সে বললে শেষ দৃশ্যের শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থাকতে হয় একমাত্র মায়াকেই। এবং তার উপস্থিতিতেই যবনিকা নামে। গত রাত্রে যখন যবনিকা পড়ে, শেষ দৃশ্যে প্রভাত তখন উইংসের পাশেই দাঁড়িয়ে প্রম্পটার মণি চাটুয্যের সঙ্গে কথা বলছিল।

সে নিজের চোখে দেখেছে মায়াকে সিন থেকে বের হয়ে আসতে। এবং মায়ার বের হয়ে আসার কয়েক মুহূর্ত আগেই বের হয়ে আসে অশোক।

দুজনকেই প্রভাত বের হয়ে আসতে দেখেছে।

সকালবেলা থিয়েটারের বেয়ারা কালী তার জবানবন্দীতে বলেছিল, গত রাত্রে শো'র পর সে মায়াকে তার সাজঘরের মধ্যে ঢুকে যেতে দেখেছে এবং তার একটু পরেই সে দেখেছিল অশোক দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বের হয়ে গেল।

অশোকের সঙ্গে মায়া ছিল না।

অশোক একলাই গিয়েছে।

॥ দশ ॥

অলক্ত সাক্ষী দিতে এসে সম্পূর্ণ অন্য কথা বললে। অশোককে সেও স্টেজ থেকে বের হতে দেখেছে, কিন্তু সে বাইরে চলে যায়নি সঙ্গে সঙ্গে।

প্যাসেজে এসে সে প্যাসেজের দিককার মায়ার সাজঘরের যে দরজা সেই দরজায় সে অশোককে নক্ করতে দেখেছে। মায়া দরজা খুলে দেয়। দুজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। অলক্ত ব্যাপারটা দেখেছে -কারণ ঐ সময় সে প্যাসেজেই ছিল দাঁড়িয়ে।

তবে শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে সে বলতে পারে না কারণ অলক্ত একটু পরেই থিয়েটার থেকে বের হয়ে যায়।

রাত তখন কটা হবে? প্রশ্ন করে শম্ভু চাটুয্যে অলক্তকে।

বোধহয় সোয়া দশটার কাছাকাছি হবে।

তারপর?

তারপর আমি কিছু জানি না, সোজা বাড়ি চলে গিয়েছিলাম।

আপনার সঙ্গে মায়া দেবীর তো এককালে ভালই ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাই না?

ঘনিষ্ঠতা আবার কি ! এক ক্লাবে অভিনয় করতাম, এক তল্লাটে থাকতাম —কাজেই—

বলুন, থামলেন কেন ?

আলাপ-পরিচয় ছিল একটু।

আর কিছু নয় ? শম্ভু চাটুয্যে পুনরায় প্রশ্ন করে।

না !

কিন্তু আমি রিপোর্ট পেয়েছি, মায়া দেবীর সঙ্গে আপনার একটু বেশী ঘনিষ্ঠতাই ছিল।

একটুও না। ভুল শুনেছেন।

ভুল শুনেছি ! শম্ভু চাটুয্যে হাসল।

হ্যাঁ, ভুলই শুনেছেন। কারণ কোন রকম ঘনিষ্ঠতাই কখনও তার সঙ্গে আমার ছিল না।

ওঃ আচ্ছা। ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন। প্রদীপবাবুকে পাঠিয়ে দিন এবারে।

একটু পরে প্রদীপ এল।

প্রদীপ তার জবানবন্দীতে বললে, নাটকের শেষ দৃশ্যে তার অ্যাপিয়ারেন্স নেই, কাজেই বরাবর সে শো ভাঙবার আগেই থিয়েটার থেকে চলে যায়। সে কিছু জানে না, কিছু বলতে পারে না।

শম্ভু চাটুয্যে এবারে প্রশ্ন করে, মায়া দেবীর সঙ্গে আপনার তো বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল, শুনলাম ?

ঘনিষ্ঠতা বলতে আপনি কি বলতে চান বুঝতে পারছি না। তবে আলাপ পরিচয় তো অনেক দিন ধরেই ছিল ! শেষটায় কিছুদিন ধরে অবিশ্যি তার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে ওর সঙ্গে আমি কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

তা হঠাৎ এমন কি ঘটেছিল যে একেবারে কথা বলাও বন্ধ করেছিলেন ?

ক্ষমা করবেন, সেটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

অতঃপর অশোকের ডাক পড়ল।

অশোক বললে, মায়ার সঙ্গে ইদানীং তার একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল ঠিকই, কারণ মেয়েটির অপূর্ব প্রতিভার জন্যই অশোক মেয়েটিকে লাইক করত, মেয়েটিও তাকে পছন্দ করত। তার বেশী কিছু নয়।

গত রাত্রে শো'র পর আপনি নীচে প্যাসেজে দাঁড়িয়ে মায়া দেবীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন ?

কে বললে ? না তো !

কিন্তু একজন আপনাকে দেখছে।

হতেই পারে না। অ্যাবসার্ড। কাল শো'র পর মায়ার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। সোজা আমাকে স্টুডিওতে চলে যেতে হয়েছিল নাইট-সুটিং ছিল বলে।

থিয়েটার থেকে আপনি কখন বের হয়ে যান ?

ঠিক রাত নটা চল্লিশে। গেটে দারোয়ান আমাকে দেখেছে। গেটের বাইরে বেরুতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে যাই। সেই ট্যাক্সিতে করেই সোজা আমি স্টুডিওতে যাই।

স্টুডিওতে কখন পেঁছোন ?

বোধহয় সাড়ে দশটার পর। দশটা পঁয়তাল্লিশ হবে—

শ্যামবাজার থেকে টালীগঞ্জে যেতে রাত্রে ঐ সময় অতক্ষণ লাগল !

তা কখনও কখনও লাগে বৈকি ট্রাফিক জ্যাম থাকলে।

হুঁ। স্টুডিও থেকে কখন ফেরেন ?

সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসি।

কেন ?

কারণ সুটিং শেষ পর্যন্ত হয়নি।

ওঃ। তারপর কোথায় যান ?

গিয়েছিলাম এক জায়গায়।

কত রাত পর্যন্ত ছিলেন সেখানে ?

তা দুটো-আড়াইটে হবে।

আর কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাছ থেকেই বিশেষ কোন সংবাদ সংগ্রহ করা গেল না।

মায়াকে সাজঘরে অভিনয়ের পর ঢুকতে দেখা গিয়েছে বটে, কিন্তু বের হতে কেউ দেখেনি।

শম্ভু চাটুয্যের ধারণা যে মিথ্যা নয়, সেটা পরের দিনই সন্ধ্যায় জানা গেল।

পোস্টমর্টেমে রিপোর্ট পাওয়া গেল—গলা টিপে শ্বাসরোধ করে মায়ার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। সম্ভবতঃ কাপড় জাতীয় কিছু গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করা হয়েছিল।

এদিকে বৃহস্পতিবার থেকে আবার শো শুরু করল সৌরীন কুণ্ডু মায়ার জায়গায় একটি নতুন মেয়েকে নিয়ে।

নতুন করে অভিনয় শুরু হল। অশোক কিন্তু অভিনয় করল না।

অলক্ত তার পূর্বের রোলে ফিরে এলো।

হাউস মোটামুটি ভালই ছিল, কিন্তু দেখা গেল অভিনয় যেন জমছে না। কিছুতেই দানা বাঁধছে না। নাটকের সর্বত্র যেন মায়ার অভাব অনুভূত হয়। বোঝা যায় মায়াই ছিল নাটকের প্রাণ।

প্রদীপ, অলক্ত, অশোক—কেউ নাটকের প্রাণ ছিল না। আজ কথাটা মায়ার অভাবে যেন আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে সকলের কাছে।

আরো কয়েক রাত্রি পর পর অভিনয় হল নাটকের, কিন্তু দেখা গেল নাটকের সেল ক্রমশঃ যেন কমছে।

সৌরীন ঝানু লোক এ লাইনে। বুঝতে পারে এ নাটক এখন আর চলবে না। নতুন নাটকের প্রয়োজন।

অশোক ও প্রদীপকে বার বার সে সে-কথাই বলতে লাগল।

ওদিকে মায়ার হত্যার ব্যাপারটাও যেন কেমন চাপা পড়ে গেল।

।। এগারো ।।

এমন সময় থিয়েটারে আর একটা ব্যাপার ঘটলো।

মায়া মাসের কুড়ি দিন কাজ করেছিল। কুড়ি দিনের সেই মাহিনা মায়ার প্রাপ্য ছিল। একদিন সন্ধ্যায় মায়ার মা মৃন্ময়ী দেবী এল মাইনে নিতে সৌরীনের কাছ থেকে।

মৃন্ময়ী বলছিল সৌরীনকে, মেয়েটাকে আমার কে বা কারা অমন করে মেরে ফেলল আপনারা ধরতে পারলেন না?

পুলিস তো কম চেষ্টা করেনি, কিন্তু কিছুই তো হদিস করতে পারল না। সৌরীন বলে।

সে রকম করে চেষ্টা করলে কি আর পারত না!

আপনি জানেন না, সব রকম চেষ্টাই করা হয়েছে।

না, তাহলে হয়ত নিশ্চয় ধরা পড়ত কোন হত্যাকারী।

আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন মৃন্ময়ী দেবী? হঠাৎ সৌরীন প্রশ্ন করে।

আমার ধারণা—

বলুন, থামলেন কেন?

মানে বলছিলাম—আমি বোধহয় জানি কে মায়াকে হত্যা করেছে। হঠাৎ মৃন্ময়ী বলে।

সৌরীন কুণ্ডু কথাটা শুনে যেন চমকে ওঠে।

বলে, জানেন?

হ্যাঁ।

কে?

প্রশ্নটা করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় সৌরীন কুণ্ডু মায়ার মা'র মুখের দিকে।

মৃন্ময়ী তখন কতকগুলি চিঠি বের করে সৌরীনের হাতে দেয়।

কি এগুলো? চিঠি বলে মনে হচ্ছে!

হ্যাঁ। চিঠিগুলো মায়ার সুটকেশের মধ্যে ছিল—আমার ছোট মেয়ে রীণা তার দিদির সুটকেসের মধ্যে এই চিঠিগুলো পেয়েছিল। এগুলো পড়লে হয়ত বুঝতে পারবেন আপনিও ব্যাপারটা।

সৌরীন একটু কৌতূহলের সঙ্গেই যেন চিঠিগুলো হাতে নেয়।

বলে, তা এ চিঠিগুলো পুলিস যখন আপনাদের ওখানে গিয়েছিল তাকে

দেননি কেন ? তারপর একটু থেমে বলে, কবে এ চিঠিগুলো পেয়েছেন ?

মায়ার মৃত্যুর দু-তিনদিন পরেই।

সাদা খামে চিঠিগুলো ভরা। ডাকে আসেনি। হাতে হাতে বোধ হয় ছাড়া হয়েছে।

বেশী নয়, খান তিনেক চিঠি।

প্রত্যেক খামের উপরে লেখা—মায়া।

মৃন্ময়ী বললে প্রকৃতপক্ষে এই চিঠিগুলো আপনার হাতে দেবার জন্যই আমি এসেছি। চিঠিগুলো পড়ুন আপনি। তাহলেই আন্দাজ করতে পারবেন হয়ত সব কিছু।

সৌরীন একে একে তিনখানা চিঠিই পড়ে।

সংক্ষিপ্ত চিঠি। প্রত্যেক চিঠির সারবস্তু মোটামুটি এক। প্রত্যেক চিঠিতেই মায়াকে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে। এবং কোন চিঠিতেই নাম নেই তলায়। কেবল লেখা ইতি—

বোঝা যায় উড়ো চিঠি।

মায়া, যে পথে চলেছো সে পথ থেকে নিজের মঙ্গল চাও তো এখনো ফেরো। ও তোমাকে সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

দশ দিন তোমাকে সময় দিলাম—হয় তুমি ওর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করবে, নচেৎ জেনো ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে তোমাকে। ইতি—

আর একটা চিঠি—একই ভাবের লেখা—

মায়া, দশ দিন তোমাকে সময় দিয়েছিলাম, কিন্তু মনে হচ্ছে ব্যাপারটার কোন গুরুত্বই দাওনি।

আবার বলছি, ফেরো, নচেৎ প্রাণ দিয়ে শেষ পর্যন্ত তোমার এ বোকামির মাশুল দিতে হবে জেনো। ইতি—

শেষ চিঠি—

মায়া, শেষবারের মত তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—এখনও ফেরো। মরতে যদি না চাও তো এখনও ফেরো। ইতি—

পড়লেন চিঠিগুলো ? মৃন্ময়ী শুধায়।

পড়লাম। ঠিক আছে। এগুলো থাক আমার কাছে। আচ্ছা এ চিঠি কার লেখা বলে আপনার মনে হয় মৃন্ময়ী দেবী ?

মনে হচ্ছে অলক্তর—

অলক্তর !

হ্যাঁ।

কেন, তার হাতের লেখা কি আপনি চেনেন ?

না। তবে তার লেখা বলেই মনে হয়। কারণ যে রাত্রে ওই ঘটনা ঘটে, তার দিন পনের আগে অলক্তর সঙ্গে নাকি রাত্রে পথে ওর ভীষণ ঝগড়া হয়।

কে বলল সে কথা আপনাকে ?

কেন, মায়াই বলেছিল !

হুঁ। আচ্ছা আপনি যান।

মৃন্ময়ী দেবী বিদায় নেবার পরই সৌরীন কুণ্ডু শম্ভু চাটুয্যেকে থানায় ফোন করে এবং শম্ভু চাটুয্যে আসতেই তার হাতে চিঠিগুলো তুলে দেয় সৌরীন।

সেদিন থিয়েটার ছিল না।

শম্ভু চাটুয্যে চিঠিগুলো নিয়ে থানায় ফিরে এসে ঘরে ঢুকতেই দেখে কিরীটী তার ঘরে বসে আছে তারই অপেক্ষায় ঘরের বাতাস সিগারের গন্ধে ভরে উঠেছে।

কিরীটী শম্ভু চাটুয্যের বিশেষ পরিচিত। অনেক দিন থেকেই উভয়ের পরিচয়। ঘরে ঢুকেই তাকে দেখে সোল্লাসে শম্ভু চাটুয্যে বলে ওঠে, কিরীটী! কতক্ষণ রে ?

বেশ কিছুক্ষণ—

সত্যি ?

হ্যাঁ। একটা দরকার ছিল তোর কাছে।

সে তো বুঝতেই পারছি, নচেৎ কি আর মহাপ্রভুর পদার্পণ ঘটেছে এখানে। তা এতদিন দেখিনি—কলকাতায় ছিলি না নাকি ?

না, মাদ্রাজ গিয়েছিলাম।

মাদ্রাজে হঠাৎ ?

এই একটু ঘুরতে। তা শোন্, তোর কাছে একটা সংবাদের জন্য এসেছি।

কি সংবাদ ?

বছর দেড়েক আগে, মনে আছে তোর নিশ্চয়ই, ভূপেন বোস অ্যাভিন্যুতে একটা ফ্ল্যাটবাড়ির দোতলার একটা ফ্ল্যাটে অবিনাশলিঙ্গম নামে এক দক্ষিণী ভদ্রলোককে তার ফ্ল্যাটের ঘরের মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে তার তরুণী ভার্যাটি নিখোঁজ হয়ে যায় !

হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি। শেষ পর্যন্ত কেসটা চাপা পড়ে যায়। সেই মেয়েটিকেও পাওয়া যায় না এবং ভদ্রলোকের মৃত্যুর ব্যাপারটারও কোন হদিস পাওয়া যায়নি। তা হঠাৎ এতদিন পরে আবার সে কেসটা সম্পর্কে—

চুরোটটা ইতিমধ্যে নিভে গিয়েছিল, সেটায় নতুন করে অগ্নিসংযোগ করতে করতে কিরীটী বলে, সরকার পক্ষ থেকে সেই কেসটা গত মাসে আমার স্কন্ধে আরোপ করা হয়েছে। যাক শোন্, যে জন্য আমি তোর কাছে এসেছি—তোর তো মায়ামঞ্চ থিয়েটারের মালিকের সঙ্গে যথেষ্ট দহরম মহরম আছে—

হ্যাঁ, তা আছে। সেখানেই তো গিয়েছিলাম।

কেন, থিয়েটার দেখতে ?

না। সে এক ব্যাপার। থিয়েটারের এক অভিনেত্রীর খুনের ব্যাপার নিয়ে।

কি রকম ?

শম্ভু চাটুয্যে তখন সংক্ষেপে মায়ার মৃত্যুর ব্যাপারটা বিবৃত করে কিরীটীর কাছে। চুরোট টানতে টানতে সব শুনল কিরীটী। তারপর বললে, খুব একটা জটিল ব্যাপার বলে তো মনে হচ্ছে না। সে যাক। তাহলে তো তোর অভিনেতা অশোকের সঙ্গে পরিচয় আছে ?

তা আছে।

কি রকম পরিচয় রে ?

বেশ ভালই।

হুঁ। তাহলে অশোকের সঙ্গে মায়ার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল ?

সেই রকমই তো সংবাদে প্রকাশ।

কিরীটী আর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে ধূমপান করতে থাকে। একটু যেন অন্যমনস্ক ভাব।

আচ্ছা সত্যিই তুই কি মনে করিস কিরীটী, ব্যাপারটা খুব কঠিন নয় ?

সব শুনে তো তাই মনে হচ্ছে। তারপরই একটু থেমে বলে, সে চিঠিগুলো এনেছিস ?

হ্যাঁ।

দেখি !

শম্ভু চিঠিগুলো কিরীটীর হাতে তুলে দিল। কিরীটী চিঠিগুলো একে একে পড়ল।

॥ বারো ॥

একসময় পড়া শেষ হলে কিরীটী শম্ভু চাটুয্যের মুখের দিকে তাকাল।

বুঝতে পারলি কিছু ? শম্ভু চাটুয্যে প্রশ্ন করে।

কি ?

চিঠিগুলো অলক্ত লিখেছে, তাই না ?

তা যদি লিখেও থাকে তো তুই সেটা প্রমাণ করতে পারবি না শম্ভু।

কেন ?

কারণ তার হাতের লেখার সঙ্গে মিলবে না।

তার মানে ?

তার মানে ওই চিঠিগুলোর দ্বারা আমার মনে হচ্ছে—

কি ?

হত্যাকারী তার অপরাধটা অন্যের ঘাড়ে চাপাবার একটা ছেলেমানুষি চেষ্টা করছে।

তাই তোর মনে হচ্ছে ?

শুধু তাই না, মনে হচ্ছে তোর সব কথা শুনে—আগাগোড়া ব্যাপারটাই যেন একটা অ্যামেচারিস্ ব্যাপার !

অ্যামেচারিস্ ?

তাই তো মনে হচ্ছে। আর তুই তো একটু ভাল করে চিন্তা করলেই বুঝতে পারতিস, ব্যাপারটার মধ্যে খুব বেশী একটা কিছু জটিলতা হয়ত নেই।

কিন্তু আমি তো ভাই এখন পর্যন্ত ভেবে ভেবে কোন কূলকিনারাই করতে পারিনি।

হয়ত তুই যে লাইন ধরে ভেবেছিস আসলে সে লাইনটা ভুল! গোড়াতেই গলদ! কিরীটী চুরোটে মধ্যে মধ্যে টান দিতে দিতে কথাগুলো বলছিল। বসবার ভঙ্গিটা তার শিথিল আয়েসী।

তুই কি বলতে চাস কিরীটী, মায়ার হত্যার ব্যাপারটা যেভাবে আমি বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি—সেটা ভুল ?

তাই যেন মনে হচ্ছে।

কেন ?

প্রথমতঃ ভেবে দেখ্. হত্যাকাণ্ডটা কোথায় ঘটেছিল—বা কিভাবে ঘটতে পারে ?

নিশ্চয়ই থিয়েটারের মধ্যেই!

হ্যাঁ, কারণ মৃতদেহ থিয়েটারের সাজঘরের 'মধ্যেই' পরের দিন আবিষ্কৃত হয়েছে; আর সেই কারণেই সর্বাগ্রে দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যায় অর্থাৎ শো'র কয়েক ঘণ্টা,—তোর খোঁজ নেওয়া উচিৎ ছিল। মায়ার কাছাকাছি কে কে এসেছিল, সেদিন কার কার সঙ্গে সন্ধ্যায় তার দেখা হয়েছিল, তারা কে কে এবং তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে মায়ার কেমন ঘনিষ্ঠতা বা পরিচয় ছিল, তাদের সঙ্গে কি কি কথা হয়েছিল।

তা মোটামুটি যা জানতে পেরেছি সবই তো তোকে বললাম।

হ্যাঁ বলেছিস, তবে তার মধ্যে অনেক জায়গায় অনেক ফাঁক থেকে গিয়েছে।

ফাঁক!

হ্যাঁ। তারপর তুই বললি ইদানীং অশোকের সঙ্গে মায়ার আলাপ হবার পর থেকে শো ভাঙলে ওরা দুজনে একসঙ্গেই থিয়েটার থেকে বের হয়ে যেত—দুর্ঘটনার রাত্রে কেন গেল না ? অশোক ঠিক কখন বের হয়ে গিয়েছিল শো ভাঙবার পর ?

অশোক সে রাত্রে থিয়েটার ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গেই বের হয়ে যায় তার নাইট-সুটিং ছিল বলে।

সুটিং সত্যিই সে করেছিল কি ?

তা অবিশ্যি জিজ্ঞাসা করিনি।

তারপর ধর্, মায়ার মৃতদেহ পরের দিন সকালে আবিষ্কৃত হবার পর দেখা যায়, আগের শো'র কাপড়জামাই তখনো তার পরিধানে ছিল। তাহলে মায়া

সে শো ভাঙবার পর শো'র জামাকাপড় যেমন বদলাবার অবকাশ পায়নি তেমনি থিয়েটার থেকে আদৌ বেয় হয়নি শো ভাঙবার পরও—

তাই তো মনে হয়।

কেবল মনে হলেই তো হবে না। সে যে কাপড় না বদলালেও বা বদলাবার অবকাশ না পেলেও সে যে আদৌ থিয়েটার থেকে শো ভাঙবার পর বের হয়নি তারও সাক্ষ্য-প্রমাণাদির প্রয়োজন। নচেৎ—

কি ?

আসলে হত্যাকাণ্ডটা কোথায় সংঘটিত হয়েছিল সেটাই গোলমাল হয়ে যাবে।

কিন্তু ওর দেহে যখন তখনও আগের রাত্রের শো'র জামা-কাপড়ই ছিল তখন তো স্বতঃসিদ্ধভাবে মেনে নেওয়া যেতে পারে সাজঘরের মধ্যে থিয়েটারের ব্যাপারটা ঘটেছে।

না।

কেন ?

হত্যাকারীর অপরাধটা অন্যের ঘাড়ে চাপানোর একটা প্রয়াসও হতে পারে ব্যাপারটা।

তাই তোর মনে হয় ?

কি মনে হয় না সেটা এখন অবান্তর। তার আগে তুই একটা কাজ করতে পারিস ?

কি বল্ ?

কাল তো থিয়েটার আছে ?

হ্যাঁ।

কাল একবার থিয়েটারে যাব চল্। ওদের কয়েকজনকে আমি কিছু কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

বেশ তো। কিন্তু কাকে কাকে প্রশ্ন করবি বল্ !

ওই অলক্ত, প্রদীপ, অশোক, জমাদার রূপলাল, দুজন দারোয়ান যারা বাইরে থাকে—বেয়ারা কালী আর মেয়েদের মেকআপ রুমে যে মেয়েটি ওদের সাহায্য করে—কি যেন তার নাম ?

লাবণ্য।

হ্যাঁ! তাকে এবং মায়ার পাশের ঘরে যে সব অভিনেত্রীরা বসত তাদের। তাহলে আজ আমি উঠি। কাল আসব। ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় এখান থেকে থিয়েটারে যাব। থিয়েটারের সেই সাজঘরে বসেই ওদের প্রশ্ন করব। ব্যবস্থাটা তুই করতে পারবি তো ?

কেন পারব না, খুব পারব।

॥ তেরো ॥

পরের দিন থিয়েটার।

শম্ভু চাটুয্যে আগেই ফোনে সৌরীন কুণ্ডুকে সব কথা বলে রেখেছিল।

সৌরীন বলেছিল সে সব ব্যবস্থা করে রাখবে।

রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ শম্ভু চাটুয্যে ও কিরীটী মায়ামঞ্চে এসে হাজির হল।

তখন প্রথম অঙ্ক শেষ হয়ে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক চলছে।

সৌরীন কুণ্ডু তার নিজের ঘরেই বসে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

শম্ভু চাটুয্যে কিরীটীর পরিচয় দেয়।

কিন্তু তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, কারণ কিরীটীর নামটা সৌরীন কুণ্ডুর অজানা নয়। কিরীটীর নামের সঙ্গে তার পূর্বে পরিচয় ছিল সংবাদ-পত্র মারফত।

শম্ভু চাটুয্যে জিজ্ঞাসা করে, অভিনেতা অভিনেত্রীদের সব বলে রেখেছেন তো?

হ্যাঁ। কিন্তু কোথায় বসে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন উনি?

কিরীটীই জবাব দেয়, মায়া দেবীর সাজঘরে বসে।

আসলে গত সন্ধ্যায় শম্ভু চাটুয্যের মুখে মায়ার মৃত্যুকাহিনী শুনতে শুনতে এতটুকু ও আকৃষ্ট হয়নি কিরীটী। কিন্তু শম্ভু কোন কূলকিনারা করতে পারেনি শুনে কৌতূহল জাগে তার। বিশেষ করে ওই থিয়েটারে অশোকও আছে বলে কাল মায়ার মৃত্যুর ব্যাপারটাও তাকে আরো বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত করে তোলে এবং মায়ার মৃত্যুর ব্যাপারটা চিন্তা করতে করতেই যে সব লোক-গুলো মায়ার থিয়েটার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল তাদের নিয়ে একটু নাড়া-চাড়া করবার ইচ্ছা হয়।

তাছাড়া আরো একটা কারণ ছিল।

অশোকের সঙ্গে সে পরিচিত হতে চায়। সেটারও একটা সুযোগ সে পেয়ে যাবে থিয়েটারে গেলে।

তাই কিরীটী শম্ভু চাটুয্যেকে অনুরোধ জানায় পরের দিন থিয়েটারে তাকে একটিবার নিয়ে যাবার জন্য। তাতে করে দু'কাজই হবে—শম্ভুর ব্যাপারটার সঙ্গে মায়ার মৃত্যুর ব্যাপারটাও নেড়েচেড়ে দেখা যাবে, সেই সঙ্গে অশোকের সঙ্গেও হয়ত পরিচয়ের একটু সুযোগ সে পেয়ে যাবে।

ক্রমে একসময় থিয়েটার শেষ হল।

ইতিমধ্যে কুণ্ডুই ভিতরে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। যে সব অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে কিরীটী কথা বলতে চায় তাদের তো আগেই সৌরীন বলে রেখেছিল।

শো ভাঙবার পর একে একে সব দর্শকরা চলে গেল। প্রেক্ষাগৃহ খালি

হয়ে গেল। যাদের প্রয়োজন নেই তারাও চলে গেল।

কেবল সাজঘরের সামনে অপেক্ষা করতে থাকে অশোক, প্রদীপ, অলক্ত, মায়ার ঘরের পাশে যে আরও দুটি মেয়ে বসত—রঞ্জনা ও সুপ্রিয়া, এছাড়া লাবণ্য, দারোয়ান মহাবীর সিং, রামপ্রসাদ, বেয়ারা কালী এবং জমাদার রূপলাল। তারাও একটু দূরে অপেক্ষা করতে থাকে।

সাজঘরে এসে সকলে প্রবেশ করল।

কিরীটী, শম্ভু চাটুয্যে ও সৌরীন।

প্রথমেই ভাল করে ঘরটা—যে ঘরের মধ্যে মায়ার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছিল, ভাল করে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে কিরীটী।

তারপর প্যাসেজটা সংলগ্ন বাথরুমটা পরীক্ষা করে দেখল।

জেনে নিল মৃতদেহ কোথায় ছিল।

প্রথমেই কিরীটী বললে দারোয়ান দুজনকে ডাকতে।

রামপ্রসাদ ও মহাবীর সিং। ওদের একজন লবিতে ও অন্যজন গেটের সামনে থিয়েটারের শো শুরু হওয়া থেকে ভাঙার পরও অনেকক্ষণ ছিল। তাদের ডিউটিই ঐ ভাবে থাকা। নজর রাখা থিয়েটারে কে আসে—কে যায়—সর্বক্ষণ।

প্রথমেই ডাকা হলো দারোয়ান রামপ্রসাদকে।

দারোয়ান রামপ্রসাদ অনেক দিন থেকে সৌরীন কুণ্ডুর কাছে আছে। একটা সাপ্তাহিক সিনেমা থিয়েটার সংক্রান্ত কাগজ ছিল একসময় সৌরীনের। সেই সময় থেকেই রামপ্রসাদ ওর কাছে কাজ করছে। এবং সৌরীন কুণ্ডু থিয়েটারটা লিজ্ নেবার পর থিয়েটারেই দারোয়ানের কাজ করছে কয়েক বছর ধরে।

সৌরীন কুণ্ডু আগেই বলেছিল, রামপ্রসাদ লোকটা বিশ্বাসী ও সৎ-প্রকৃতির।

কিরীটী রামপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে. মায়া দেবীকে তো তুমি অনেক দিনই দেখছ রামপ্রসাদ—ভাল করেই তাকে চিনতে, তাই না?

জী।

তবে সে রাত্রে যাকে থিয়েটার থেকে বের হয়ে যেতে দেখেছিলে সে মায়া দেবী কি না ঠিক করে বলতে পারছ না কেন? লবিতেই তো তুমি ছিলে আর লবির সামনে দিয়ে সে বের হয়ে গিয়েছিল যখন—

আজ্ঞে অনেকেই তো তখন থিয়েটার ভাঙার পর বের হয়ে যাচ্ছিল, তাই ঠিক ভাল করে নজর করতে পারিনি।

তা নয় রামপ্রসাদ, কিরীটী বলে, যাকে তুমি দেখেছ সে হয়ত আদৌ মায়া দেবী ছিল না—

হতে পারে বাবুজী।

অশোকবাবুকে বের হয়ে যেতে দেখনি?

না।

অলক্তবাবুকে ?

না।

আচ্ছা রামপ্রসাদ, সবাই যখন সে রাত্রে থিয়েটার ভাঙার পর চলে গেল, তারপর তুমি কি করছিলে ?

পূর্ব দিকের প্যাসেজে যে ছোট ঘরটা আছে সেখানেই আমি থাকি—সেখানেই চলে গিয়েছিলাম। তারপর একসময় খাওয়াদাওয়ার পর শুয়ে পড়ি।

থিয়েটারের ভিতরে আর ঢোকনি ?

না।

হুঁ। আচ্ছা, সে রাত্রে কেউ মায়াদিদিমণির সঙ্গে দেখা করতে আসেনি ?

না। কেউ এলে আমাকে না জানিয়ে ভিতরে যেতে পারে না।

হুঁ। আচ্ছা তুমি যাও।

রামপ্রসাদের পর থিয়েটারের দ্বিতীয় দারোয়ান মহাবীর সিংকে ডাকা হল। মধ্যবয়সী লোকটা।

তোমার নাম মহাবীর সিং ? কিরীটী প্রশ্ন করে মহাবীরের মুখের দিকে চেয়ে।

জী।

কত দিন এখানে কাজ করছ ?

এক সাল হবে।

তাহলে থিয়েটারের সকলকেই জান, সকলকেই চিনতে তুমি ?

জী।

সে রাত্রে তুমি শো ভাঙার পর কোথায় ছিলে ?

জী গেটের সামনে।

মায়া দেবীকে তুমি বের হয়ে যেতে দেখেছিলে ?

না।

অশোকবাবুকে ?

না।

অলক্তবাবুকে ?

দেখেছি।

কখন ?

শো ভাঙার আধঘণ্টাটাক পর হবে। তখন ভিড়টা অনেক পাতলা হয়ে এসেছে।

মহাবীর ?

জী।

অলক্তবাবুর সঙ্গে আর কাউকে তুমি যেতে দেখেছ, মানে থিয়েটারের আর কাউকে ?

না তো। অলক্তবাবু একাই ছিলেন। তবে—

কি ? বল, থামলে কেন ?

অলক্তবাবুকে দেখে মনে হয়েছিল যেন—

কি ?

অলক্তবাবু নেশা করেছেন।

কেন ?

অলক্তবাবু টলছিলেন। ভাল করে চলতে পারছিলেন না।

ঠিক আছে। তুমি যেতে পার। কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বললে।

মহাবীর সিং অতঃপর ঘর থেকে বের হয়ে গেল !

কিরীটী সৌরীন কুণ্ডুর মুখের দিকে তাকাল, সৌরীনবাবু !

বলুন।

অলক্তবাবু কি নেশা করেন নাকি ?

কখনও তো চোখে পড়েনি, তাছাড়া আমার কড়া নির্দেশ আছে—শো চলাকালে আগে বা পরে মঞ্চে কেউ ড্রিংক করতে পারবে না।

সবাই কি সে নির্দেশ আপনার মেনে চলেন ?

নিশ্চয়ই।

অশোকবাবু ?

অশোক !

হ্যাঁ। শুনেছি তিনি নাকি খুব বেশী ড্রিংক করেন ?

করে তো আমিও জানি, তবে শো চলার সময় সে কখনও ড্রিংক করে না।

কিরীটী মৃদু হাসল।

সৌরীন আর কোন কথা বলে না। চুপ করে থাকে।

শম্ভু এবার জিজ্ঞাসা করে, এবার কাকে ডাকব ?

রূপলালকে ডাক।

সাজঘরের দরজায় যে কনস্টেবলটি দাঁড়িয়ে ছিল তাকে বললে রূপলালকে ডাকবার জন্য।

রূপলাল এ থিয়েটারে কতদিন আছে সৌরীনবাবু ?

বছর দুই হবে।

লোকটা নেশাভাঙ করে ?

শুনেছি করে।

এখানে রূপলালের ডিউটি কি ? কি করতে হয় তাকে ?

রূপলালের ডিউটি শো'র সময় সর্বক্ষণ ভিতরে থাকার। তারপর শো ভাঙলে টুকটাক সব কাজ সেরে স্টেজঘরের আলো নিভিয়ে স্টেজের দরজায় তালা লাগানো।

স্টেজঘরের চাবি তাহলে রূপলালের কাছেই থাকে ?

হ্যাঁ।

থিয়েটারে থাকে নিশ্চয়ই রূপলাল ?

হ্যাঁ। স্টেজের পিছনে ঘর আছে, সেই ঘরেই থাকে রূপলাল।

চোদ্দ

রূপলাল এসে ঘরে ঢুকল।

ষণ্ডা পেশীবহুল চেহারা। বয়েস চল্লিশের মধ্যেই বলে মনে হয়। পরনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামাকাপড়। মাথায় চকচকে তেড়ি। ছোট ছোট দুটি চোখ বেশ রক্তিম। চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় ধূর্ত প্রকৃতির লোক।

কিরীটীর হঠাৎ মনে হয়, রূপলালের মুখটা যেন তার চেনা—কবে কোথায় যেন দেখেছে। কিন্তু সঠিক মনে করতে পারে না, মনের মধ্যে হাতড়াতে থাকে কোথায় দেখেছে রূপলালকে সে, কোথায় !

তোমার নাম রূপলাল ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

জী।

দেশ কোথায় তোমার ?

জী ছাপরা জিলা।

এখানে কত মাইনে পাও ?

জী ?

মাইনে কত পাও ?

আশি রুপেয়া।

রূপলাল ?

জী !

সে রাত্রে স্টেজের দরজায় তালা দিয়েছিলে ?

জরুর।

স্টেজে যখন তালা লাগাও, তখন স্টেজে কাউকে দেখেছিলে ?

নেহি।

রূপলাল ?

জী !

সে রাত্রে তুমি কতটা সরাব পিয়েছিলে ?

এক বুঁদও খাইনি হুজুর—

ঝুট মাত্ বোল।

বিশোয়াস করিয়ে সাব্—ম্যায় নে—

আবার ঝুট বলছ ? তুমি খেয়েছিলে। আমি জানি।

রূপলাল আচমকা যেন কেমন থতমত খেয়ে যায়। চুপ করে থাকে।

কি, খাওনি ? সাচ্ সাচ্ বাতাও—

জী। খুব সামান্য—

কতটুকু ?

খুব সামান্য।

হুঁ। স্টেজে তালা লাগাবার আগে তো সব আলো নিভিয়ে দিতে, তাই না ?

জী।

সাজঘরের আলো জ্বলছে কিনা দেখতে না ?

ওহি তো হামার কাম সাব্—

সেদিন রাত্রে শো শেষ হবার পর তাহলে তুমি সব আলো নিভিয়ে সাজঘরে চাবি দিয়ে দিয়েছিলে ? রূপলালকে প্রশ্ন করে কিরীটী।

জী।

এ ঘরের আলোও নিভিয়েছিলে ?

জী হাঁ।

না, নেভাওনি। তুমি আবার ঝুট বলছ।

হঠাৎ কিরীটীর প্রতিবাদে রূপলাল যেন কেমন থতমত খেয়ে যায়। বোকার মত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ফ্যালফ্যাল করে।

তুমি এ ঘরে ঢোকইনি, তাই না রূপলাল ?

এ ঘরের আলোটা নেভানোই ছিল। ঘর অন্ধকার ছিল তাই—

এ ঘরে ঢোকনি তুমি, তাই তো ?

না, আমি ঢুকিনি !

অতঃপর রূপলালকে বিদায় দিল কিরীটী।

কিরীটী এবারে শম্ভু চাটুয্যের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, তোমার মুখে কাল সব শুনে ঐ রকমই আমি একটা মনে মনে ধারণা করেছিলাম শম্ভু। কারণ আমার বিশ্বাস, সে রাত্রে শেষ সিন করে মায়া দেবী এই ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আততায়ী অতর্কিতে একটা কাপড় বা রুমাল জাতীয় কিছু দিয়ে পিছন থেকে তাকে জাপটে ধরে তার মুখ বন্ধ করে দেয়, তারপর—

কি—কি তারপর ? শম্ভু শুধায়।

তারপর আততায়ী তাকে স্ট্রাঙ্গল্ করে—মানে শ্বাসরোধ করে মায়াদেবীকে হত্যা করে। এবং কাজ শেষ করে বাথরুমের দরজা দিয়ে বের হয়ে যাবার আগে এ ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যায়।

তাহলে তুমি বলতে চাও কিরীটী—

হ্যাঁ, আততায়ী এই ঘরের মধ্যে আগে থাকতেই ওৎ পেতে ছিল।

কিন্তু কোথা দিয়ে এল আততায়ী এ ঘরে ?

সম্ভবতঃ বাথরুমের দরজা-পথেই।

কিন্তু—

কিংবা এমনও হতে পারে, আততায়ী কোন স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে স্টেজের ভিতর দিয়েই, সকলের চোখের সামনে দিয়ে এক ফাঁকে এই ঘরে এসে ঢুকে

আত্মগোপন করে ছিল। এবং সম্ভবতঃ তখন মঞ্চে শেষ সিন অভিনীত হচ্ছে। রূপলাল এবং অনেকেই হয়ত তাকে দেখেছে আসতে, কিন্তু স্ত্রীলোকের বেশ থাকায় কেউ হয়ত দেখলেও তাকে সন্দেহ করেনি।

তাহলে তুমি বলতে চাও সে রাত্রে মায়া দেবীর হত্যাকারী কোন স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে আগে থাকতেই বাথরুমের দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে ওৎ পেতে ছিল? শম্ভু চাটুয্যে প্রশ্ন করে।

সেই রকমই যে ঘটেছিল তা আমি বলিনি, তবে তেমনটা ঘটে থাকতেও পারে।

কিরীটী বলে।

তাহলে ব্যাপারটা pre-arranged?

মনে হয় তাই।

শম্ভু চাটুয্যেকে কেমন অন্যমনস্ক মনে হয় অতঃপর।

কিরীটী বলে, সে রাতটা ছিল থিয়েটারের স্পেশাল নাইট। শততম রজনী-উৎসব। অন্যান্য রাত্রির চাইতে সে রাত্রে সবাই ব্যস্ত থাকবে—উৎসবের ব্যাপার—সেই জন্য হয়ত হত্যাকারী বিশেষ করে ঐ রাতটিই বেছে নিয়েছিল তার কাজ হাসিল করবার জন্য। তাছাড়া আর একটা কথা ভুলে যেও না—

কি?

শম্ভু চাটুয্যে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

মায়া দেবীকে সত্যি সত্যি কেউ সেই রাত্রে শো'র পর থিয়েটার থেকে বের হয়ে যেতেও দেখেনি।

কিন্তু রামপ্রসাদ—

সেও হলফ করে বলতে পারেনি কথাটা। এখন কথা হচ্ছে—

কি?

কেউ সে রাত্রে মায়া দেবীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কিনা—

রামপ্রসাদের অজ্ঞাতে তো সেটা হতে পারে না, রামপ্রসাদই তাই বলে গেল।

কিন্তু রামপ্রসাদের অজ্ঞাতেও তো কেউ যেতে পারে স্টেজের ভিতরে!

তার মানে?

মানে যদি কোন স্ত্রীলোক হয় যাক্ গে, এবারে তোমাদের অশোকবাবুকে ডাক।

সাজঘরের সামনেই সরু জায়গাটায় সব অভিনেতা অভিনেত্রীরা ভিড় করে ছিল, তাদের মধ্যে অশোকও ছিল।

শম্ভু চাটুয্যে অশোককে ঘরে ডেকে নিয়ে এল।

॥ পনেরো ॥

বয়েস হলে কি হবে এবং রগের দু'পাশের চুলে রূপালী ছোঁওয়া লাগলে কি হবে, এখনও চেহারার মধ্যে রীতিমত একটা জৌলুস আছে যেন। সুন্দর, সুগঠিত

সুশ্রী চেহারা।

বসুন অশোকবাবু। কিরীটীই আহ্বান জানাল।

আপনি? অশোক প্রশ্ন করে, আপনাকে কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে?

দেখে থাকবেন হয়ত।

শম্ভু চাটুয্যেই তখন বলে, কিরীটী রায়।

অশোক সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

বসুন অশোকবাবু। আপনাকে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। কিরীটী বলে।

অশোক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল!

অশোকবাবু!

বলুন?

সে রাত্রে আপনি ঠিক কখন থিয়েটার থেকে যান?

বলতে পারেন শো ভাঙার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

শুনলাম আপনার সে রাত্রে নাইট-সুটিং ছিল?

হ্যাঁ।

সুটিং হয়েছিল সে রাত্রে?

না।

বাড়িতে ফিরে আসেন কখন তাহলে স্টুডিও থেকে?

প্রায় সোয়া দুটো হবে।

শুনেছি ইদানীং মায়া দেবীর যেদিন শো থাকত, শো'র পর তিনি আপনার সঙ্গেই যেতেন?

হ্যাঁ। ওকে নামিয়ে দিয়ে যেতাম মধ্যে মধ্যে।

তাহলে রোজ যেতেন না?

না।

সে রাত্রে কি মায়া দেবী জানতেন যে আপনার নাইট-সুটিং আছে?

হ্যাঁ। আগে থাকতেই জানিয়ে দিয়েছিলাম শিবুকে দিয়ে।

জানিয়ে দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

আচ্ছা শো ভাঙার পরই আপনি সে রাত্রে চলে গিয়েছিলেন বলছেন—রাত তখন আন্দাজ কটা হবে?

সে রাত্রে শো ভাঙে নটা চল্লিশে, দশ মিনিটের মধ্যেই আমি চলে যাই।

আপনি যখন থিয়েটার থেকে বের হয়ে যান, কেউ আপনাকে দেখেছিল?

কেন, সৌরীনই তো জানে সে কথা। বেরুবার সময় প্যাসেজে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়।

আচ্ছা অশোকবাবু, স্টুডিও থেকে কিসে আপনি ফেরেন?

স্টুডিওতে আমি যাইনি।

যানইনি ?

না। থিয়েটার থেকে বেরুতেই প্রোডাকশনের একটি ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। সে সুটিং হবে না, ক্যানসেলড্ হয়ে গিয়েছে, সেই কথাটাই আমাকে বলতে আসছিল। তার মুখে সুটিং হবে না শুনে আর স্টুডিতে যাইনি।

কোথায় গিয়েছিলেন তাহলে থিয়েটার থেকে বের হয়ে সে রাত্রে ?

ক্ষমা করবেন—সেটা একান্ত আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

তার মানে কোথায় সে রাত্রে গিয়েছিলেন, আপনি বলতে চান না !

যা মনে করেন।

শুনেছি ইদানীং মায়া দেবীর সঙ্গে আপনার বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—

তা যদি হয়েই থাকে তো তাতে কি ?

না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

ঘনিষ্ঠতা বলতে কি আপনি মীন্ করছেন জানি না—তবে মেয়েটিকে আমার ভাল লাগত।

মধ্যে মধ্যে রাত্রে শো'র পর মায়া দেবী আপনার ফ্ল্যাটে যেতেন ?

যেত।

মধ্যে মধ্যে রাতও কাটাতেন মায়া দেবী আপনার ফ্ল্যাটে ?

মিথ্যে কথা।

মিথ্যে কথা ?

হ্যাঁ, সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। মাঝে মাঝে রাত্রে আমার সঙ্গে যেত, তবে কখনও সেখানে কোনদিন রাত্রে থাকেনি।

ওঃ, আমি যেন শুনেছিলাম মায়া দেবী মধ্যে মধ্যে রাত্রে আপনার ফ্ল্যাটে রাত কাটাতেন।

॥ ষোলো ॥

অতঃপর কিরীটী শম্ভু চাটুয্যেকে কি যেন ইঙ্গিত করে।

শম্ভু একটা সাদা কাগজ ও একটা কলম অশোকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, অশোকবাবু, যা খুশি আপনার দু'লাইন এই কাগজটায় লিখে নামটা সই করে দিন।

অশোক ভ্রূ কুঞ্চিত করে শম্ভু চাটুয্যের দিকে তাকায়।

কই, লিখুন !

কিন্তু কেন বলুন তো ?

লিখুন না—পরে বলছি। কিরীটী এবার বলে।

অশোক মুহূর্তকাল যেন কি ভাবে—যেন একটু ইতস্ততঃ করে, তারপর কাগজটা টেনে নিয়ে নিজের পকেট থেকেই ঝর্ণা কলমটা বের করে খস্ খস্ করে দুটো লাইন লিখে নাম সই করে কাগজটা শম্ভু চাটুয্যের হাতে ফিরিয়ে

দিল। নিন! কিন্তু এবার জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, এটার কি প্রয়োজন ছিল?

কিরীটীর ইঙ্গিতে আবার শম্ভু চাটুয্যে মায়ার মা'র দেওয়া একখানা চিঠি পকেট থেকে বের করে অশোকের দিকে এগিয়ে দেয়।

কি এটা?

একটা চিঠি।

চিঠি!

হ্যাঁ। পড়ে দেখুন তো—এই চিঠির হাতের লেখাটা আপনি চেনেন কিনা।

অশোক শম্ভু চাটুয্যের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়ল।

এ তো দেখছি মায়াকে লেখা চিঠি! অশোক বলে।

কিরীটী বলে, হ্যাঁ। হাতের লেখাটা চিনতে পারছেন?

না।

কে মায়া দেবীকে ঐ ধরনের চিঠি লিখতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

বলতে পারব না।

মায়ার কোন শত্রু ছিল বলে আপনার মনে হয়?

কেমন করে জানব?

প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী?

কার?

ধরুন আপনারই।

ননসেন্স! কি আবোল-তাবোল সব বকছেন? আমাদের মধ্যে সেরকম কোন relationই ছিল না কোনদিন।

অশোকবাবু, আপনি শকুন্তলা দেবী নামে কাউকে চিনতেন?

হঠাৎ যেন মনে হল অশোক একটু থতমত খেল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে দৃঢ় গলায় বলে, না। ও নাম কখনও পূর্বে শুনেছি বলেও মনে পড়ছে না।

ভদ্রমহিলা দক্ষিণী, তাঁর স্বামীর নাম ছিল অবিনাশলিঙ্গম—একটা বিলিতী কোম্পানীতে পাবলিসিটি অফিসার ছিলেন!

না। ও নামে কাউকে কখনও আমি চিনতাম না।

স্বামী-স্ত্রী ওঁরা ভূপেন বোস অ্যাভিনুর দোতলার একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতেন, মনে করবার চেষ্টা করুন। আমি জানি আপনি তাঁদের চিনতেন, তাঁদের ফ্ল্যাটে আপনার যাতায়াতও ছিল। শুধু তাই না, আপনার ও শকুন্তলা দেবীর একটা ফটোও—

ফটো?

হ্যাঁ। ফটোটা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে পাওয়া যায়।

অশোক চুপ করে থাকে।

কি, মনে পড়ছে এবার বোধহয় আপনার অশোকবাবু ?

অ্যাঁ—হ্যাঁ, মানে তেমন কিছু না—সামান্য আলাপ ছিল, এক-আধবার গিয়েছি তাই মনে পড়ছিল না।

যাক, শেষ পর্যন্ত তাহলে আপনার মনে পড়েছে ভদ্রমহিলাকে ! কিন্তু তাঁর ফটোটা দেখে মনে হয় না যে সামান্য আলাপ মাত্র ছিল আপনাদের মধ্যে !

মানে ?

মানে পুলিসের তাই ধারণা।

পুলিস !

হ্যাঁ। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, ওই শকুন্তলাকে একদিন ছোরাবিদ্ধ মৃত অবস্থায় তাঁর ফ্ল্যাটের বেডরুমে পাওয়া যায়। অবিনাশলিঙ্গম সে সময় টুরে কলকাতার বাইরে ছিলেন। মনে পড়েছে নিশ্চয়ই সব কথা আপনার ?

হ্যাঁ—তবে—

বলুন ?

সে-সময়ই তো পুলিসকে আমি বলেছিলাম, শকুন্তলাদের সঙ্গে সামান্য পরিচয় আমার ছিল তবে তার সঙ্গে তেমন কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না কোন দিনই।

কিন্তু পুলিস আপনার সে কথা বিশ্বাস করেনি।

না বিশ্বাস করলে আমি আর কি করতে পারি !

না—তাই বলছি, তা ছাড়া আপনি বোধহয় জানেন না, শকুন্তলা দেবীর মৃতদেহ পোস্টমর্টেম করে জানা গিয়েছিল যে সে সময় শকুন্তলা সন্তানসম্ভবা ছিল !

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। অথচ অবিনাশলিঙ্গম বিবাহের আগে থাকতেই পুরুষত্বহীনতায় ভুগছিলেন—তাঁর পক্ষে কোনদিনই সন্তানের বাপ হওয়া সম্ভবপর ছিল না !

কে বললে আপনাকে ?

পুলিসের কাছেই অবিনাশলিঙ্গম নিজের জবানবন্দিতে বলেছেন কথাটা। এবং সেই কারণেই তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহের বছর দুই পর থেকেই একটা মন-কষাকষি চলছিল। যদিও সে কারণে সেপারেশন্ বা ডিভোর্স হয়নি শেষ পর্যন্ত।

কথাটা শুনতে absurd বলে মনে হচ্ছে নাকি মিঃ রায় !

হ্যাঁ, শুনতে absurdই মনে হবার কথা, তাহলেও তাঁদের মধ্যে—মানে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কটা তখন পর্যন্ত বজায়ই ছিল যে কারণেই হোক এবং ঐ সময়ই সম্ভবতঃ আপনার সঙ্গে শকুন্তলা দেবীর পরিচয় হয়।

আপনি দেখছি অনেক কিছুই জানেন মিঃ রায় শকুন্তলা দেবী সম্পর্কে ! অশোকের গলার স্বরে যেন একটা চাপা ব্যঙ্গ প্রকাশ পায়।

তা অবশ্য জানি। কারণ পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগকে সে সময় শকুন্তলা দেবীর হত্যারহস্যের কিনারা করবার জন্যে অনেক চেষ্টা করতে হয়েছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তেই তারা পেঁছিতে পারেনি। এবং আজও পুলিসের গোয়েন্দা-বিভাগ তাদের অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে।

তা আমাকে এ সব প্রশ্ন করছেন কেন মিঃ রায়? আপনার কি ধারণা আমিই আপনাদের সেই শকুন্তলা দেবীকে হত্যা করেছি?

সে জন্য নয়--

তা হঠাৎ আজকের মামলার মধ্যে সে প্রসঙ্গটা আসছে কি করে?

আপনার সঙ্গে শকুন্তলা দেবীর ঘনিষ্ঠতা ছিল কথাটা জানতে পেরেই আমি আপনাকে প্রশ্নগুলো করেছি, যদি আপনি সেই ব্যাপারে কোন আলোক-সম্পাত করতে পারেন কিছুটা, এই আর কি।

তা এতকাল পরে পুলিসের ওই কথাটা মনে হওয়ার কারণ? তাছাড়া পুলিস যদি আমাকে সন্দেহই করে থাকবে, তাহলে তখনই বা আমাকে গ্রেপ্তার করেনি কেন?

তাহলে কথাটা আপনাকে খুলেই বলি। স্ত্রীর মৃত্যুর পরই অবিনাশলিঙ্গম তাঁর চাকরি ছেড়ে দিয়ে তাঁর দেশে ত্রিচিনাপল্লীতে চলে যান এবং কয়েক মাস পরে ব্যবসা শুরু করে বেশ একটা মোটা টাকার মূলধন নিয়ে।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। এবং এখনও মধ্যে মধ্যে কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির কাছ থেকে পাঁচ-দশ হাজার করে টাকা পান—যদিও পুলিস জানতে পারেনি টাকার উৎসটা কোথায় অর্থাৎ কোথা থেকে বা কার থেকে অবিনাশলিঙ্গম গত এক বছর ধরে মধ্যে মধ্যে ওই টাকাটা পাচ্ছেন। আপনি তো তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, আপনি বলতে পারেন—এমন কোন source তাঁর টাকা পাওয়ার থাকতে পারে কিনা?

না, ক্ষমা করবেন, আমি জানি না। জানবার কোন কারণও আমার দিক থেকে থাকতে পারে না।

কিরীটী মৃদু হাসল, তারপর বলে, পুলিসের আর একটা ধারণা কি জানেন?

কি?

কাউকে ব্ল্যাকমেলিং করেই অবিনাশলিঙ্গম ঐ টাকাটা পাচ্ছে।

ব্ল্যাকমেলিং?

হ্যাঁ।

তা টাকা যে ঐ ভাবে সে পাচ্ছেই, আপনারা জানলেন কি করে? আর যদি জানতেই পারছেন তো আজও তার হদিস করতেই বা পারছেন না কেন?

কারণ টাকাটা চেকে পেমেণ্ট হয় না।

তবে?

নগদ পেমেণ্ট হয়।

কি করে জানলেন ?

জানতে পারা গেছে। তার পরই হঠাৎ একটু চুপ করে থেকে কিরীটী বলে, আচ্ছা অশোকবাবু, আপনি যখন কোন ছবিতে কাজ করেন ব্ল্যাক মানি নেন, তাই না ?

না।

নেন—একথা সকলেই আপনাদের লাইনে জানে। এবং যেহেতু কাগজে-কলমে তার কোন প্রমাণ থাকে না বলেই আপনারা যাঁরা ব্ল্যাক মানি নিয়ে থাকেন বরাবর ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যান।

অশোক কোন জবাব দেয় না, চুপ করে থাকে।

যাক, এবার আপনি যেতে পারেন। আমার আপনাকে যা জিজ্ঞাসা ছিল জিজ্ঞাসা করা হয়ে গিয়েছে।

অশোক ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সতেরো

অশোক ও কিরীটীর কথাবার্তা এতক্ষণ সৌরীন কুণ্ডু ও শম্ভু চাটুয্যে দুজনেই মনোযোগের সঙ্গে শুনছিল, কেউ একটি কথা বলেনি।

অশোক ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর শম্ভু চাটুয্যে বলে, শকুন্তলা দেবীর হত্যার ব্যাপারটা তো বছরখানেক আগেকার ঘটনা কিরীটী।

তাই। এবং এতদিন রহস্যটা অনুদ্‌ঘাটিত থাকলেও মনে হচ্ছে এবারে হয়তো আসল ব্যাপারটা জানা যাবে।

কিরীটীবাবু !

সৌরীন কুণ্ডুর ডাকে কিরীটী ওর মুখের দিকে তাকাল !

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, কিছু যদি মনে না করেন—

নিশ্চয়ই না, বলুন !

অশোককে কি আপনারা সন্দেহ করছেন ?

টাকাটা অবিনাশলিঙ্গম কোথা থেকে পাচ্ছে, অন্ততঃ সে-কথাটা অশোকবাবু জানেন এটাই আমার ধারণা। যাক, আমাদের কাজটা এখনও শেষ হয়নি। এবারে অলক্তবাবুকে ডাকুন—

শম্ভু চাটুয্যেই ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে অলক্তকে ডেকে নিয়ে এল।

বয়স বেশী না অলক্তর। চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যেই হবে।

বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম।

আপনার নামই অলক্ত বসু ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

মুখটা বেশ গম্ভীর অলক্তর। মনে হয় সে যেন একটু বিরক্তই হয়েছে।

অলক্ত মৃদু স্বরে জবাব দেয়, হ্যাঁ।

বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

হঠাৎ অলক্ত যেন রীতিমত বিরক্তি-ভরা কণ্ঠেই বলে ওঠে, আচ্ছা, আপনারা সকলে এখনও এভাবে একটা ফার্স করছেন কেন বলুন তো মায়ার হত্যার ব্যাপারটা নিয়ে ?

ফার্স করছি ! কিরীটী বলে।

তাছাড়া এটাকে আর কি বলব ?

কেন বলুন তো ?

কেন আবার কি ? সবটাই তো বোঝা যাচ্ছে কার কীর্তি !

কিরীটী বলে, কার কীর্তি আপনি জানেন নাকি অলক্তবাবু ?

কেবল আমি কেন—একটু সামান্য মস্তিষ্কের চালনা করলেই আপনাদেরও মশাই বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়।

আপনার ধারণা তাহলে অশোকবাবুই মায়া দেবীকে হত্যা করেছেন সে রাত্রে ?

নিশ্চয়ই।

কিন্তু কেন বলুন তো—আপনি আপনার জবানবন্দিতে বলেছেন ওদের মধ্যে ভালবাসা হয়েছিল, তাই নয় কি ?

হ্যাঁ। সে কথা থিয়েটারের সবাই জানে।

তাই যদি হয় তো, অশোকবাবু—of all persons—তাঁর সেই ভালবাসার পাত্রীকে হত্যাই বা করতে যাবেন কেন ?

ও পারে—ও সব পারে।

কিন্তু কেন ? আপনি কোন যুক্তিতে ও-কথা অত জোর গলায় বলছেন ?

অতশত জানি না মশাই। তবে আমি হলফ করে বলতে পারি—ও মানে ঐ অশোকবাবুরই কাজ।

কিন্তু যাকে ভালবাসে তাকে কি কেউ—

ঐ—ঐখানেই আপনাদের ভুল হয়েছে।

ভুল হয়েছে !

হ্যাঁ। অশোকবাবু ওকে কেবল ভোগ করতেই চেয়েছিল—ভালবাসাবাসির কোন গন্ধও ছিল না কোথাও।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ। আর সেই কারণেই মায়া অশোকবাবুকে প্রচণ্ড রকম ঘৃণা করত—ডিস্‌লাইক্ করত।

তাই যদি তো মায়া দেবী অশোকবাবুর ফ্ল্যাটে যেতেন কেন রাত্রে ?

এটা বুঝলেন না—পুয়োর গার্ল ! ওর পয়সার দরকার ছিল আর আপনাদের অশোকবাবু তারই সুযোগটা পুরোপুরি নিয়ে—

বুঝলাম কিন্তু সেজন্য অশোকবাবু তাকে খুন করতেই বা যাবেন কেন ?

অশোকবাবু যে মুহূর্তে জানতে পেরেছিল মায়া তাকে ঘৃণা করে, তখনই আক্রোশের বশে তাকে খুন করে।

কিন্তু অলক্তবাবু, আপনি হয়তো এখনও জানেন না, শম্ভুবাবু আপনাকেই সন্দেহ করছেন—

কি বললেন ?

বললাম তো, শম্ভুবাবুর ধারণা তাই—

Nonsense ! আমি—আমি মায়াকে হত্যা করেছি !

সেটাই তো স্বাভাবিক।

মানে ? কি বলতে চান আপনি ?

আপনি মায়া দেবীকে ভালবাসতেন, তাই—

অলক্ত যেন হঠাৎ চুপসে যায়।

কি ? চুপ করে গেলেন যে ? ভালবাসতেন না ?

না।

ভালবাসতেন না ?

না।

আচ্ছা অলক্তবাবু, এই থিয়েটারের চাকরি ছাড়া আপনার উপার্জনের আর কোন source ছিল কি ?

আমি একটা মার্চেণ্ট অফিসে কাজ করি।

কতদিন সেখানে কাজ করছেন ?

মাস পাঁচেক হল।

মাইনে কত ?

দেড়শ।

কতদূর পর্যন্ত আপনি লেখাপড়া করেছেন ?

বি. এ. পর্যন্ত পড়েছি।

হুঁ। এবার বলুন তো অলক্তবাবু, আপনার সঙ্গে মায়াদেবীর এতটা ঘনিষ্ঠতা নাই ছিল তো আপনি তাকে চিঠি লিখে সাবধান বলুন সাবধান—থ্রেটেন বলুন থ্রেটেন করতে চেয়েছিলেন কেন ?

কি বলছেন পাগলের মত ? আমি মায়াকে চিঠি দিয়েছি ?

চিঠি কখনও তাকে আপনি লেখেননি বলতে চান ?

নিশ্চয়ই না।

আর ইউ সিওর ?

হ্যাঁ।

কিরীটী পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে অলক্তর দিকে এগিয়ে ধরে বলে, দেখুন তো—এই হাতের লেখাটা চিনতে পারেন কিনা !

কি ওটা ?

দেখুন না - একটা চিঠি !

চিঠি ? কার চিঠি ?

দেখলেই বুঝতে পারবেন। মায়া দেবীর সুটকেসে যে চিঠিগুলো পাওয়া

গিয়েছে—তারই একটা এটা।

সুটকেসে পাওয়া গিয়েছে!

হ্যাঁ—দেখুন না—

হঠাৎ যেন অলক্তর মুখের চেহারার পরিবর্তন ঘটে। মুখটা তার কেমন যেন ফ্যাকাশে বিবর্ণ মনে হয়। একটু ইতস্ততঃ করে, তারপর নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে কিরীটীর হাত থেকে চিঠিটা নেয়।

দেখুন চেনেন—চিনতে পারছেন কার হাতের লেখা চিঠি!

অলক্ত চিঠিটা পড়ল।

তারপর কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল!

এ—এ চিঠি কোথায় পেয়েছেন?

বললাম তো। মায়া দেবীর সুটকেসে, আপনারই লেখা চিঠিটা, তাই নয় কি!

না।

আপনার লেখা চিঠি নয়?

না।

ওঃ, তা বেশ—বলে কিরীটী কাগজ ও পেনটা এগিয়ে দেয়। এই কাগজটায় যা হয় দুটো লাইন লিখে আপনার নামটা সই করে দিন।

মানে?

যা বললাম তাই করুন।

কেন?

উনি যা বলছেন করুন অলক্তবাবু। এবারে শম্ভু চাটুয্যেই বলে।

কিন্তু কেন? কেন আমি লিখব? লিখব না আমি। তীব্র ঝাঁঝাল গলায় প্রতিবাদ করে ওঠে অলক্ত।

লিখবেন না?

না।

না লেখার অর্থ বুঝতে পারছেন আপনি অলক্তবাবু! শম্ভু চাটুয্যে বলে।

বুঝতে আমি চাই না।

কিরীটী বাধা দেয়, থাক শম্ভু, উনি যখন লিখতে চাইছেন না—

তখন বাধ্য হয়েই ওঁকে অ্যারেস্ট করতে হবে। শম্ভু চাটুয্যে বলে।

অ্যারেস্ট করবেন আমাকে! কেন?

মায়া দেবীকে হত্যার অপরাধে।

আমি তাকে হত্যা করেছি, আপনাদের ধারণা তাহলে?

স্বাভাবিক সেটাই তো।

তাহলে শুনুন, চিঠিগুলো আমারই লেখা কিন্তু হত্যা তাকে আমি করিনি। চিঠিতে তাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম।

সাবধান করে দিয়েছিলেন!

হ্যাঁ করেছিলাম কারণ ওকে সত্যি সত্যিই আমি ভালবাসতাম। যাকে ভালবাসি, সে দিনের পর দিন আমার চোখের সামনে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে সেটা সইতে পারছিলাম না বলেই ওকে ঐ ভাবে চিঠি দিয়েছিলাম দারোগাবাবু। বলতে বলতে অলক্তর গলার স্বর যেন অশ্রুতে বুজে আসে।

নিজেকে বুঝি একটু সামলে নিয়ে আবার বলে, কিন্তু সত্যি সত্যিই যে শেষ পর্যন্ত ওকে এমন ভাবে নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করতে হবে, বিশ্বাস করুন, স্বপ্নেও আমি ভাবিনি।

অলক্তর চোখের কোল বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

ঠিক আছে, আপনি বাইরে গিয়ে বসুন। প্রদীপবাবুকে পাঠিয়ে দিন।

॥ আঠারো ॥

প্রদীপ এল। রোগা পাতলা—সুশ্রী চেহারা প্রদীপের।

কিরীটীই প্রশ্ন শুরু করে, আপনার সঙ্গে তো মায়া দেবীর যথেষ্ট পরিচয় ছিল প্রদীপবাবু, তাই না?

হ্যাঁ। প্রদীপ মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়!

আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় ব্যাপারটা মানে কে মায়া দেবীকে হত্যা করতে পারে?

বলতে পারব না।

কাউকে আপনি সন্দেহও করেন না?

না।

আচ্ছা, অশোকবাবুর সঙ্গে আপনার হৃদ্যতা কেমন?

তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, তাঁকেও আমি শ্রদ্ধা করি। সত্যিকারের উঁচুদরের একজন অভিনেতা অশোকবাবু।

আচ্ছা, অশোকবাবুর সঙ্গে মায়া দেবীর যে হৃদ্যতা হয়েছিল সেটা আপনি কি ভাবে নিয়েছিলেন?

ভাল লাগেনি ব্যাপারটা আমার।

কেন?

কারণ আমি জানতাম অলক্ত তাকে ভালবাসে, আর সেও অলক্তকে ভালবাসত। কিন্তু হঠাৎ মাঝখানে অশোকবাবু এলেন। সব যেন বিশ্রী ওলটপালট হয়ে গেল বলে আমার তখন ধারণা হয়েছিল প্রথমে। কিন্তু পরে জানতে পেরেছিলাম, যদিও অলক্তকে আমি সে কথা বলা সত্ত্বেও সে আমায় বিশ্বাস করে নি—

কি কথা?

অশোকবাবুর সঙ্গে সে মিশত বটে, তবে মনে মনে অশোকবাবুকে সত্যিই তেমন পছন্দ করত না।

কি বলছেন আপনি! তাহলে তিনি অশোকবাবুর সঙ্গে ওভাবে—

সেটাই বিস্ময় একটা। তবে আমার মনে হয়েছিল পরে—

কি ?

অশোকবাবুর এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল যেটা হয়ত মায়ার মত দুর্বলচিত্ত মেয়ে কাটিয়ে উঠতে পারছিল না ।

শুধু কি তাই ?

না, আরও একটা কথা আমার মনে হয় ।

কি ?

মায়ার প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল মস্ত বড় অভিনেত্রী হবে সে। প্রচুর নাম ডাক অর্থ। যেটা সে হয়ত ভেবেছিল অশোকবাবুকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারলে এক দিন তার ভাগ্যে জুটতেও পারে। সেই কারণেই অশোকবাবুর সঙ্গে হয়ত অত ঘনিষ্ঠতা সে করেছে।

কিরীটী মনোযোগ দিয়ে প্রদীপের কথাগুলো শোনে ।

প্রদীপ একটু থেমে আবার বলে, অলক্ত মায়ার চরিত্রের ঐটাই জানত যে মায়া তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য অত্যন্ত নীচুতেও নেমে যেতে পারত। কিন্তু অলক্ত ঐখানেই মায়াকে চিনতে ভুল করেছিল বলে আমার মনে হয় ।

সবশেষে লাবণ্য এল ।

লাবণ্য মেয়েটিই অভিনেত্রীদের শো'র সময় তাদের ঘরে থাকত ও তাদের সব কাজে সাহায্য করত ।

লাবণ্যকে প্রশ্ন করল কিরীটী, আপনি সে রাত্রে কখন গিয়েছিলেন ?

শো শেষ হবার পর। লাবণ্য জবাব দেয় ।

কতক্ষণ পরে ?

মিনিট দশেক পরে ।

যাবার আগে মায়া দেবীর সঙ্গে দেখা হয়নি ?

না। আমি বাইরে একটা কাজে গিয়েছিলাম—ফিরে এসে দেখি অন্যান্য অভিনেত্রীরা চলে গিয়েছে—মায়ার ঘর অন্ধকার। তাতেই ভেবেছি মায়াও বুঝি চলে গিয়েছে।

অন্ধকার ঘর দেখে আর এ ঘরে ঢোকেননি ?

না। তবে—

কি ?

সেদিন দারোগাবাবুকে আমি বলিনি—আমি যখন বের হয়ে যাই—প্যাসেজে এই ঘরের দরজার সামনে একজন ঘোমটা দেওয়া স্ত্রীলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম ।

জিজ্ঞাসা করেননি সে কে ?

না। একজন প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা প্রায়ই আসেন অভিনেত্রীদের কাছে ভিক্ষা নিতে। ভেবেছি বুঝি তিনিই।

কে তিনি ?

শুনেছি এককালে তিনি নাকি স্টেজে অভিনয় করতেন—

আপনি জানেন সৌরীনবাবু কে সে ?

হ্যাঁ মানদাসুন্দরী। সে আসত প্রায়ই থিয়েটারে সাহায্যের জন্য।

কোথায় থাকেন তিনি জানেন ?

জানি। নেবুতলায় একটা খোলার বস্তিতে।

তাকে এখুনি কি একবার গাড়ি পাঠিয়ে ডেকে আনা যায় ?

চেষ্টা করে দেখতে পারি।

তবে দেখুন একটু। আর ভাল কথা, ওদের সব আজকের মত যেতে বলুন। কাল তো রবিবার, থিয়েটার আছে, কাল সেকেণ্ড শো'র পর আবার আমরা এখানে মিট করব ওদের বলে দিন।

বেশ।

সৌরীন কুণ্ডুর প্রেরিত লোক আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এল।

মানদাসুন্দরী আসতে পারেনি। সপ্তাহ দুই ধরে অসুস্থ ; একেবারে শয্যাশায়ী বললেও হয়।

রাতও হয়েছিল। প্রায় সাড়ে এগারোটা।

কিরীটী শম্ভু চাটুয্যের দিকে চেয়ে বললে, চল, ওঠা যাক।

শম্ভু চাটুয্যে উঠে দাঁড়াল।

সৌরীন কুণ্ডু মহাবীর সিংকে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতে বলে তার জন্য।

মহাবীর সিং এগিয়ে যাচ্ছিল গেটের দিকে। লবিতে এক পাশে দাঁড়িয়ে কিরীটী হাতের সিগারেটটায় টান দিচ্ছিল, সে বাধা দেয়, থাক্ মহাবীর সিং, ডাকতে হবে না। আপনি কোন্ দিকে যাবেন কুণ্ডু মশাই ?

মীর্জাপুর স্ট্রীটের দিকে।

চলুন আমার গাড়িতে, নামিয়ে দিয়ে যাব'খন।

না, না—আবার আপনি কেন কষ্ট করবেন—

কষ্ট আর কি—ঐ পথেই তো আমি যাব।

শম্ভু বলে, তাহলে আমি চলি কিরীটী।

কিরীটী শম্ভুকে দাঁড়াতে বলে নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকাল। রাত তখন প্রায় পৌনে বারোটা।

কি যেন আপন মনেই ভাবল কিরীটী। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে শম্ভু—

কি—

আমার মনে হয় আর দেরি করা উচিত হবে না—

কি ব্যাপার ?

অলক্তবাবুর বাড়ি তুই চিনিস ?

চিনি না—তবে ঠিকানা জানি। পাতিপুকুরে থাকে।

চল্ একবার, সেখানে যাই।

সেখানে কেন ?

সৌরীন কুণ্ডু বা শম্ভু চাটুয্যে কেউ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না অত রাত্রে

হঠাৎ অলক্তর বাসায় যাবার এমন কি জরুরী প্রয়োজন বোধ করল কিরীটী।

কিন্তু কিরীটী আর কোন কথাই বলে না, এগিয়ে যায় সোজা তার গাড়ির দিকে।

অগত্যা ওরা দুজনে ওকে অনুসরণ করে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসে।

কিরীটী দুজন পুলিসকে থানা থেকে যাবার পথে তুলে নিতে বলল শম্ভুকে।

॥ উনিশ ॥

গাড়ি ছেড়ে দিল।

কিরীটী ড্রাইভারকে পাতিপুকুরের দিকে গাড়ি চালাতে বলল।

শীতের মধ্যরাত—স্তব্ধ, জনমনুষ্যহীন। মধ্যে মধ্যে কেবল দু-একটা রিক্সা টুংটাং করতে করতে মন্থর গতিতে চলেছে বা দু-একটা ট্যাক্সি ছুটে চলে যায়। ট্রাম অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যাত্রীবাহী শূন্য একটা বাস চলে গেল—বোধহয় গ্যারেজে।

কিরীটী চুপচাপ বসে চুরোট টেনে যাচ্ছে। ওরা দুজনে পাশে বসে আছে কিন্তু কারও মুখেই কোন কথা নেই।

শম্ভু চাটুয্যে অবিশ্যি বুঝতে পারছিল, বিশেষ একটা কারণেই এত রাত্রে চলেছে অলক্তর গৃহে কিরীটী।

থানা থেকে দুজন পুলিসকে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

তবে কি শেষ পর্যন্ত অলক্তই নাকি! তাই নিশীথে এই আয়োজন! এই তড়িঘড়ি!

যাই হোক শেষ পর্যন্ত পাতিপুকুরে পৌঁছে অত রাত্রে অলক্তর বাসা খুঁজে বের করতে একটু যেন কষ্টই হয়।

এত রাত্রে কাউকে চোখেও পড়ছে না। কাউকে ঘুম থেকে ডেকে তোলাও যায় না।

বিষম মুশকিলে পড়ে ওরা। এদিক ওদিক অনির্দিষ্টভাবে ঘুরতে থাকে। কিরীটীর হঠাৎ নজরে পড়ে রাস্তার একপাশে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সির আলোটা নেভানো।

তাহলেও ট্যাক্সির চালকের সীটে বসে কে যেন আবছা অন্ধকারে বিড়ি ফুঁকছে।

সেদিকে এগিয়ে গেল কিরীটী।

সামনে এগোতেই ট্যাক্সির নম্বরটা চোখে পড়ল—নম্বরটা পরিচিত কিরীটীর, সীতারামের ট্যাক্সি।

সীতারাম হয়তো এদিকেই থাকে বা এদিকে কোন সওয়ারী নিয়ে এসে থাকবে, এদিকটা ওর চেনাজানাও হতে পারে! ঐ কথা ভেবেই এগিয়ে যায় কিরীটী। পথের আলো ঐ জায়গায় তেমন আলোকিত করেনি।

ভাড়া যাবে ? প্রশ্ন করে কিরীটী।

কে ? রায় মশাই—

সীতারাম নাকি ?

হ্যাঁ, আপনি—আপনার গাড়ি আনেননি ?

তুমি সওয়ারী নিয়ে এসেছ নাকি ?

আর বলেন কেন ! এক ঘণ্টার কাছাকাছি প্রায় বসে আছি, অপেক্ষা করতে বলে সেই যে এখুনি আসছি বলে গেলেন—

তুমি কি এর আগে এ-পাড়ায় এসেছ ?

অনেকবার। কেন বলুন তো ?

সাতের বি নম্বরটা কোথায় বলতে পার ?

সামনের ঐ গলির মধ্যে হবে।

কিরীটী ওদের সকলের আগে গলির দিকে এগুতে এগুতে বলে, চল শম্ভু !

কিরীটী ওদের আগেই গলির দিকে এগিয়ে যায়।

বেশীদূর যেতে হল না, খান সাত-আট বাড়ির পরেই দেখা গেল একটা পানের দোকান বন্ধ হচ্ছে।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দোকানদারকে, এখানে থিয়েটারে অভিনয় করে অলক্তবাবু কোথায় থাকে বলতে পার ভাই ?

ঐ তো সাতের বি—এগিয়ে যান। লোকটা কথাটা বলে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

সাতের-বি পাওয়া গেল।

একটা ভাঙা দোতলা বাড়ির একতলার একটা ঘরে তখনও আলো জ্বলছিল।

কিরীটী উঁকি দিল রাস্তার দিকের জানালা দিয়ে।

একজন বুড়ো মত লোক বসে তামাক টানছিল।

কিরীটী তাকেই জিজ্ঞেস করে, এ বাড়িতে অলক্তবাবু থাকেন ?

থাকেন, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চলে যান—, বলে বুড়ো তামাক টানতে লাগল।

সিঁড়ি দিয়ে অন্ধকারে উঠতে উঠতে হঠাৎ একটা গোঁ গোঁ শব্দ কানে আসে কিরীটীর।

কিরীটীর পিছনে পিছনে উঠছিল সিঁড়ি দিয়ে শম্ভু চাটুয্যে ও সৌরীন কুণ্ডু।

শম্ভু চাটুয্যে বুঝতে পারছিল না হঠাৎ কিরীটী এত রাত্রে অলক্তর সন্ধানে পাতিপুকুরে ছুটে এলো কেন !

জিজ্ঞাসাও করেনি কারণ শম্ভু চাটুয্যে কিরীটীকে ভাল করেই চিনত—প্রশ্ন করে ঐ সময় কিরীটীর কাছ থেকে কিছুই জানা যাবে না।

গোঁ গোঁ শব্দটা শুনেই কিরীটী তার চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল, প্রায়

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়িগুলো অতিক্রম করেছিল অন্ধকারে।

শম্ভু চাটুয্যে ও তার চলার গতি বাড়িয়ে দেয়।

সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে সামনেই যে ঘরটা সবার আগে পড়ল তার দরজাটা খোলাই ছিল এবং ভিতরে আলো জ্বলছিল।

সেই আলোতেই চোখে পড়ে সবার একই সময়, ঘরের মেঝেতে দুজন লোক ঝটাপটি করছে আর গোঁ গোঁ শব্দ হচ্ছে।

কিরীটীই সবার আগে এক লাফে গিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল এবং যারা ঝটাপটি করছিল তাদের উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একজন আর একজনের গলায় কি যেন একটা পেঁচিয়ে তার শ্বাসরোধ করে এনেছে তখন প্রায়।

কিরীটী উপরের লোকটির ঘাড়ে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুষি বসিয়ে দিতেই লোকটা টলে পড়ে। সেই মুহূর্তে কিরীটী আর একটা ঘুষি চালায় তাকে লক্ষ্য করে।

দ্বিতীয় ঘুষিতে লোকটা পাশে টলে পড়ে যায়।

কিরীটী সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়, যে লোকটি তখনও মেঝেতে পড়েছিল, তার সামনে গিয়ে তাড়াতাড়ি তার গলা থেকে পেঁচানো সিল্কের রুমালটা গোটা দুই টান দিয়ে খুলে নেয়।

লোকটি এলিয়ে পড়ে।

শম্ভু চাটুয্যে ও সৌরীন কুণ্ডু এতক্ষণে তার দিকে তাকিয়ে যেন চমকে ওঠে—সে আর কেউ নয়, অলক্ত।

এদিকে যে পর পর দুটো ঘুষি খেয়ে টলে পড়েছিল সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই কিরীটী তার দিকে ফিরে তাকিয়ে কঠোর গলায় বলে, উঠে দাঁড়াও রূপলাল!

রূপলাল!

সৌরীন কুণ্ডুর গলা দিয়ে বিস্মিত একটা শব্দ বের হয় মাত্র, এ কি! সত্যিই তো রূপলাল!

শম্ভু, ঐ কুঁজো থেকে জল নিয়ে অলক্তবাবুর চোখে-মুখে দাও। শম্ভু চাটুয্যের দিকে তাকিয়ে কিরীটী বলে।

অলক্ত মেঝের উপর তখনও নেতিয়ে পড়ে আছে।

রূপলাল একপাশে যেন পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল।

তার দিকে তাকাল কিরীটী, সৌরীনবাবু, আমি জানতাম মায়া দেবীর হত্যার পেছনে যে আসল ব্রেন সে আমার মুখ থেকে সব কথা শোনবার পর আর এক মুহূর্তও দেরি করবে না—সর্বাগ্রে অলক্তবাবুকে পৃথিবী থেকে সরাবার তার প্রয়োজন হবেই—আমিও তাই আর দেরি করিনি—সঙ্গে সঙ্গেই শম্ভুবাবুকে নিয়ে প্রস্তুত হয়েই এত রাত্রেই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম।

শম্ভু চাটুয্যে তখনও সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি—সে

একবার কিরীটীর মুখের দিকে আর একবার রূপলালের মুখের দিকে তাকাতে থাকে।

কুড়ি

চোখে-মুখে কিছুক্ষণ জলের ছিটে দিতেই ধীরে ধীরে অলক্ত চোখ মেলে তাকায় কোনমতে।

কিরীটী জিজ্ঞাসা করে, এখন একটু সুস্থ বোধ করছেন কি অলক্তবাবু ?

হ্যাঁ।

অলক্ত উঠে বসে। গলায় হাত বুলোতে থাকে অলক্ত।

যান, ঐ খাটের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আপনার সর্বাগ্রে এখন একটু বিশ্রাম দরকার।

অলক্ত অদূরে দণ্ডায়মান রূপলালের দিকে চেয়ে বলে, ঐ শয়তানটা যে আমাকে খুন করতে এসেছে তা আমি বুঝতে পারিনি।

বুঝতে পারা আপনার উচিত ছিল, কিরীটী বলে, আর এখন বুঝতে তো পারছেন মিথ্যে risk না নিয়ে সব কথা আজ সন্ধ্যাবেলাই আপনার আমাকে জানানো উচিত ছিল !

আমি—

আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয়—আপনি নিশ্চয় জানতে পেরেছিলেন কে টাকা খাইয়ে ঐ রূপলালকে মায়া দেবীকে হত্যা করার জন্য নিয়োগ করে, তাই নয় কি ?

অলক্ত চুপ করে থাকে।

বলুন, চুপ করে থাকবেন না।

আমি ঠিক বুঝতে পারিনি—

বুঝতে পারেননি ?

না—মানে অন্ধকারে লোকটা যে কে তা ঠিক চিনতে পারিনি—

তখন না পারলেও, পরে অনুমান করতে পেরেছিলেন নিশ্চয়ই ?

হ্যাঁ।

সে কথা তাহলে পুলিসকে জানাননি কেন ?

ভয়ে। মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় অলক্ত।

কিরীটী এবার শম্ভু চাটুয্যের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, আর দেরি করো না শম্ভু, রূপলালের হাতে হাতকড়া লাগাও। উনি সাধারণ ব্যক্তি নন—জেলপলাতক এক দুর্ধর্ষ খুনে আসামী।

বল কি !

হ্যাঁ। ওর আসল নাম ছেদীলাল মাহাতো। পুলিসের খাতায় ওর ফটো আছে। তবে চেহারার একটু পরিবর্তন হয়েছে। ফটোতে আছে মাথায় ছোট ছোট কদমছাঁট চুল আর এখন তেলচক্‌চকে ঢেউ-খেলানো টেরির বাহার।

শম্ভু আর দেরি করে না। নিজেই এগিয়ে গিয়ে ছেদীলাল মাহাতোর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়। তারপর কিরীটীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, ওকে তুমি চিনলে কি করে কিরীটী?

ছেদীর মনে নেই—বছর আড়াই আগে ও যখন বিচারাধীন ফাঁসীর আসামী—তখন ওকে আমার এলাহাবাদের ইন্সপেক্টার-বন্ধু শিউশরণের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তারই ওখানে মানে থানায় একবার দেখেছিলাম। ও জানত না একবার যে মুখ আমি দেখি তা বড় একটা ভুলি না। আর সেটাই হয়েছে ওর চরমতম দুর্ভাগ্যের কারণ। একটু কেশে কিরীটী বলে, অনেকদিন আগে দেখলেও আজ সন্ধ্যায় সাজঘরে ওকে দেখেই আমি তাই হঠাৎ যেন চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু প্রথমটায় ঠিক ধরতে পারিনি। পরে চিন্তা করতে গিয়ে সব পরিষ্কার হয়ে যায়, সব মনে পড়ে যায়।

রূপলাল - মানে ঐ ছেদীলালই তাহলে—

হ্যাঁ। কিরীটী শম্ভু চাটুয্যের কথাটা সমাপ্ত করে. মায়া দেবীকে সে রাত্রে ঐ সিল্কের রুমালটার সাহায্যেই গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছিল।

কিন্তু কেন?

কেন আবার? টাকার লোভে!

কিন্তু কে—কে এমন কাজ করল? সৌরীন কুণ্ডুই এবারে প্রশ্ন করে।

ঐ রূপলালকেই জিজ্ঞাসা করুন না। কিরীটী জবাব দেয়।

কিন্তু রূপলালের কাছ থেকে কোন কিছুই জানা গেল না। লোকটা মুখ খুলল না।

শম্ভু চাটুয্যে অনেক শাসাল, কিন্তু রূপলাল যেন একেবারে বোবা।

মুখে শব্দটি নেই।

কিরীটী বলে, ব্যস্ত হয়ো না শম্ভু আসল ব্যক্তিটি—অর্থাৎ এ খেলায় রঙের গোলামটিকে আশা করছি আজ রাত্রেই ধরতে পারব। কিন্তু আর দেরি নয়—চল এখুনি আমাদের যেতে হবে।

কোথায়?

বেশী দূর নয়—এই কাছেই!

হাতকড়া-বদ্ধ রূপলালকে পুলিসের প্রহরায় একটা জীপে করে থানায় পাঠিয়ে দিয়ে দুজন কনেস্টবলের সঙ্গে কিরীটীর গাড়িতে সবাই উঠে বসল।

কিরীটী নিজেই ড্রাইভ করছিল।

গাড়িতে স্টার্ট দিতে শম্ভু প্রশ্ন করে, এবারে কোন দিকে?

কিরীটী ড্রাইভ করতে করতে মৃদু গলায় বলে, অশোকবাবুকে আমাদের একটু প্রয়োজন—

অশোক!

হ্যাঁ কুণ্ডুমশাই, আজকের রাত্রের শেষ কাজটুকু আমাদের অশোকবাবুর

সামনেই সম্পন্ন করতে হবে।

কিন্তু এখন কি তাকে তার ফ্ল্যাটে পাওয়া যাবে? সৌরীন কুণ্ডু বলে।

চলুন, দেখা যাক। হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

গেলেও সে যে এখন কি অবস্থায় আছে—

কি আর! মদের বোতল নিয়ে বসে আছেন, তাই তো?

হ্যাঁ।

অশোকের ফ্ল্যাটের সামনে পেঁাছে একে একে সকলে গাড়ি থেকে নামল।

সৌরীন কুণ্ডুই সকলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

পাঁচতলা বাড়ি—ফ্ল্যাট-সিস্টেম।

অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল—ফ্ল্যাটের বাসিন্দরা সবাই তখন ঘুমোচ্ছে।

বারোয়ারী ফ্ল্যাটের মেন গেট খোলাই থাকে—রাত্রি-দিন।

দারোয়ান একজন থাকে বটে, তবে সে ঐ নামেই। সেও তখন খাটিয়ায় শুয়ে নাসিকাগর্জন করছিল।

সিঁড়িতে আলো ছিল।

সকলে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যায় সৌরীন কুণ্ডুর পিছনে পিছনে।

পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে এসে সৌরীন কুণ্ডু দাঁড়াল।

দরজার গায়ে প্ল্যাস্টিক প্লেটে অশোকের নাম চোখে পড়ে।

বন্ধ দরজার গায়ে কিরীটীই নক্ করল।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল ভিতর থেকে, কে?

কিরীটী সৌরীন কুণ্ডুকে ইঙ্গিত করে—সৌরীন কুণ্ডুই সাড়া দেয়, অশোক, দরজাটা খোল, আমি সৌরীন—

একটু পরেই দরজা খুলে গেল। মুখ বাড়াল অশোক খোলা দরজা-পথে।

কি ব্যাপার, সৌরীন? এত রাত্রে—

কিন্তু কথাটা শেষ হয় না, অশোক হঠাৎ চুপ করে যায় দরজার সামনে কিরীটী ও শম্ভু চাটুয্যেকে দেখে।

কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে অশোক ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ভিতরে আসতে পারি অশোকবাবু? কিরীটী জিজ্ঞাসা করে।

অশোক তার বিহ্বল ভাবটা ততক্ষণে সামলে উঠেছে। বলে, কি ব্যাপার কিরীটীবাবু! এত রাত্রে—

একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

কি কথা?

ভিতরে চলুন বলছি।

অশোক যেন মুহূর্তকাল ইতস্ততঃ করে, তারপরই দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে বলে, আসুন।

সকলে ঘরের মধ্যে ঢোকে একে একে।

॥ একুশ ॥

মাঝারি আকারের ঘর।

ঐটাই শোবার ঘর। দামী আসবাবপত্র রয়েছে ঘরের মধ্যে তবে সব কিছুই যেন বিশৃঙ্খল—এলোমেলো।

এক পাশে একটা সোফার উপর একটা ছোট সুটকেস খোলা। পাশে কিছু জামাকাপড়। মনে হল বোধহয় ঐ সুটকেসে জামাকাপড় গোছানো হচ্ছিল। বারেক সেদিকে দৃষ্টিপাত করে কিরীটী অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার, সুটকেস গোছাচ্ছিলেন মনে হচ্ছে—কোথাও যাবেন বুঝি?

হ্যাঁ, কাল সকালে কলকাতার বাইরে যাচ্ছি। মৃদু গলায় জবাব দেয় অশোক।

বাইরে—কোথায়? মাদ্রাজ—

চমকে তাকায় কিরীটীর কথায় ওর মুখের দিকে সঙ্গে সঙ্গে অশোক।

কিরীটী যেন সেটা লক্ষ্যই করেনি এমনই ভঙ্গীতে বলে, কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না, অবিনাশলিঙ্গম কালকের ভোরের প্লেনেই কলকাতায় এসে পৌঁছচ্ছেন—

অবিনাশলিঙ্গম!

হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গেই তো দেখা করতে যাচ্ছিলেন মাদ্রাজ?

কে বললে আপনাকে? তাছাড়া মাদ্রাজ মোটেই আমি যাচ্ছিলাম না।

আমি জানি, আপনি মাদ্রাজই যাচ্ছিলেন।

ঠিক জানেন? আপনি দেখছি মশাই সর্বজ্ঞ!

সর্বজ্ঞ কি না জানি না, তবে অশোকবাবু, একটু থেমে কিরীটী শান্ত গলায় বলে, আপনি কিরীটী রায় নামটাই কেবল শুনেছেন, তার সঠিক পরিচয়টা হয়তো আপনার জানা নেই, নচেৎ আপনি বুঝতেন আপনার আজকের সন্ধ্যায় তার সঙ্গে কথাবার্তা হবার পর আপনার পরবর্তী প্ল্যানটা কি হবে বা হতে পারে সেটা সে অনুমান করে নেবে এবং সেই ভাবেই সে কাজ করবে!

তাহলে এখানে এ সময়ে আসাটা আপনার প্ল্যান-মত?

তাই।

অর্থাৎ—

এখনও বুঝতে পারছেন না কিছু?

না।

তাহলে শুনুন, রূপলাল successful হতে পারেনি—

রূপলাল!

হ্যাঁ! এবং he has been caught red-handed—সে এখন হাজতে এবং আপনার প্ল্যানের একটা অংশ ভেস্তে গিয়েছে।

তাই বুঝি!

হ্যাঁ অশোকবাবু। আপনি নিঃসন্দেহে একজন বড় অভিনেতা। তাহলেও বলব, অভিনয়টা আমার সঙ্গে করবার চেষ্টা না করলে বুদ্ধিরই পরিচয় দেবেন কারণ সেটা কোন কাজেই লাগবে না। শুনুন, আমরা প্রস্তুত হয়েই এসেছি—

এসব কি ব্যাপার সৌরীন! মনে হচ্ছে তুমিও এর মধ্যে আছ!

সেও তো আপনিই ওঁকে বাধ্য করেছেন অশোকবাবু। কিরীটীই বলে।

দেখুন মশাই, এই রাতদুপুরে আপনাদের এভাবে একজন ভদ্রলোকের শোবার ঘরে হামলা করবার অর্থটা ঠিক এখনও আমি বুঝছি না। তবে বুঝি না-বুঝি—আপনাদের সকলকে এই মুহূর্তে এ-ঘর থেকে চলে যেতে বলছি।

অশোকের গলায় রীতিমত উষ্মা ফুটে ওঠে।

যেতে আমরা রাজী আছি, অবিশ্যি যদি আপনি আমাদের সঙ্গে যান—

What do you mean? চিৎকার করে ওঠে সহসা অশোক।

কিরীটী ফিরে তাকাল শম্ভু চাটুয্যের দিকে, শম্ভু, এই অশোকবাবুই হচ্ছেন শকুন্তলা দেবীর হত্যাকারী। আর এঁরই নির্দেশে টাকা খেয়ে রূপলাল মায়া দেবীকে গ্রীনরুমে সিল্কের রুমাল গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে এবং—

Are you mad! আবার চিৎকার করে ওঠে অশোক।

ম্যাড্ যদি কেউ এ-ঘরে এই মুহূর্তে থাকে তো—কিরীটী বলে, সে আপনিই

Shut up! Will you?

গর্জন করে ওঠে আবার অশোক।

চিৎকার করে সবকিছু অস্বীকার করবার চেষ্টা করলেই যা সত্য—যা ঘটেছে—তা মিথ্যে হয়ে যাবে না অশোকবাবু—তা হবে না। আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি। শম্ভু, arrest him!

শম্ভু এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দু'পা পেছিয়ে অশোক পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে গর্জন করে ওঠে, খবরদার, এক পা কেউ এগুবেন তো মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। হাত তুলুন সবাই—

সহসা যেন সম্পূর্ণ এক বিপরীত পরিস্থিতি!

সবাই নির্বাক—হতচকিত!

সহসা কিরীটী হেসে ওঠে, অশোকবাবু, আপনি কি আমাকে এতই বোকা মনে করেন যে আপনার পিস্তলের কথাটা আমি বেমালুম ভুলে যাব! অনেক আগেই ওর ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। ম্যাগাজিনের চেম্বারে একটি গুলিও আর নেই, সব আগে থাকতেই আমি বের করে নিয়েছি।

হঠাৎ যেন কেমন থতমত খেয়ে যায় অশোক, আর ঠিক সেই মুহূর্তে চকিতে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে কিরীটী অশোকের হাত থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নেয়।

হ্যাঁ, এবার শান্ত সুবোধ বালকের মত আমাদের থানার ও. সি.-কে তার কর্তব্য করতে দিন—শম্ভু, arrest him-লৌহবলয় দুটো এবার পরিয়ে দাও।

শম্ভু চাটুয্যে আর দেরি করে না—দরজার গোড়ার কনেস্টবলটিকে ইঙ্গিত করতেই সে এসে অশোকের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়।

অভিনয় আমরাও করতে পারি অশোকবাবু, দেখলেন তো! কিরীটী হেসে বলে, অনেক বড় অভিনেতা আপনি অশোকবাবু—মঞ্চে নানা ভূমিকায় শুনেছি অভিনয় করেছেন—কখনও কোন কয়েদীর ভূমিকাতেও হয়তো অভিনয় করেছেন, কিন্তু আজকের আমাদের অভিনয়টা নিশ্চয়ই আপনার খুব প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে—যথেষ্ট thrill অনুভব করছেন!

আগুন-ঝরা দৃষ্টিতে অশোক তাকায় কিরীটীর মুখের দিকে একবার, তারপরই তার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়।

আর আজকের এই অভিনয়ের দৃশ্যটা কাল যখন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ছবি-সহ প্রকাশিত হবে, ভাবুন তো কত বড় একটা surprise হবে দর্শকবৃন্দের কাছে—যদিও সে সময় তাদের মুখের চেহারাটা আপনি দেখতে পাবেন না! কিরীটী বলে।

অশোক নীরব।

একটি শব্দও তার মুখ দিয়ে বের হয় না।

অদূরে একটি চমৎকার জাপানী ওয়াল-ক্লক দেওয়ালে বসানো ছিল। সেই ক্লকে ঢং ঢং করে রাত চারটে ঘোষণা করল।

কিরীটী বলে, শম্ভু, রাত তো শেষ হয়ে এল প্রায়। তুমি তোমার আসামীকে নিয়ে যাও, আমরাও বাড়ি যাই।

সৌরীন কুণ্ডুও এতক্ষণ যেন পাথরের মত স্তব্ধ অনড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ব্যাপারটা তার কাছে শুধু আকস্মিকই নয়, কল্পনারও অতীত ছিল বোধহয়।

চলুন সৌরীনবাবু!

চলুন।

পরের দিন সন্ধ্যার দিকে থানায় বসে শম্ভু চাটুয্যে ও সৌরীন কুণ্ডুর সঙ্গে গত রাত্রের ব্যাপারটারই আলোচনা প্রসঙ্গে কিরীটী বলছিল, ঘটনাচক্রে শকুন্তলা হত্যার ব্যাপারটা ইনভেসটিগেট্ করতে করতে আমি অশোকের সন্ধানে শম্ভুর ওখানে না গেলে সেদিন সন্ধ্যায় হয়তো ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত একটা মীমাংসাই হত না।

সৌরীন কুণ্ডু জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু অশোককে আপনি সন্দেহ করলেন কি করে?

দুটি কারণে—কিরীটী বলে, ওর প্রতি আমার সন্দেহ জাগে—প্রথমতঃ

মায়ার সঙ্গে ওর রীতিমত ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা যেটা আপনাদের কাছ থেকেই জেনেছিলাম ; দ্বিতীয়তঃ তার সে-রাত্রে সুটিং ক্যানসেল্ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা—যা উনি বরাবর নিজের আত্মরক্ষার জন্য চমৎকার ভাবে একটা alibi-র সৃষ্টি করেছিলেন।

কি রকম ? শম্ভু শুধায়।

প্রথমতঃ উনি যে প্রকৃতির লোক তাতে করে সে-রাত্রে সুটিং ক্যানসেল হওয়ায়—সেটা উনি আগে থাকতে জানতে নিশ্চয়ই পেরেছিলেন, তাই থিয়েটার থেকে বের হয়ে কোন বিশেষ জায়গায় বা কোন স্ত্রীলোকের কাছে যদি যেতেনই সেটা বলবার ওঁর কোন বাধা থাকবার কথা নয়। তবু উনি বলতে চাননি। একান্ত ব্যক্তিগত বলে এড়িয়ে গিয়েছেন এবং এড়িয়ে যাচ্ছিলেন বলেই মনে আমার প্রশ্ন জাগে—কোথায় তবে তিনি ছিলেন শো ভাঙবার পর—রাত্রি আড়াইটে পর্যন্ত কি করেছিলেন ! কেনই বা বলতে চাইছেন না সে কথাটা !

কিরীটী একটু থেমে বলে, কিন্তু প্রশ্নই জেগেছিল মনে—কোন সলুশন্ যেন খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পেলাম অলক্তবাবু ও প্রদীপবাবুর কথায়।

কোন্ কথায় তাদের ? শম্ভু চাটুয্যে প্রশ্ন করে।

মায়া দেবীর একটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল বরাবরই, সে কারণেই হয়তো সে অশোককে ভয় করে নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে চেয়েছিল—এমন কি সে কারণে সে নিজের দেহটা পর্যন্ত অশোকের হাতে তুলে দিয়েছিল। অবিশ্যি এটা সম্পূর্ণই আমার অনুমান, মায়া দেবী যখন তার স্বার্থের খাতিরে আরও নিবিড় করে অশোককে আঁকড়ে ধরতে চায় এবং যার ফলে হয়তো বেচারী শকুন্তলার মতই অন্তঃসত্ত্বা হয় তখন হয়তো অশোক মরীয়া হয়েই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য শেষ পর্যন্ত তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার প্ল্যান করে রূপলালকে টাকা দিয়ে হাত করে।

মায়া was pregnant ? সৌরীন কুণ্ডু প্রশ্ন করে।

কিরীটী বলে, হ্যাঁ—পোস্টমর্টেম্ রিপোর্টে তাই বলেছে।

কিন্তু—

একটা কথা ভুলে যেও না শম্ভু। অশোকের মত লোকের সাধ মিটে গেলে অযথা ঝামেলা বয়ে বেড়াবার আর ইচ্ছা কোনদিনই থাকে না। যাহোক যা বলছিলাম—তাহলেও সে নিজের হাতে কাজটা করতে চায়নি হয়তো, অতি সহজেই সন্দেহটা তার উপরেই এসে পড়বে বলে। অথচ মায়াকে সরানো দরকার। অনন্যোপায় হয়েই তখন রূপলালের সাহায্য তাকে নিতে হয়েছিল হয়তো।

কিন্তু রূপলালের হাতে কাজের ভারটা তুলে দিলও, পুরোপুরি তাকে বিশ্বাস করতে পারেনি অশোক, তাই অকুস্থানের আশেপাশেই কাজটা যখন সম্পন্ন হয় তাকে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল।

তাহলে তুমি বলতে চাও কিরীটী—

হ্যাঁ শম্ভু, হত্যার সময় অশোক অকুস্থানের আশেপাশেই কোথাও ছিল, সে আদৌ সে-রাত্রে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মঞ্চ ছেড়ে যায়নি এবং সেই যে এক নারীর উপস্থিতি—যাকে লাবণ্য প্যাসেজে দেখেছিল, সম্ভবতঃ সে-ই আমাদের অশোক—

বল কি !

অন্ততঃ তাই আমার অনুমান। কিন্তু গলাটা শুকিয়ে উঠেছে, একটু চায়ের ব্যবস্থা কর শম্ভু।

বাইশ

শম্ভু তাড়াতাড়ি একজনকে ডেকে তিন কাপ চায়ের কথা বলে দেয়। একটু পরেই চা এল।

চা-পানের পর কিরীটী আবার শুরু করেঃ

এখন কথা হচ্ছে, রূপলালকে সন্দেহ করলাম আমি কেন? রূপলালকে প্রথম দেখেই আমি চমকে উঠেছিলাম। মাথার চুলের বাহার পাল্টে দিলেও তার চোখ নাক ও থুতনী চোয়ালের কাটিংটা সে বদলাতে পারেনি, আর সেটা কারও পক্ষে সম্ভবও নয়। প্রত্যেক মানুষেরই মুখের কাটিং বা ডৌলের একটি বিশেষত্ব থাকে নিজের নিজের। ছেদীলাল বা রূপলালেরও তা আছে। বহু ক্ষেত্রেই ঐ মুখের গঠন ও চেহরা মানুষের ভেতরটাকে প্রতিফলিত করে এবং দেখতে জানলে তো চোখে পড়ে।

সৌরীন কুণ্ডু ঐ সময় বলে, কিন্তু গত দু'বছরে রূপলাল যে এত বড় একটা ক্রিমিন্যাল হতে পারে আমার কখনও তা মনে হয়নি।

রূপলাল স্টেজে অভিনয় না করলেও, তার ভিতরে একটা অভিনয় প্রতিভা ছিল সৌরীনবাবু। আর সেই অভিনয়ের দ্বারাই সে আপনাদের সকলকে প্রতারিত করেছে। অশোক হয়তো কোনক্রমে রূপলালের আসল পরিচয়টা জানতে পেরেছিল—নিজের মনের আয়নাতেই রূপলালকে প্রতিফলিত করে। তারপর সে হয়তো রূপলালের সম্পর্কে আরও খোঁজখবর করে রূপলালের সত্য পরিচয়টা কিছু কিছু জানতে পারে।

কিন্তু রূপলালই যে হত্যাকারী বুঝলেন কি করে রায় মশাই?

সৌরীন কুণ্ডু আবার প্রশ্ন করে।

কিরীটী বলে, ভেবে দেখুন সমগ্র ঘটনাটা। মায়াকে তার সাজঘরেই হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যাকারী আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে সাজঘরের মধ্যে মায়া দেবীর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় ছিল। সেটা কার পক্ষে সম্ভব? একমাত্র ঐ থিয়েটারেরই কারও—বিশেষ করে যাদের ঐ সাজঘরে গতায়াতের সুবিধা ছিল তাদের পক্ষে সম্ভব। রূপলালের হাতেই ছিল মঞ্চের সব দেখাশুনা করা ও চাবি দেওয়ার ভার। মঞ্চ থেকে সে-ই যেত সবার শেষে ঘরে ঘরে সব চাবি দিয়ে।

কিন্তু মায়া রূপলালকে ঘরে দেখে ঐ সময়—

চেঁচায়নি বা কিছু বলারও সুবিধা পায়নি! কিরীটী সৌরীন কুণ্ডুকে থামিয়ে দিয়ে বলে, তার আগেই অতর্কিতে রূপলাল তার বলিষ্ঠ হাতে মায়া দেবীর মুখ বন্ধ করে গলায় রুমাল পেঁচিয়ে তাকে হত্যা করে সাজঘরের আলোটা নিভিয়ে দেয় বা সাজঘরের আলো হয়তো আগেই নিভিয়ে রেখেছিল এবং অন্ধকারেই সব কিছু করেছিল।

তারপর?

তারপর তো খুব সোজা। অন্ধকার ঘর দেখে লাবণ্য মায়া চলে গিয়েছে ভেবে চলে যায় এবং রূপলাল সেই সময় হয়তো সাজঘর থেকে বের হয়ে আসে এবং ঘটনাটা সম্ভবতঃ রাত নটা চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে কোন এক সময় ঘটে।

আচ্ছা শকুন্তলা দেবীকে অশোক হত্যা করেছিল কেন?

সম্ভবতঃ শকুন্তলা অশোককে ছাড়তে চায়নি বলে, অথচ শকুন্তলার সাধ তখন অশোকবাবুর মিটে গিয়েছিল।

তাই বলে হত্যা—

কারণ সেখানেও ব্যাপারটা চরমে উঠেছিল।

কি রকম?

অবিনাশলিঙ্গম শকুন্তলার স্বামী মধ্যে মধ্যে ট্যুরে যেত। আর সেই সময়ই অশোক শকুন্তলার ফ্ল্যাটে যেত। শকুন্তলা হয়তো যখন দেখল অশোককে ধরে রাখতে পারবে না, আর তখনই তাকে তার মা হবার সংবাদ দিয়ে ভয় দেখায়—তবে আমার ধারণা—অশোকবাবু যাই বলুক, অবিনাশ-লিঙ্গম যে পুরুষত্বহীনতায় ভুগছিল সে কথাটা পুরোপুরি না জানলেও একটা অনুমান করতে পেরেছিল, তাই শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়েই অশোকবাবু তার পথের কাঁটা শকুন্তলা দেবীকে ইহলোক সরিয়ে দেয়! কিন্তু তখন সে কল্পনা করতে পারেনি—অবিনাশলিঙ্গমের দিক থেকে একটা উল্টো চাপ আসতে পারে।

উল্টো চাপ? সৌরীন কুণ্ডু প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। তা ছাড়া আর কি! অবিনাশলিঙ্গম অশোকের সঙ্গে তার স্ত্রীর হৃদ্যতার ব্যাপারটা জানত না যে এমন নয় এবং জেনেশুনেও সে চুপ করেই ছিল কতকটা অনন্যোপায় হয়েই। কিন্তু সে জানতে পারেনি শকুন্তলা মা হতে চলেছে। ময়না-তদন্তে সেই রহস্য প্রকাশ হবার পরই তার সন্দেহ গিয়ে পড়ে অশোকের ওপরে। সে তাকে চাপ দেয়—ভয় দেখায়। অনন্যোপায় অশোক তখন অবিনাশের মুখ টাকা দিয়ে বন্ধ করে। কিন্তু তার বোঝা উচিত ছিল ব্ল্যাক-মেলিং একবার শুরু হলে তার আর শেষ হয় না, বরং ক্রমশঃ সেটা চক্র-বৃদ্ধিহারে বেড়েই চলতে থাকে—আর হয়েছিলও তাই।

একটু হেসে কিরীটী বলে, হয়তো অবিনাশলিঙ্গমের ব্যাপারটা অশোক

ইতিমধ্যে চুকিয়েই ফেলত, যদি না মায়া দেবীর সঙ্গে সে ইতিমধ্যে জড়িয়ে পড়ত। ফলে তাকে মায়াকে শেষ পর্যন্ত সরাতে হল আর নিজেও ঐ সঙ্গে উদঘাটিত হয়ে গেল। পাপ এমনি জিনিস সৌরীনবাবু যে তা চাপা তো থাকেই না বরং চাপা দেবার চেষ্টা করলে আরও পাপের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয়।

কিরীটী থামল।

কিন্তু রাত অনেক হল—এবারে আমি উঠব। কিরীটী উঠে দাঁড়ায়। বাইরে রাত তখন ঝিম্ ঝিম করছে।

মণিকুণ্ডল

বছর চারেক আগের কথা।

সেবার জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝিই কলকাতা শহরে এমন প্রচণ্ড গরম পড়েছিল যে, বাইরে একটু বেরুলেই মনে হত যেন গা-হাত ঝলসে গেল। হাওয়াতে যেন একটা আগুনের ঝাপটা। বেলা দশটার পরই বাড়ির বাইরে বের হয় কার সাধ্য।

কিরীটীকে বলে বলে হয়রান হয়েই শেষ পর্যন্ত এবং কিছুতেই তার দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে—কৃষ্ণা একাই চলে গিয়েছিল মাসখানেকের জন্য অনেক বছর পরে কলম্বোতে তার দূরসম্পর্কীয় এক কাকার কাছে। কৃষ্ণার কাকা রুস্তমজী বহুবার সাদর সস্নেহ আহ্বান জানিয়েছেন কৃষ্ণা ও কিরীটীকে তার ওখানে একটিবার দিনকয়েকের জন্য আসতে। কিন্তু কিরীটীর মত করাতে পারেনি বলে কৃষ্ণারও শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি।

সেবারেও প্রত্যেকবারের মত রুস্তমজী ওদের তাঁর ওখানে যাবার জন্য যখন চিঠি লিখলেন এবং সেবারে একটু অভিমান করেই কৃষ্ণা কিরীটীকে বলল, চল না কাকার ওখান থেকে ঘুরে আসি কিছুদিনের জন্য! তাঁর কাছে একটিবার যাবার জন্য বারে বারে কাকা আমাদের অমন করে লিখছেন—বুড়ো হয়েছেন আর কদিনই বা বাঁচবেন!

কিরীটী মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিল, তুমি যাও না।

আমি!

কিরীটী কিছুদিন ধরেই কি সব জুয়েল্‌স্‌ সম্পর্কে নানা ধরনের বই ঘাঁটাঘাঁটি করছিল, তখনও একটা বই হাতে ছিল, বললে, হ্যাঁ।

কেন তুমি?

আমার মানে ঠিক কোথাও এখন যেতে ইচ্ছে করছে না।

তবু কৃষ্ণা বললে, চল না, এই গরমে সমুদ্রের ধারে বেশ লাগবে।

নোনা হাওয়াটা আমার তেমন আবার সহ্য হয় না।

যাবে না তাহলে?

লক্ষ্মীটি, প্লীজ—তুমিই যাও।

কৃষ্ণা শেষ পর্যন্ত কিছুটা অভিমান করে একা একদিন প্লেনে উঠে বসল।

কৃষ্ণা চলে যাবার দিন-দুই পরে সকাল বেলাতেই কিরীটীর ওখানে গিয়ে হাজির হলাম দিনটা আড্ডা দিয়ে কাটাব বলে। বেলা তখন প্রায় দুটো হবে।

বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করে আগুনের হলকা যেন বাতাসে। ঘরের সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ করে ফ্যানটা চালিয়ে স্বল্প আলোয়-আঁধারিতে আমি সোফার উপরে শুয়ে ছিলাম আর কিরীটী একটা ছোট টেবিল ল্যাম্প জেলে জুয়েল্‌স্‌ সম্পর্কে কি একটা বই পড়ছিল।

বললাম, কৃষ্ণা কবে গেল কলম্বো?

কিরীটী বললে, দিন-দুই হল।

তুই গেলি না যে?

দূর—এই বেশ আছি—ছোটাছুটি আর ভাল লাগে না।

তা অত কি মনোযোগ দিয়ে পড়ছিস?

পড়ছি সব বিচিত্র মণিমুক্তা হীরা প্রবালের কাহিনী। সত্যি খুব interesting! বলতে বলতে আবার সে তার পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে যেন ডুবে গেল।

জংলী এসে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল, হাতে তার ট্রেতে দু গ্লাস কচি আমের ঠাণ্ডা শরবৎ।

শরবৎ এনেছিস জংলী?

জী।

ভাল না হলে কিন্তু গাট্টা খাবি! বললাম আমি।

ঠিক ঐ সময় নীচে সদরের কলিং বেলটা ডিং-ডং শব্দে বার-দুই থেকে থেকে বেজে উঠল।

কে এল আবার এই গরমে—এই দুপুর রোদে! আমিই শরবতের গ্লাসটা নিতে নিতে বললাম।

কিরীটী কোন উচ্চবাচ্য করল না। বইয়ের পাতার মধ্যে তার অখণ্ড মনোযোগ। মনে হলনা এতটুকুও ব্যাঘাত ঘটিয়েছে ঐ কলিং বেলের ডিং-ডং শব্দ।

আবার বেলটা বেজে উঠল, ডিং-ডং! থেকে থেকে দুবার।

ঠাকুর নেই নীচে জংলী? আমিই শুধাই এবার, কে যেন কলিং বেল বাজাচ্ছে।

না, দেখি—সে এইমাত্র বের হয়ে গেল। জংলী কথাটা বলতে বলতে হাতের ট্রে-টা আমাদের সামনে নামিয়ে রেখে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আমি একটা শরবতের গেলাস তুলে নিলাম। কিরীটী কিন্তু যেমন তার হাতের বইয়ের পাতার মধ্যে ডুবে ছিল তেমনিই রইল। ডিং-ডং বেলের আওয়াজ বা আমাদের কথাবার্তার সামান্যতম অংশও যে কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে তার দিকে তাকিয়ে তা মনে হল না। একটু পরেই জংলী ফিরে এল।

বাবুজী!

কে রে জংলী? প্রশ্নটা করলাম আমিই।

বোরখা পরা একজন মেয়েছেলে। জংলী বললে।

কিরীটীর দিকে তাকিয়ে এবারে ওকে ডাকলাম, কিরীটী—এই!

উঁ?

তোর সঙ্গে বোধহয় কেউ দেখা করতে চায়—

ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত করে এবারে আমার মুখের দিকে তাকাল কিরীটী। চোখেমুখে তার স্পষ্ট একটা বিরক্তর ভাব যেন।

জংলী আবার বললে, কোন বড়ঘরের মেয়েছেলে বলে মনে হল বাবুজী!

কি চায় ? কিরীটীই এবারে একটু যেন বিরক্তিভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

তা জানি না, তবে বললেন, আপনার সঙ্গেই দেখা করতে চায়। কি সব নাকি দরকার।

বলে দে, এখন দেখা হবে না। আমি নেই।

আমি যে বলে এলাম আপনি আছেন! জংলী কাঁচুমাচু মুখ করে বললে অপরাধীর মত।

বেশ করেছ ভূত কোথাকার!

এই দুপুর রোদে এই গরমে যখন এসেছেন ভদ্রমহিলা, নিশ্চয়ই খুব প্রয়োজনেই এসেছেন তোর কাছে, এই ঘরেই ডেকে নিয়ে আসুক। কি বলিস ?

অসময়ে যত সব ঝুটঝামেলা! কিরীটীর বইটা বন্ধ করতে করতে বললে।

যা জংলী, এই ঘরেই নিয়ে আয়। বললাম আমি।

জংলী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মিনিট পাঁচেক বাদে এক ঝলক মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়-অন্ধকার ঘরের মধ্যে যিনি জংলীর পিছনে পিছনে এসে পদার্পণ করলেন, তাঁর বয়স কত, কি রকম দেখতে কিছু না বোঝা গেলেও কালো দামী রেশমী বোরখার অন্তরাল থেকে ও পায়ের দামী পাদুকা থেকে ও পরিধেয় শাড়ির সাচ্চা দামী জরির পাড় থেকেই যেটুকু বোঝা গেল তা হচ্ছে আগন্তুক মহিলা যে ই হোক না কেন, কোন বড় ও ধনীঘরের ঘরণী।

মহিলা ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। একটু ইতস্ততঃ সংকোচের ভাব।

বললাম, বসুন।

কিরীটী কথা বলল না দেখে আমাকেই বলতে হল কথাটা।

আগন্তুক বোরখা পরিহিতা মহিলা এগিয়ে গিয়ে একটা সোফায় বসলেন।

জংলী, আলোটা জেবলে দে! বললাম আমি।

কিন্তু আমার কথায় বাধা দিলেন আগন্তুক মহিলা, না না, আলোর কোন দরকার নেই—এই বেশ আছে।

সুরেলা ও মিষ্টি গলা। শুধু তাই নয়, গলার স্বর ও সামান্য উচ্চারিত দুটি কথার মধ্যে দিয়েই একটা সংস্কৃতি ও আভিজাত্য প্রকাশ পেল।

কিরীটী একটু থেমে বলল, ঠিক আছে, তুই যা জংলী।

কিরীটীর নির্দেশে জংলী ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আমি মিঃ কিরীটী রায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই। মহিলা বললেন এবারে একটু যেন দ্বিধান্বিত ভাবেই।

আমি মিঃ রায়, বলুন! কিরীটী বললে।

ভদ্রমহিলা যেন তবু একটু ইতস্ততঃ করেন, মনে হল ঘরের মধ্যে আমার

উপস্থিতিই হয়তো তার কারণ।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কিরীটী বলল, ও সুব্রত—আমার একান্ত পরিজন নিশ্চিতে আপনি ওর সামনে যা বলবার আপনার বলতে পারেন।

আমি আপনার কাছে এসেছিলাম মিঃ রায় একটু বিশেষ দরকারে।

বলুন!

মিঃ রায়, আমি বিশেষ একটা বিপদে পড়েই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

কিন্তু আপনার পরিচয়টা তো এখনও জানতে পারিনি। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

পরিচয় দেবার মত অবিশ্যি বিশেষ কিছুই নেই। বলতে বলতে ভদ্রমহিলা তার মুখের সামনের বোরখার কাটা অংশটা হাত দিয়ে তুলে মাথার উপরে ফেলে দিলেন। আবছা আলো-অন্ধকার হলেও বুঝতে কষ্ট হল না, মহিলা যেই হোন না কেন এবং বর্তমানে অন্ততঃ বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হলেও, বোঝা গেল যৌবনকালে তিনি বেশ সুন্দরীই ছিলেন।

সুন্দর মুখখানি। সামান্য একটু লম্বাটে ধরনের গড়ন মুখের। টানা টানা দুটি সুর্মা-আঁকা চোখ। চোখে-মুখে পাতলা প্রসাধনের প্রলেপ। গলায় একটা দামী মুক্তার মালা। পরনের শাড়িটার জমি কালো।

আমাকে আপনারা বেগম জেরিনা বলেই জানবেন। আমার স্বামী আজও নামে নবাব সাহেব হলেও এবং এককালে প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী থাকলেও, এখন আর বলতে গেলে দিল্লী হায়দারাবাদ ও কলকাতা শহরে খানপাঁচেক বড় বড় বাড়ি ছাড়া বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই। হ্যাঁ, আর একটা কথাও বলা দরকার -গোটা পাঁচেক ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আছে আমার স্বামীর!

আপনার স্বামী কোথাকার নবাব? কি নাম বলুন তো?

বললাম তো, নবাবী অনেক দিনই নীলামে উঠেছে—এখন ঐ নামটুকুও মানে ঐ খেতাবটুকুই নামের লেজুর হিসাবে অবশিষ্ট আছে, তাই কোথাকার নবাব ছিলেন সে কথা জেনেই বা কি হবে!

বোঝা গেল ভদ্রমহিলা কেবল যে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী তাই নয় নিজের সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতনও। কথাও ঠিক যতটুকু বলার তার বেশী মুখ খুলবেন না উনি। এবং স্বামীর পরিচয়টাও দিতে ইচ্ছুক নন।

কিরীটী ওঁর দিকে তাকিয়ে এবারে মনে হল যেন মৃদু হাসল।

দুই

বেশ, কিরীটী বললে, অতঃপর তাহলে বলুন কি জন্য আমার কাছে এসেছেন?

হ্যাঁ, সেই ভাল। তারপর একটু থেমে একটু যেন মনে মনে ভেবে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বেগমসাহেবা বললেন, বুঝতেই পারছেন বোধহয় ব্যাপারটা আমি গোপন রাখতে চাই। এমন কি আমি যে এখানে এসেছি, আপনার সাহায্য-প্রার্থী হয়েছি—সে কথাটাও যেন আমার স্বামী ঘুণাক্ষরে জানতে বা বুঝতে না

পারেন

বেশ। তাই হবে—বলুন –

কথাটা তাহলে গোড়া থেকেই বলি—আমার যিনি শাশুড়ীর শাশুড়ী ছিলেন তিনি ছিলেন হিন্দুর ঘরের ব্রাহ্মণের কন্যা অর্থাৎ নবাব সাহেবের পিতামহী ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে, ভালবেসে তিনি তাঁর সমাজ, ধর্ম ঘর সব ছেড়ে চলে এসেছিলেন একদিন। শুনেছি তাঁর নাম অর্থাৎ হিন্দু নাম ছিল মহালক্ষ্মী এবং বিবাহের পরও সে নাম তিনি বর্জন করেননি—বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছিলেন বেগম আলী।

বেগম সাহেবার গলার স্বরটি ভারী মিষ্টি আগেই বলেছি। বলার ভঙ্গিটিও ভারী সুন্দর। দেখলাম কেবল আমিই নই, কিরীটীও যেন গভীর আগ্রহে শুনছে ওঁর কথা। ওর মুখের ক্ষণপূর্বের বিরক্তির ভাবটা যেন চলে গিয়েছে। বরং সে জায়গায় চোখে মুখে তার একটা চাপা আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে।

বেগমসাহেবা ঐ পর্যন্ত বলে একটু থেমে মৃদু হেসে বললেন, অতীতে কথাটা এই জন্য সামান্য বললাম যে, এবারে যা বলব অতীতের ঐ ব্যাপারটুকু পূর্বে আপনার জানা থাকলে আমার বর্তমান উদ্বেগের ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হবে না! আগেই বলেছি, বিশেষ একটা ব্যাপারে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি, সেটা হচ্ছে একজোড়া মণিকুণ্ডল।

মণিকুণ্ডল? কিরীটী অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বললে।

হ্যাঁ, ওটা ছিল বেগম আলীর। বিবাহের পর পাঁচ-সাত বছরেও যখন তাঁদের কোন সন্তানাদি হল না তখন সন্তান কামনায় একবার তিনি আর তাঁর স্বামী নবাব ফকিরুদ্দীন আলী আগ্রার ফতেপুর সিক্রীতে বেড়াতে গিয়ে এক ফকির সাহেবের কাছ থেকে একজোড়া কুণ্ডল আশীর্বাদ হিসাবে পান। কুণ্ডল-জোড়া ছিল সামান্য সরু তামার তৈরী – পরে নবাব সাহেব সেটা অর্থাৎ সেই তামার কুণ্ডলজোড়া সোনা দিয়ে মুড়িয়ে বারোটা বারোটা ছোট ছোট হীরা বসিয়ে বেগমকে দিয়েছিলেন। কারণ ফকির সাহেব বলেছিলেন, ঐ কুণ্ডল-জোড়া পরলে সন্তান হবেই এবং যতদিন কোন নারীর কর্ণভূষণ হয়ে থাকবে ততদিন সে থাকবে স্বামী-সোহাগিনী এবং স্বামী কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় পতিত হবে না।

সেই থেকেই আমার স্বামীর বংশে রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল তাঁর বেগমরা ঐ কর্ণভূষণ সর্বদা কর্ণে ধারণ করে থাকবেন।

বেগমসাহেবা ঐ পর্যন্ত বলে থামলেন।

কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বললে, মনে হচ্ছে আপনার কথা শুনে বেগমসাহেবা সেই মণিকুণ্ডল আপনার খোয়া গিয়েছে তাই নয় কি?

সঙ্গে সঙ্গে বেগমসাহেবা কিরীটীর প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। ঠোঁট দুটি তাঁর বার-দুই বেশ কেঁপে উঠল কেবল আর দু'চোখের মণি দুটো যেন অশ্রুতে ছল-ছল করে উঠল। রুদ্ধগলায় বেগম বললেন, হ্যাঁ রায় সাহেব।

তবে সেই কুণ্ডলজোড়া ঠিক খোয়া যায়নি—

তবে ?

চুরি হয়ে গিয়েছে।

চুরি !

হ্যাঁ।

কুণ্ডলজোড়া অবশ্যই মনে হচ্ছে সর্বক্ষণই আপনার কানেই থাকত, তাই নয় কি ?

হ্যাঁ।

তবে ? তবে খোয়া গেল কি করে ?

জানি না কি করে কি ঘটল। দিন-কুড়ি আগে এক প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে গোসলখানায় যাচ্ছি। আমার দাসী মরিয়ম আমায় বললে, বেগমসাহেবা আপনার কুণ্ডল ? তাড়াতাড়ি কানে হাত দিলাম, দেখলাম কানে কুণ্ডল নেই। তোলপাড় করে তারপর বিছানাপত্র সারা বাড়ি খোঁজা হল কিন্তু কুণ্ডলজোড়া আর খুঁজে পেলাম না। আজ পর্যন্ত পাইনি।

যেদিন সকালে আপনি জানতে পারলেন আপনার কানে কুণ্ডলজোড়া নেই তার আগের রাত্রে আপনার ঠিক কি মনে আছে কুণ্ডলজোড়া আপনার কানেই ছিল শয়নের পূর্বে ?

হ্যাঁ—স্পষ্ট মনে আছে। তবে—

তবে ?

আগের রাত্রে আমাদের গৃহে খানাপিনা ছিল। কিছু মেহ্‌মান এসেছিল। রাত্রে যখন খানাপিনার পর শুতে যাই দু'চোখ আমার ঘুমে যেন জড়িয়ে আসছিল। সাধারণতঃ আমি রাত বারোটা সাড়ে বারোটার আগে ঘুমোই না, কিন্তু সে রাত্রে সাড়ে দশটা না বাজতে বাজতেই ঘুমে যেন আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম।

কিছুটা বুঝতে পারছি। কিরীটী বললে, তারপর ?

কি বুঝতে পারছেন ?

কোন কিছু খাইয়ে হয়তো আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার কান থেকে ঐ কুণ্ডল কেউ চুরি করে নিয়েছে।

কিন্তু—

কি ?

আমার শোবার ঘরেও ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ছিল। নিজে আমি দরজা বন্ধ করে প্রত্যহ শুতাম এবং সে-রাত্রেও শুয়েছিলাম এবং পরের দিন সকালে মরিয়মের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙার পর দরজা খুলে দিই।

তবু জানবেন যা আপনি বললেন তা যদি সত্য হয় তো যে করে হোক চোর আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে আপনার ঘুমের ঘোরেই কাজ হাসিল করেছে। যাক, সে তো পরের কথা। আগে একটা কথার জবাব দিন।

বলুন ?

ঐ কুণ্ডল চুরির ব্যাপারে কাউকে আপনি কি সন্দেহ করেন ?

বেগমসাহেবা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, করি একজনকে, কারণ তার ঐ কুণ্ডলের প্রতি বরাবরই লোভ ছিল।

কে ?

ছোটি বেগম নুরেন্নেসা।

ছোটি বেগম ! তাহলে কি আপনার স্বামীর দুই বেগম ? দুই স্ত্রী ?

হ্যাঁ। বছর তিনেক হল নুরেন্নেসাকে তিনি সাদী করেছেন। অবিশ্যি দ্বিতীয়বার সাদী তিনি করতে চাননি কিছুতেই, আমারই পীড়াপীড়িতে সাদী করেন।

কি রকম ?

আমার পর পর দুটি সন্তান হয়ে মারা যায় তারপর আর কোন সন্তান হয়নি তাই দ্বিতীয়বার সাদী করেছেন তিনি। আমারই একান্ত ইচ্ছায়।

ছোটি বেগম কোথায় থাকেন ? কিরীটী জিজ্ঞাসা করল।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও থাকতেন ঐ বাড়িতে - কিন্তু যে রাত্রে ঘটনাটা ঘটে তার সাতদিন আগে এক মাসের জন্য সে তার আব্বাজানের গৃহে গিয়েছিল। ওখানে উপস্থিত ছিল না সে রাত্রে সে।

এখন ? এখন সে কোথায় আছে ? সেখানেই কি ?

আমীর আলী অ্যাভিনুর বাড়িতে—তার আব্বাজানের কাছে।

কিরীটী অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর আবার প্রশ্ন করল।

তিন

বেগমসাহেবা ?

কিরীটীর ডাকে উনি ওর দিকে মুখ তুলে তাকালেন, বলুন ?

আপনি ঠিক জানেন যেদিন প্রত্যুষে আপনি আবিষ্কার করলেন যে আপনার মণিকুণ্ডল আপনার কানে নেই, তার আগের রাত্রে শুতে যাবার সময় সেটা আপনার কানেই ছিল ?

হ্যাঁ ছিল। একটু আগেই বললাম তো আপনাকে সে কথা।

আপনি একটু আগে বলেছিলেন সে রাত্রে আপনার অত্যন্ত ঘুম পাচ্ছিল।

তা পাচ্ছিল ঠিকই, তাহলেও স্পষ্ট আমার মনে আছে কারণ ঘুম পেলেও শোবার আগে জামাকাপড় ছেড়ে যখন শুতে যাই তখনও ছিল সেটা আমার কানে, তাছাড়া ঐ কুণ্ডল সম্পর্কে আমি সর্বক্ষণ অত্যন্ত সচেতন থাকতাম বুঝতেই পারছেন।

আপনি তাহলে ঐ কুণ্ডলের ব্যাপারে ছোটি বেগমসাহেবাকেই সন্দেহ করেন ?

সে ছাড়া আর কে নিতে পারে বলুন? মৃদুকণ্ঠে এবারে বেগমসাহেবা বললেন, ওই একজনকেই করি সন্দেহ।

তার কাছে আছে কিনা কুণ্ডলজোড়া খোঁজ নিয়েছিলেন?

নিয়েছিলাম, কিন্তু—

কেমন করে খোঁজ নিলেন?

মরিয়মকে পাঠিয়ে।

মরিয়মকে আপনি নিশ্চয়ই খুব বিশ্বাস করেন?

নিশ্চয়ই করি। তাছাড়া—

বলুন?

কিন্তু সে যদি না-ই নেবে তাহলে দশদিন বাদে ফিরে আসবে বলে এখনও সে ফিরছে না কেন?

তাই কথা ছিল বুঝি?

দিন দশেকের মধ্যে আমায় বলেছিল ফিরে আসবে, কিন্তু এক মাসের বেশী হয়ে গেল এখনও সে আসছে না। আর আসবেও না কোন দিন হয়তো—এখন বুঝতে পারছি।

কি করে বুঝলেন?

সন্দেহের আমার আরও কারণ আছে। শুনুন, ঐ কুণ্ডলজোড়া আমার খোয়া যাবার পর থেকেই আমার স্বামীর ব্যবহারে রীতিমত পরিবর্তন দেখছি।

কি রকম?

ছোটি বেগমকে বিয়ে করলেও বেশীর ভাগ রাতেই আমার স্বামী তাঁর নিজের শোবার ঘরেই রাত্রে শুতেন। ঐ কুণ্ডল খোয়া যাবার পর থেকেই ক্রমশঃ ওঁর ব্যবহারে আমার প্রতি পরিবর্তন হতে শুরু করল। আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলেন না। দশটা প্রশ্ন করলে একটার জবাব দেন। কথায় কথায় চটে ওঠেন। তারপর গত দশ দিন হল তো তিনি রাত্রে ঐ ছোটি বেগমের ওখানেই কাটাচ্ছেন। অর্থাৎ আমীর আলী য়্যাভিনুর বাড়িতে তিনি আছেন। ঐ আমীর আলী য়্যাভিনুতেই আমার স্বামীর একটা বাড়ি ছিল। এতদিন তার সব তলাগুলোতেই ভাড়াটে ছিল। তিনতলার ভাড়াটেদের উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে. নতুন করে ফ্ল্যাটটা ডিস্‌টেম্পার করে সাজানো হচ্ছে—ঐখানেই নাকি ছোটি বেগম আর আমার স্বামী থাকবেন। তারপর একটু থেমে আবার জেরিনা বেগম বললেন, সন্দেহ হওয়ায় আমি ছোটি বেগমের সঙ্গে দেখা করবার বহু চেষ্টা করেছি কিন্তু সে আমার সঙ্গে দেখা করেনি।

কি বলেছে সে?

বলেছে আমার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। দেখা করবে না সে।

আপনার স্বামী নবাব সাহেব, তিনি কি বলেন?

গত দশদিন তো তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎই হয় না। মিঃ রায়, আমার এক

বান্ধবীর মুখে শুনেছি আপনি অসাধ্য সাধন করতে পারেন। আমি আর কিছু চাই না, দয়া করে আমার কুণ্ডল দুটো উদ্ধার করে দিন। যে ইনাম আপনি চান আমি দিতে রাজী আছি।

দেখুন বেগমসাহেবা, আপনার মুখ থেকে সব শুনে এবং যা বললেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে যতদূর মনে হচ্ছে আপাততঃ ব্যাপারটার মধ্যে আর যাই থাক আপনার সেণ্টিমেণ্টের ব্যাপারটাই বেশী এবং সবটাই একটা সম্পূর্ণ পারিবারিক ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আমি কি তবে আপনার সাহায্য পাব না?

আপনি যা বললেন তা যদি সত্যিই হয় বললাম তো সাহায্য আপনাকে আমি করব কথা দিচ্ছি, কিন্তু ঠিক কি ভাবে সাহায্য করতে পারব ও সক্ষম হব সেজন্য দুটো দিন আমাকে ভেবে দেখতে দিন। আজ বুধবার—শনিবার এই সময় আপনি আসবেন তখন ভেবে দেখা যাবে কতটুকু কি ভাবে আপনার সাহায্যে আমি লাগতে পারি।

কিন্তু—

শুনুন, আপনি হয়তো জানেন না আপনার স্বামী নবাব সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। নবাব সমশের আলী আপনার স্বামীর নাম, তাই নয় কি?

মাথাটা এবার নীচু করে বেগমসাহেবা বললেন, হ্যাঁ।

কড়েয়া মার্কেটের কাছাকাছি আপনাদের বাড়ি, 'রতন মঞ্জিল'।

হ্যাঁ।

আচ্ছা আর একটা একটা কথা—

বলুন?

আপনার কুণ্ডল দুটো হারানোর কথা বা আপনার সন্দেহের কথা নবাব সাহেবকে আপনি বলেননি তো?

না।

খুব ভাল করেছেন। আপাততঃ বলবেন না দেখা হলেও।

দেখা হবেই না।

মৃদু হেসে কিরীটী বলে, হতেও তো পারে। আপনাদের সম্পর্ক তো দুদিনের নয়, কত বছরের বলুন তো! নিশ্চয়ই তাঁকে আপনার কাছে ফিরে আসতে হবে—আপনার এত বড় ভালবাসা মিথ্যা হবে না।

আসবে না আর সে আমি জানি। বলতে বলতে চোখ দুটো জলে ভরে আসে বেগমসাহেবার। গলাটা রুদ্ধ হয়ে আসে যেন এবং রুদ্ধ গলায় বলেন, ছোটি বেগমের সঙ্গে তো ইচ্ছা করেই আমি আমার স্বামীর সাদী দিয়েছি। আমার বয়স হয়ে গিয়েছে, তার বয়স অল্প—পুরুষের মন ঐ দিকেই ঝুঁকবে আমি জানি। তা ঝুঁকুক—সে-ই ভোগ করুক স্বামীকে। সমস্ত সোনাদানা সব সে নিক—কেবল কুণ্ডল দুটো আমায় ফিরিয়ে দিক। আমি আমার

স্বামীর ঐ অবহেলা আর সহ্য করতে পারছি না মিঃ রায়। শেষের দিকে গলাটা ভেঙে গেল। দু হাতে মুখ ঢাকলেন বেগমসাহেবা।

আমরা দুজনে অল্পদূরে বিস্ময়াভিভূত হয়ে বসে রইলাম। কি বলব বুঝতে পারি না।

একটু পরে বেগমসাহেবা নিজেকেই নিজে সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন।

বোরখাটা মুখের উপর টেনে দিয়ে বললেন, আমি তাহলে আসি।

আসুন।

ধীর শান্ত পদে বেগমসাহেবা অতঃপর ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

দুজনে আরও কিছুক্ষণ আমরা চুপচাপ যেমন বসেছিলাম তেমনিই বসে রইলাম।

কিরীটী! মৃদু গলায় ডাকলাম।

উঁ? কিরীটী মুখ তুলল আমার ডাকে।

কি মনে হয়?

কিসের কি মনে হয়!

ছোটি বেগমই মণিকুণ্ডলটা নিয়েছে মনে হচ্ছে—

তোর কি মনে হয়? পাল্টা প্রশ্ন করল আমাকে কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে।

আমারও মনে হয় ছোটি বেগমেরই কাজ ওটা। মানে ঐ কুণ্ডল দুটো—স্বামী-সোহাগিনী হবার জন্য—

কিরীটী মৃদু হাসল নিঃশব্দে।

হাসছিস যে?

এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা যায় না।

কেন?

ছোটি বেগমকে চাক্ষুষ না দেখে এবং সম্ভব হলে তার সঙ্গে পরিচয় না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হবে না সুব্রত, তাই তো দুটো দিন সময় নিলাম।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু ছোটি বেগমের দেখা পাবিই বা কোথায় আর পরিচয়ই বা কেমন করে হবে তার সঙ্গে?

হয়তো কালই হতে পারে। নবাব সাহেবের সঙ্গে যখন পরিচয় আছে আমার!

চার

কি বলছিস! কাল তোর সঙ্গে ছোটি বেগমের দেখা হতে পারে? কেমন করে, কোথায়? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

শুনলি না বেগমসাহেবাকে বললাম নবাব সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে!

হ্যাঁ, কিন্তু—

আগামীকাল অজন্তা হোটেলে একটা ফাংশন আছে না ?

তা তো জানি। বললাম আমি।

সেখানে আমার নিমন্ত্রণ আছে। শুনেছি নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন নবাব সাহেবও আছেন।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। যদি সেখানে ছোটি বেগমও আসেন—

যদি না আসেন ?

মনে হয় আসবেন, কারণ—

কারণ ?

বেগমসাহেবার কাছে যা শুনলাম, আর তা যদি সত্যিই হয় তাহলেও মনে হয় ছোটি বেগম তাঁর স্বামীকে একা ছেড়ে দেবেন না। আর তা যদি হয় কালকের ফাংশানে ছোটি বেগমসাহেবার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাওয়াটাও এমন কিছু বিচিত্র নয়। যাক সে পরের কথা পরে ভাবলেও চলবে, আপাততঃ একটা কাজ করতে হবে।

কি ?

আমাদের জুলি চ্যাটার্জীকে একবার দরকার। দেখ তো ফোন করে ভদ্রমহিলা আছেন কিনা ?

আমি বললাম, এখন তাকে বাড়িতে পাওয়া যাবে ?

দেখ না একবার ফোনে ট্রাই করে !

উঠে গেলাম ফোনের কাছে ঘরের কোণে। জুলি চ্যাটার্জী সোসাইটির একজন নামকরা মহিলা, শহরের যতপ্রকার কঠিন ও বড় বড় ফাংশানের ব্যাপারে একজন বিশেষ পাণ্ডা, কনভেণ্টে পড়া মেয়ে, অত্যন্ত আধুনিকা। বিলেতেও বছর পাঁচেক একসময় কাটিয়েছিলেন, বিবাহ করেছিলেন এক পাঞ্জাবী কর্ণেলকে কিন্তু সে সম্পর্কটা বেশী দিন টেকেনি।

বিবাহ বছর পাঁচেক বাদেই ডিসমিস হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে সোসাইটিতে একজন তিনি ফ্রি লানসার, চিরন্তন উর্বশী–নহ মাতা নহ কন্যা। বয়স যদিও হয়েছে চল্লিশের কাছাকাছি, তাহলেও দেহের বাঁধুনী সাজসজ্জা ও প্রসাধনের জন্য মনে হয় বছর পঁচিশ-ত্রিশের বেশী বয়স হবে না জুলি চ্যাটার্জীর।

ফোনে মিস জুলি চ্যাটার্জীকে পাওয়া গেল। আমার সঙ্গেও অল্পবিস্তর আলাপ ছিল ভদ্রমহিলার।

হ্যালো ? পরিচিত কণ্ঠস্বর ওপার থেকে কানে ভেসে এল।

মিস চ্যাটার্জী ?

স্পিকিং—

আমি সুব্রত। কিরীটী আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়, ধরুন।

কিরীটী এসে ফোনটা ধরল, মিস চ্যাটার্জী!

হঠাৎ রহস্যভেদীর আমাকে প্রয়োজন হল কেন? প্রশ্ন ভেসে এল।

একটু কাজ করে দিতে হবে।

Alawys at yout service—

কাল অজন্তা হোটেলে যে ফাংশান আছে—

আপনাকে তো invitation card পাঠিয়েছি, আসবেন তো!

যাব! শুনেছি নবাব সমশের আলীও আমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন।

ঠিকই শুনেছেন।

তার ছোটি বেগমকে নিমন্ত্রণ করেননি?

কে—নুরকে? Sure! আর সে আসছেও।

আসবেন?

নিশ্চিন্ত থাকুন, আসবে, কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো?

মৃদু হেসে কিরীটী বললে, ক্রমশঃ প্রকাশ্য। তার আগে বলুন তো ঐ নুরেন্নেসা বেগমের সঙ্গে আপনার কতটা আলাপ?

শোনেননি তার নাম? এককালে তো সে সোসাইটির মধ্যমণি ছিল!

তাই বুঝি?

হ্যাঁ।

তাহলে পর্দানশীন নন?

আদৌ না।

ঠিক আছে, পার্টি'র দিন আবার দেখা হবে—bye-bye! কিরীটী ফোনটা রেখে দিল।

ব্যাপারটা নিয়ে কিরীটী কতখানি চিন্তা করছিল জানি না, তবে আমার মনের মধ্যে স্বভাবতই যে চিন্তাটা উদয় হয়েছিল—বড় বেগমসাহেবার ধারণাই যদি সত্য হয় অর্থাৎ কুণ্ডলজোড়া নুরেন্নেসাই যদি স্বামী-সোহাগিনী হবার জন্য হাতিয়ে থাকেন, তার অজ্ঞাতে কৌশলে সেটা কিরীটী কেমন করে আবার ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হবে! আর তাই যদি সে না পারবে তো ঐভাবে সে কিছুতেই বেগমসাহেবাকে নিশ্চিত আশ্বাস দিত না!

সেদিন আমার ফেরা হয়নি। কিরীটী অনুরোধ করেছিল, দুটো দিন ওর বাড়িতে থাকবার জন্য। সেই ব্যবস্থামতই বাড়িতে ফোন করে আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম ভৃত্যকে। তাছাড়া বাড়িতেই বা কে আছে আমার! বাড়িও যা কিরীটীর গৃহও তাই।

ঐদিনই বিকালের দিকে দুজনে দাবার ছক পেতে বসেছিলাম। দুপুর থেকে আকাশে মেঘ জমেছে, হয়তো একটা হাওয়ার ঘূর্ণি উঠতে পারে বা কয়েক ফোটা বৃষ্টিও হতে পারে—কালবৈশাখী। কিন্তু কিছুই হল না শেষ পর্যন্ত। সামান্য একটু হাওয়া দিয়ে মেঘ কেটে গেল এক সময়। আমরা দাবার মধ্যে যেন ডুবে গিয়েছিলাম—হঠাৎ জংলীর ডাক কানে এল, বাবুজী—

কিরীটী দাবার ছক থেকে মুখ না তুলেই বললে, বাজার থেকে মাংস নিয়ে আয়, ভাল করে স্টু তৈরী কর।

জংলী বললে, সেই বোরখা-পরা মেয়েলোকটি আবার এসেছে। উপরে নিয়ে আসব ?

কিরীটী দাবার ছক থেকে মুখও তুলল না, সাড়াও দিল না। আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকালাম, কে এসেছে !

কালকের সেই বোরখা-পরা মেয়েছেলেটি। একবার দেখা করতে চায়।

এই কিরীটী ?

উঁ ! কিরীটীর দৃষ্টি তখনও দাবার ছকের উপরই স্থিরনিবদ্ধ।

কালকের সেই বেগমসাহেবা বোধ হয় আবার এসেছেন তোর সঙ্গে দেখা করতে—

কে ?

নবাব সমশের আলীর বড় বেগমসাহেবা— জেরিনা বেগম !

কিস্তি সামলা সুব্রত। কিরীটী আমার কথার জবাবে বললে, আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে।

কিস্তি সামলাচ্ছি ! ওদিকে বেগমসাহেবা নীচে অপেক্ষা করছেন !

আবার কি হল ভদ্রমহিলার ? এই ভূত, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? যা, এই ঘরে নিয়ে আয়।

বলা বাহুল্য, জংলী চলে গেল এবং একটু পরেই তার সঙ্গে সঙ্গে বোরখা-পরিহিতা ভদ্রমহিলা এসে ঘরে ঢুকলেন।

বসুন বেগমসাহেবা, আবার কি হল ? আমি তো কালই বলে দিলাম আপনাকে—দুটো দিন—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, বোরখা অপসারিত করলেন ভদ্রমহিলা এবং পরম বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা আবিষ্কার করলাম কালকের বেগমসাহেবা নন— অন্য এক নারী। বয়স তেইশ-চব্বিশের বেশী হবে না মহিলার। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম কিন্তু মুখখানা অপূর্ব এক শ্রীতে যেন ঢল ঢল করছে। প্রসাধনের সূক্ষ্ম একটা প্রলেপ আছে বটে মুখে, কিন্তু তা না হলেও কিছু এসে যেত না বোধ হয়। টানা টানা দুটি গভীর আঁখিপক্ষ্মে ঢাকা চোখ—সূক্ষ্ম সুর্মার টান।

ক্ষমা করবেন—বুঝতে পারছি আপনারা বোধ হয় ভেবেছিলেন গতকাল যিনি আপনাদের কাছে এসেছিলেন আমি সে-ই—আমি নবাব সমশের আলীর ছোটি বেগম নুরেন্নেসা।

বলাই বাহুল্য, আমাদের বিস্ময়টা তখন অনেকটা কেটে গিয়েছে।

নুরেন্নেসা বেগম বললেন, আমি অবিশ্যি বোরখা ব্যবহার করি না বিশেষ আমাদের কোন সামাজিক অনুষ্ঠান ছাড়া। কিন্তু তবে কেন বোরখায় নিজেকে ঢেকে এসেছি ভাবছেন বোধ করি—কারণ আমি যে এখানে এসেছি কেউ জানুক তা আমি চাই না।

কিরীটী মৃদু হাসল। জবাবে কিছু বলল না।

গতকাল দিদি এসেছিলেন আপনার কাছে মিঃ রায়! কিরীটীর দিকে তাকিয়েই এবার বেগম কথাটা বললেন।

কিন্তু আপনি জানলেন কি করে? কিরীটী প্রশ্ন করল।

যেমন করেই হোক জানতে পেরেছি।

তবে তো নিশ্চয়ই জানেন—

কেন তিনি আপনার কাছে এসেছিলেন, তাই না? হ্যাঁ, তাও জানি। মণিকুণ্ডলের জন্য এসেছিলেন।

তাই। কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কি করে?

সে আর এমন কষ্ট কি! বহুবার কাগজে আপনার ছবি দেখেছি।

ওঃ। তা আমার সঙ্গে আপনার কি প্রয়োজন বলুন তো এবার?

বিশেষ কিছু না। কেবল আপনাকে একটা কথা জানাতে এসেছি।

কি?

সে কুণ্ডল কোথায় আমি জানিও না—চুরিও আমি করিনি, আর চুরি করবার কখনও কোন প্রয়োজনও আমার দিক থেকে দেখা দেয়নি—যদিও তার ধারণা সেটা আমিই নিয়েছি।

শুধুমাত্র ঐটুকু বলতেই এসেছেন আমার কাছে এত কষ্ট করে?

আরও একটা কারণ আছে বৈকি আসবার আপনার এখানে!

কি বলুন তো?

আমি জানি আমার স্বামী আপনার পরিচিত, তাই চাই না এসব কথা আমার স্বামীর কানে ওঠে।

তা উঠলেই বা, ক্ষতি কি?

আছে।

কি বলুন তো?

দেখুন, আপনাকে বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই। আসলে কুণ্ডলজোড়া আদৌ খোয়া যায়নি—তার কাছেই আছে, মানে দিদির হেপাজতেই আছে।

কিন্তু—

সমস্ত ব্যাপারটাই তার আমার স্বামীর চোখে একটা ধোঁকা দেওয়া।

ধোঁকা! কেন?

সব কথা পরিষ্কার করে বললেই হয়তো ব্যাপারটা আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে মিঃ রায়। কথাটা বলে ছোটি বেগমসাহেবা একটু থামলেন। মনে হল যেন ভিতরে ভিতরে তিনি নিজেকে একটু গুছিয়ে নিচ্ছেন।

দেখুন মিঃ রায়, ব্যাপারটা একান্ত আমাদের পারিবারিক, তবু বলছি—দিদি আপনাকে ঐ কুণ্ডল সম্পর্কে কি বলেছেন জানি না, আসলে আমার স্বামীর বংশের কিছু রেয়ার জুয়েল্‌স্‌ আছে—জুয়েল্‌স্‌গুলো একটা বিশেষ ধরনের তৈরী ছোট আয়রন সেফের মধ্যে আছে—

বলুন, থামলেন কেন ?

সেই সেফের চাবিই হচ্ছে ঐ কুণ্ডলজোড়া !

আমরা কতকটা যেন অভিভূতের মতই ছোটি বেগমের বর্ণিত কাহিনী শুনতে থাকি। ছোটি বেগম বলতে থাকেন, আয়রন সেফের গায়ে দুটো ফোকর আছে। ঐ কুণ্ডলজোড়া সেই ফোকরের মধ্যে বসিয়ে ঘোরালেই তবে সেফ খুলবে। ঐ কুণ্ডলের গায়ে ছোট ছোট কতকগুলো ছিলা কাটা আছে। সেই ছিলাগুলোই চাবির কাজ করে ফোকরের মধ্যে। বুঝতে পেরেছেন বোধ হয় !

কিছুটা। কিন্তু তিনি বলছিলেন ঐ কুণ্ডল এক ফকিরের দান—

বলেছেন বুঝি ! যাক্ শুনুন, যা বলছিলাম, নবাব সাহেব মানে আমার স্বামী কিছু জুয়েল্স সেফ থেকে বের করে আমায় দেবেন জানতে পেরেই বড় বেগম হয়তো ঐ গল্প তৈরী করেছেন। কুণ্ডলজোড়া নিজেই সরিয়ে ফেলে এমন ভাবে আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়েছেন যে—

যে সবাই বিশ্বাস করে আপনিই সে দুটো চুরি করেছেন।

হ্যাঁ। তাছাড়া আরও ভেবে দেখুন, ঐ কুণ্ডলজোড়া চুরি যাবার আগেই আমি ঐ বাড়ি থেকে চলে এসেছি এবং যেদিন ঐ কুণ্ডলজোড়া চুরি গিয়েছে বলে উনি বলছেন সে দিন ঐ বাড়ির ধারে কাছেও আমি ছিলাম না।

বড় বেগম কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে গিয়েছেন। কিরীটী বললে।

জানি। স্বামী-সোহাগিনী হবার এক আরব্য কাহিনী তো ! ও সব স্রেফ বাজে কথা।

কোন্‌টা বাজে কথা ? ঐ কুণ্ডলজোড়া কি নবাব সাহেবের মাতামহীর নয় ?

হ্যাঁ, তা অবিশ্যি ঠিক।

কোন এক ফকির সাহেব আশীর্বাদী হিসাবে ঐ কুণ্ডলজোড়া নবাব সাহেবের মাতামহীকে দিয়েছিলেন, তাও কি সত্য নয় ?

না। ওটা তৈরী করে দিয়েছিলেন ওঁর পিতামহই—এবং তৈরী করে কেন ওঁকে পরতে বলেছিলেন সর্বক্ষণ তাও তো বললাম একটু আগে। কোন ফকির-টকিরের ব্যাপার ওর মধ্যে নেই।

পাঁচ

আর কিছু বোধ হয় আপনার বলবার নেই বেগমসাহেবা ? কিরীটী শান্ত গলায় বললে এবারে।

না। কেবল অনুরোধ আপনার কাছে, সব তো শুনলেন, অনুগ্রহ করে আমাদের এই পারিবারিক ব্যাপারে মাথা গলাবেন না।

জুয়েল্সের ভাগ আপনার চাই না ? হঠাৎ প্রশ্নটা করল কিরীটী।

কিরীটীর আকস্মিক প্রশ্নটা যেন মুহূর্তের জন্য ছোটি বেগমকে কেমন

বিহ্বল করে দেয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর মুখের সে ভাবটা যেন কেটে যায়। তিনি শান্ত গলায় বলেন না।

চান না ?

না। উনিই ভোগ করুন ওগুলো।

তবে আর কি—ব্যাপারটা তো মিটেই গেল! কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

ঠিক বলছেন ? এবারে পাল্টা প্রশ্ন করলেন ভ্রূ তুলে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছোটি বেগমসাহেবা।

বেঠিক বলব কেন। আপনাদের ঘরোয়া ব্যাপার যদি আপনারাই মিটিয়ে নিতে পারেন তবে তো আর কোন গোলমালই থাকে না। বাইরের কারও নাক গলাবার কিছু থাকে না।

আরও একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে মিঃ রায়!

বলুন।

বড় বেগমসাহেবা সম্পর্কে যে কথাগুলো আপনাকে বললাম, সেটা যেন একমাত্র আমাদের পরস্পরের মধ্যে থাকে। ছোটি বেগমসাহেবা বললেন

কিরীটী প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসল।

আমি তাহলে চলি—নমস্কার।

নমস্কার।

ছোটি বেগম উঠে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন! যাবার সময় অবিশ্যি বোরখাটা দিয়ে আবার নিজেকে আবৃত করে নিলেন। ছোটি বেগমের যাবার শব্দ সিঁড়িতে মিলোতেই কিরীটী উঠে গিয়ে রাস্তার দিকে জানলার পাল্লাটা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল। আমিও তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দেখলাম ক্রীম রংয়ের একটা নতুন অ্যামবাসাডার গাড়ি। কিরীটীর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। ছোটি বেগমসাহেবা কিরীটীর বাড়ি থেকে বের হয়ে সেই গাড়িতেই গিয়ে উঠলেন! উপর থেকে মনে হল আরও একজন কেউ গাড়ির মধ্যে ছিল এবং গাড়িটা এতক্ষণ ওঁর জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

গাড়িটা ছেড়ে দৃষ্টিপথ থেকে মিলিয়ে যেতেই কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বললে, যাক, অন্তত একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল!

জিজ্ঞাসা করলাম, কি ?

বড় বেগমসাহেবার কুণ্ডলজোড়া হারানোর বা চুরি যাওয়ার সত্যিকারের একটা reason বা কারণ খুঁজে পাওয়া গেল। তবে এও ঠিক, ব্যাপারটা যতটা সহজ ভেবেছিলাম গতকাল ঠিক বোধ হয় ততটা সহজ নয় এখন মনে হচ্ছে।

কথাগুলো বলতে বলতে কিরীটী এগিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে সোফার মধ্যস্থলে রক্ষিত গোলাকার কাচের টেবিলটার উপর সুদৃশ্য একটা রুপোর কৌটোয় রক্ষিত একটা সিগার তুলে নিয়ে লাইটারের সাহায্যে তাতে অগ্নি সংযোগ তৎপর হয়।

চুরোটটা ধরিয়ে আরাম করে টান দিয়ে পুনরায় বসতে বসতে বললে, এখন

বুঝতে পারা যাচ্ছে গতকাল দুপুরে বড় বেগমসাহেবার আমার এখানে আগমনের ব্যাপারটা। যেমন ছোটি বেগমের অজানা থাকেনি তেমনি ভদ্রমহিলা বড় বেগমসাহেবার আমার এখানে আসায় রীতিমত অস্বস্তিই বোধ করেছেন।

তার মানে বলতে চাস, বড় বেগমসাহেবার সমস্ত গতিবিধির ওপরে ছোটি বেগমের অনুচরদের সদাসতর্ক সজাগ দৃষ্টি সর্বক্ষণ রয়েছে।

তা তো আছেই। আর তাইতেই যেটা ছিল কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও ভাসা-ভাসা, একটা কুয়াশার মত—সেটাই এখন দানা বেঁধে একটা আকার নিচ্ছে। ভাগ্যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই নারীজাতি, তাই এত সহজেই দুজনের দুরকম বিবৃতির ভিতর থেকেও সত্য যা তার কিছুটা আভাস পাওয়া গেল।

কিন্তু এখন তুই কি করবি?

অবশ্যই বড় বেগমসাহেবাকেই যথাসধ্য আমার সাহায্য করব, তার ন্যায্য অধিকার ফিরে পেতে!

তোর কিন্তু মনে হয় কুণ্ডলের পিছনের সত্যিকারের ইতিহাসটা—

আপাততঃ যা মনে হচ্ছে, ছোটি বেগমসাহেবা এইমাত্র যা বলে গেলেন তাই সত্যি আর তাইতেই হয়তো স্বামীকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গে বড় বেগম-সাহেবা ঐ জুয়েল্‌স্‌গুলোও হারাতে চাননি।

স্বামীর ভাগ হারানোর ব্যাপারটা তাহলে মিথ্যে বলতে চাস?

তাই তো মনে হচ্ছে। কারণ বড় বেগমসাহেবার সম্বন্ধে সামান্য পরিচয়েই বুঝেছি, তিনি নেবোধ নন। আজ যে তাঁর পলাতক যৌবনের পক্ষে কোন পুরুষকে আর ধরে রাখা সম্ভব নয় সেটা না বুঝবার মত বুদ্ধির ঘাটতি তো নেই।

কাল ওদের সেই ফাংশানে তুই যাচ্ছিস নাকি আর?

বা, যেতে হবে বৈকি। সামনাসামনি মোকাবিলা না করলে ব্যাপারটার একটা ফয়সালা হবে কি করে! কথাটা বলে কিরীটী চোখ বুজল।

বুঝলাম আর সে আপাতত মুখ খুলবে না। কেমন করে কি ভাবে কোন পথে অতঃপর সে এগুবে তারই একটা ছক মনে মনে সে এখন খুঁজতে শুরু করেছে।

কিন্তু তখনও বুঝিনি বিস্ময়ের আরও বাকী ছিল এবং কুণ্ডলরহস্য রীতিমত জটিল। ছোটি বেগমসাহেবা চলে গিয়েছেন বোধ করি আধ ঘণ্টাও হয়নি, আবার নীচের কলিং বেলটা ডিং-ডং শব্দে অনুরণিত হয়ে উঠল।

কিরীটী শিথিলভাবে গা এলিয়ে সোফায়, পড়েছিল, বেলের ডিং-ডং শব্দে চোখ মেলে তাকাল!

আবার কে এল! কিরীটী ক্লান্ত কণ্ঠে কথা বললে।

হয়তো বড় বেগমসাহেবা! বললাম আমি।

মনে হচ্ছে, না। কিরীটী বললে।

কেন ? প্রশ্নটা করে ওর মুখের দিকে তাকালাম।

কারণ কোন নারীর অঙ্গুলীস্পর্শের ও আওয়াজ বলে মনে হচ্ছে না। কোন পুরুষের হাত কলিং বেল টিপছে।

কিরীটীর কথা শেষ হল না, সিঁড়িতে ভারী জুতোর শব্দ শোনা গেল।

ঐ সঙ্গে খালি পায়েরও শব্দ।

জুতোর শব্দ শুনে মনে হচ্ছে—কিরীটী বললে, আগন্তুক ধীরে ধীরে সমান পা ফেলে হাঁটেন, দেহের ওজনও খুব কম নয়। হাতে লাঠিও আছে। থেমে থেমে বললে কিরীটী।

কিন্তু দুজোড়া পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে! বললাম আমি।

হ্যাঁ, জংলীর পিছনে পিছনে দ্বিতীয় ব্যক্তি আসছে এবং জংলী আগন্তুককে চেনে, অর্থাৎ এখানে তার পূর্বে আগমন ঘটেছে—কিন্তু কে ?

প্রথমে জংলী ও তার পশ্চাতে বেশ মোটামত ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

চেয়ে দেখলাম কিরীটীর অনুমান মিথ্যা নয়।

আগন্তুক মেদবাহুল্যে খুব ভারী না হলেও বেশ জোয়ান চেহারা। কালো কোট। পরনে দামী সুট। হাতে একটা লাঠি।

আরে নবাব সাহেব যে—আসুন, আসুন! বলতে বলতে কিরীটী সোফার ওপরে সোজা হয়ে উঠে বসল।

বুঝলাম নবাব সাহেব যে-ই হোন কিরীটীর পূর্ব পরিচিত।

ভদ্রলোক কিরীটীর সাদর আহ্বানে মৃদু হাসলেন। তারপর এগিয়ে এসে আমাদের মুখোমুখি সোফাটার উপর উপবেশন করলেন।

পরনে আগেই বলেছি দামী সুট—সম্ভবতঃ টেরিসিল্কের—লংস ও গলাবন্ধ কোট মাথার সম্মুখের দিকে বেশ চক্‌চকে একটি টাক প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে। দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। কপালে ও গালে বয়সের ছাপ বোঝা যায়। পায়ের জুতো ঝক্‌ঝকে পালিস করা। পোষাক পোশাক ও চেহারায় একটা অভিজাত্য স্পষ্ট হয়েই যেন ফুটে উঠেছে।

বাতাইয়ের নবাব সাব—কেইসা হাল্‌চাল! কিরীটী আবার বললে।

আচ্ছাই হ্যায়। আপ কেইসা হ্যায় রায় সাব ? নবাব সাহেব বললেন। গলার স্বর ভারি ও কিছুটা যেন কর্কশ।

চলে যাচ্ছে একরকম। ভাল কথা, পরিচয় করিয়ে দিই—কথাটা বলে কিরীটী আমার দিকে তাকাল, সুব্রত—আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু, সুহৃদ, আর সুব্রত ইনি নবাব সাহেব সমশের আলী। আদি নিবাস ও জায়গীর যদিও হায়দরাবাদে—বর্তমানে কলকাতার বাসিন্দা।

নমস্তে। হাত তুলে নমস্কার জানালাম।

আদাবরস। নবাব সাহেব বললেন। তারপর একটু থেমে হেসে বললেন,

জায়গীরের কথা আর তুলছেন কেন রায় সাহেব—সে সব পাট তো কবেই খতম হয়ে গিয়েছে। এখন কোনমতে দিন গুজরান করা আর কি।

কীরীটী হাসল। বললে, তবু মরা হাতী লাখ টাকা—জানেন তো প্রবাদটা!

না, না—ও বাতকে বাত—এখন তো দিন গুজরান করাই মুশকিল!

তারপর কি সংবাদ বলুন আলী সাহেব? হঠাৎ এ গরীবকে স্মরণ কেন? কিরীটী মৃদু হাসতে হাসতে বললে।

আমি কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তখন নবাব সাহেবের মুখের দিকে চেয়েছিলাম। এই তাহলে আমাদের নবাব সমশের আলী সাহেব। যার দুই বিবি অর্থাৎ দুই বেগম—জেরিনা বেগম ও নুরেন্নেসা বেগম।

একটা বড় মুসিব্বতে ফেঁসে গিয়েছি রায় সাহেব। নবাব সাহেব বললেন।

মুসিব্বৎ! কি মুসিব্বৎ হল আবার আপনার?

সেই জন্যেই তো আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

আমার সাধ্যে যতটুকু সাহায্য সম্ভব নিশ্চয়ই আপনি পাবেন। কিরীটী বললে।

সে আমি জানি বলেই এসেছি।

বলুন শুনি।

নবাব সাহেব আমার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে কিরীটীর দিকে তাকালেন। মনে হল যেন একটু ইতস্ততঃ করেছেন।

কিরীটী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মৃদু হেসে বললে, ওর সামনে আপনার কোন সংকোচ বা দ্বিধার কোন প্রয়োজন নেই নবাব সাহেব, তাছাড়া আমার সব ব্যাপারেই ও থাকে—মদৎ দেয় - সাহস দেয়।

না না, তা নয়—মানে—

ব্যাপারটা বোধ হয় কোন পারিবারিক ব্যাপার, তাই নয় কি নবাব সাহেব! কিরীটী হঠাৎ বললে।

তাজ্জব কি বাত! আপকো কেইসে মালুম হুয়া?

কিরীটী মৃদু হাসল, অন্যের মনের বিশেষ করে যারা আমার কাছে কোন সাহায্য বা মদতের জন্য আসেন—তাঁদের গোপন কথা অনুমান করাই তো আমার কাজ। এখন বলুন ব্যাপার কি!

আমার একটা অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস খোয়া গিয়েছে রায় সাহেব—

একজোড়া মণিকুণ্ডল কি?

সোভানাল্লা! ইয়ে ভি আপকো মালুম হো গিয়া? লেকেন খোদা কি কসম—কেইসে?

নবাব সাব্, গোস্তাকি মাপ কিজিয়ে। আপকো ও সওয়াল কি জবাব ম্যায় নেই দেনে সেকতা।

কিঁউ?

অগর জরুরৎ হো তো আপকো পিছে সব কুছ বাতায়ঙ্গে—লেকেন ইসবকৎ হাম মুখ খুলনে নেহি সেকতা !

নবাব সাহেব অতঃপর কিরীটীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন নিঃশব্দে, তারপর বললেন, ঠিক হ্যায় !

কিরীটী বললে, আপনার একজোড়া মণিকুণ্ডল চুরি গিয়েছে, তাই নয় কি ?

হ্যাঁ।

কেমন করে গেল ? কবে গেল ?

তা ধরুন, দিন কুড়ি আগে ব্যাপারটা ঘটেছে !

কোথায় ছিল সেটা ?

তাজ্জবের কথা কি জানেন রায় সাহেব, কুণ্ডলজোড়া সর্বদা আমার বড় বেগমের কানেই থাকত—she was very much particular, কখনও সেটা কান থেকে খুলত না।

তাহলে বলুন, তাঁর কান থেকে চুরি গিয়েছে ?

ব্যাপারটা তাই দাঁড়াচ্ছে ! কিন্তু সেটা যে কি করে সম্ভব হতে পারে, সেটাই এখনও আমার মাথায় আসছে না !

তা আপনার বড় বেগমসাহেবা কি বলছেন ?

সে বলছে যে কিছুই জানে না।

কান থেকে কুণ্ডলজোড়া খোয়া গেল, অথচ কিছুই জানতে পারলেন না তিনি ? তা যে ঘরে তিনি শুতেন সে ঘরে কি একাই শুতেন ?

না। ওর অনেক দিনের দাসী মরিয়ম ওই ঘরেই রাত্রে শুতো।

ছয়

কিরীটী একটুক্ষণ ; প করে থেকে বললে, বরাবরই কি সেই ব্যবস্থাই চালু ছিল ?

না, আমি দ্বিতীয়বার সাদি করার পর থেকেই ঐ ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। আর একটা কথা বোধ হয় আপনাকে আমার জানানো উচিত রায় সাহেব—

বলুন ?

যেদিন সকালে জানা গেল যে বেগমসাহেবার কানে কুণ্ডলজোড়া নেই—তার আগের রাত্রে আমার বাড়িতে একটা খানাপিনার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিছু মেহমান এসেছিল—খানাপিনা চুকতে চুকতে রাত সাড়ে এগারোটা পৌনে বারোটা প্রায় গিয়েছিল।

তারপর ?

তারপর আমি আমার ঘরে শুতে যাই, বেগমসাযেবাও তাঁর ঘরে শুতে যান। আর ছোটি বেগমসাহেবা ?

সে তখন আমাদের বাড়িতে ছিল না—ঐ সময়টা সে তার আব্বাজানের

বাড়িতে ছিল।

এখন কোথায় আছেন ?

এখনও সেখানেই আছে সে মাসখানেক ধরে।

আর আপনি ?

আমিও দিন দশেক হল সেখানেই আছি।

এখন বুঝি কিছুদিন আপনি ঐখানেই থাকবেন ?

হ্যাঁ, এখনো কিছুদিন হয়তো সেখানেই আমায় থাকতে হবে। কারণ আমার ছোটি বেগমের আব্বজান মারা গিয়েছেন। তাঁর এক ছেলে আর এক মেয়ে—মানে আমার স্ত্রী, ছেলে এখানে নেই—বিলেতে ব্যারিস্টারী পড়তে গিয়েছে—দেখাশোনা সব আমাকেই করতে হচ্ছে।

হুঁ। আপনার ধারণা তাহলে ঐ কুণ্ডলজোড়া কেউ চুরি করেছে বা সরিয়ে ফেলেছে !

তাই।

কেন, সামান্য একজোড়া কুণ্ডল—তার জন্য আপনি এত ব্যস্ত হয়েছেন ? কুণ্ডলটার কোন বিশেষত্ব আছে নাকি ?

আছে বলেই আপনার সাহায্যের জন্য আমি এসেছি।

বিশেষত্বটা কি যদি বলেন—

আমাদের পূর্বপুরুষের কিছু রেয়ার দামী জুয়েল্‌স্‌ আছে। সেগুলো একটা আয়রন সেফের মধ্যে আছে এবং সেই আয়রন সেফের চাবিই ঐ কুণ্ডলজোড়া।

কি রকম ?

সেফের গায়ে কুণ্ডলের সাইজের দুটো ফোকর আছে, সেই ফোকরের মধ্যে ঐ কুণ্ডল পাশাপাশি বসিয়ে ঘোরালেই তবে সেফ খোলে।

I see !

বুঝতেই পারছেন, ঐ সেফের জুয়েল্‌স্‌গুলোর লোভেই কেউ নিশ্চয়ই কুণ্ডল জোড়া সরিয়েছে !

সেফটা কোথায় ?

সেটা আমাদের কড়েয়া ষ্ট্রীটের বাড়ির দোতলার একটা ঘরে দেওয়ালের মধ্যে গেঁথে বসানো আছে।

নবাব সাহেব ?

বলুন।

আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন ঐ কুণ্ডল চুরির ব্যাপারে ?

সরম কি বাত, তবু না বলে পারছি না—করি।

কাকে ?

আমার নিজের বড় বেগমসাহেবাকেই আমার সন্দেহ।

কেন ? তার সরিয়ে লাভ কি ?

জুয়েল্‌স্‌গুলো নেবে, তাই—

আপনি তাঁকে সে সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন ?

করেছি।

তিনি কি বলেন ?

সে বলে, নেয়নি।

আর কাউকে সন্দেহ হয় কি ?

আর কাকে সন্দেহ করতে পারি বলুন ! কুণ্ডলজোড়া সর্বক্ষণ যখন বড় বেগমের কানেই থাকত !

তা ঠিক। আচ্ছা আপনার কড়েয়ার বাড়িতে আর কে আছে ?

বড় বেগম আর তার এক চাচাতো ভাই ও দাস-দাসীরা।

চাচাতো ভাই ঐ বাড়িতে বরাবরই থাকেন কি ?

না। আজ বছর খানেক হল এসেছে।

বয়স কত তাঁর ?

বছর ত্রিশ হবে। ব্যাচিলার।

কি করেন তিনি ?

কি সব ব্যবসা করে—আমি ঠিক জানি না।

তাঁকে সন্দেহ হয় না আপনার ?

না।

খানাপিনার রাত্রে তিনি ছিলেন ঐ বাড়িতে ?

ছিল।

দাস-দাসীদের কাউকে সন্দেহ করেন না ?

না। তারা অনেক দিনের পুরানো লোক—খুব বিশ্বাসী।

যদি কিছু মনে না করেন—আজ ভাবছি আপনার কড়েয়ার বাড়িতে আমি গিয়ে সরেজমিন তদন্ত করতে চাই।

বেশ তো। কখন যাবেন বলুন ?

এই ধরুন রাত আটটা সোয়া আটটা নাগাদ।

বেশ ! আমাকে নিশ্চয়ই থাকতে হবে !

নিশ্চয়ই। তবে আমি যাবার ঘণ্টাখানেক পর আপনি গেলেই ভাল হয় সেখানে। অতঃপর নবাব সাহেব বিদায় নিলেন সম্মত হয়ে।

ঐ দিনই রাত আটটা নাগাদ আমি আর কিরীটী নবাব সাহেবের আদি বসতবাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। বিরাট বাড়ি। একতলা ও দোতলা ভাড়া দেওয়া। তিনতলা ও চারতলা সবটা নিয়ে বড় বেগমসাহেবা থাকেন।

আমাদের আগমনের সংবাদ দিতেই বড় বেগমসাহেবা ডেকে পাঠালেন তাঁর প্রৌঢ় ভৃত্য ইসমাইলকে দিয়ে।

তিনতলায় বিরাট সাজানো-গোছানো একটা পারলার। সেখানে সব দামী

দামী ও ভারি ভারি আসবাবপত্রে ঘরটা সাজানো।

ঘরে আমরা ঢুকতেই বেগমসাহেবা আমাদের সাদর আহ্বান জানালেন, আইয়ে আইয়ে রায় সাব! আপনি আসবেন একটা খবর দিয়ে এলেই পারতেন!

ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল—বেগমসাহেবা একাই ছিলেন।

আগে আসবার কথা মনে হয়নি বেগমসাহেবা। হঠাৎ মনে হল আপনি চলে আসবার পর, বাড়িটা একবার দেখেশুনে যাই নিজের চোখে। আপনার শোবার ঘরটা বিশেষ করে—

চলুন। কেবল আমার শোবার ঘরটাই দেখবেন, না—

না, যে ঘরের দেওয়ালে সেফটা বসানো সে ঘরটাও একবার দেখব।

বেশ। আগে ঠাণ্ডা বা গরম কিছু আনতে বলি!

না, না—তার এখন কিছু প্রয়োজন নেই। আগে ঘর দুটো দেখি।

বেশ, চলুন।

সকলে আমরা বেগমসাহেবার সঙ্গে প্রথমেই তাঁর শয়নঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। কক্ষের মধ্যে পা দিয়েই আমাদের দুজনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল—এক নারী।

বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশী হবে না। রোগা ছিপছিপে গঠন। পরনে একটি রঙিন শাড়ি, হাতে এক গোছা করে কাচের চুড়ি। নারীর গায়ের রং কালো হলেও অপূর্ব মুখশ্রী। আর যৌবন যেন দেহে টলটল করছে।

সে শয্যা ঠিক করছিল, আমাদের ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে তাকাল। সুর্মাটানা দুটি চোখ। চোখের দৃষ্টিতে যেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঝিলিক।

বেগমসাহেবাই পরিচয় দিলেন, আমার দাসী মরিয়ম!

কিরীটী কোন উচ্চবাচ্য করল না। সে তখন ঘরের চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকাচ্ছিল।

বেশ বড় সাইজের ঘর। ঘরে প্রবেশের দুটি দরজা। একটি বোধহয় আমরা যে দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছিলাম, সেটা ছাড়া পাশের ঘরে যাবার জন্য মধ্যবর্তী দরজা। ঘরের সংলগ্ন বাথরুম বা টয়লেট।

দেওয়াল থেকে পাশাপাশি দুটো সেকেলে কারুকার্য-করা ভারী সেগুন-কাঠের আলমারি। একটার পাল্লায় প্রমাণ সাইজের আরশি বসানো।

অন্যদিকে একটা সেকেলে ড্রেসিং টেবিল। তার পাশে একটি রেডিও সেট ও ত্রিপয়। ত্রিপয়ের ওপর একটা ফ্রেমে নবাব সাহেবের একটা ফটো। আরও একটা ব্যাপার নজরে পড়ল, দেওয়ালে টাঙানো গোটাতিনেক বড় সাইজের সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো বিদেশী চিত্রকরের আঁকা নগ্ন নারীমূর্তির ছবি। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় সেকেলে বড় একটি পালঙ্ক।

এইটাই আপনার শয়নকক্ষ? কিরীটী প্রশ্ন করল।

জী।

এই ঘরেই সে রাত্রে শুয়েছিলেন আপনি ?

জী।

ঐ যে পাশের দরজাটা, ওটা—

ওটা পাশের ঘরের অর্থাৎ আমার স্বামীর শোবার ঘরে যাবার।

দরজাটা বোধহয় দুদিক থেকেই বন্ধ করা যায় ?

জী।

সে রাত্রে বন্ধ ছিল ?

হ্যাঁ—আমি বন্ধ করে শুয়েছিলাম।

আর টয়লেটে যাবার দরজাটা ?

সেটাও বন্ধ ছিল।

কিরীটীর প্রশ্নোত্তরের মধ্যেই ঠক ঠক করে লাঠির শব্দ করতে করতে একজন ভিতরে প্রবেশ করল। রোগা লম্বা—তার দেহের গড়ন বেশ বলিষ্ঠ —বয়স ত্রিশ-বত্রিশ বলেই মনে হয়। টকটকে গৌর গাত্রবর্ণ—বাঁ পা-টা বোধহয় পঙ্গু, টেনে টেনে চলেন—পরনে ঢোলা পায়জামা ও চুড়িদার পাঞ্জাবি।

দেখলেই বেশ শৌখীন বলে মনে হয়।

জেরিনা, বলে কথা বলতে গিয়ে যুবক থেমে গেল। এঁরা—

ইনি রায় সাহেব, আর উনি ওঁর বন্ধু। রায় সাহেব, ইনি আমার চাচাতো ভাই তাজুদ্দিন।

নমস্তে।

ভদ্রলোক তার পর আর কোন কথা না বলে জেরিনাকে সম্বোধন করেই বললেন, জেরিনা, আমি একবার এয়ার ইণ্ডিয়ার অফিসে যাচ্ছি। দেখি আমার প্যাসেজটা পাওয়া গেল কিনা।

কথাটা বলে তাজুদ্দিন সাহেব ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

উনি বুঝি কোথাও যাবেন ? কিরীটী প্রশ্ন করে বেগমসাহেবাকে।

হ্যাঁ, ও লাহোরে থাকে—ফিরে যাবে সেখানে।

এখানে বেড়াতে এসেছিলেন বুঝি ?

তা ঠিক নয় - এসেছিল ব্যবসা করতে। কিন্তু সুবিধা হল না, চলে যাচ্ছে।

কিসের ব্যবসা ?

তা ঠিক জানি না।

কিরীটী অতঃপর ঘরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল দেখে বললে, যে ঘরে আপনার আয়রন সেফটা আছে সেটা একবার দেখব !

আয়রন সেফ ?

হ্যাঁ—একটা আছে না !

হ্যাঁ—আছে।

কোথায় ?

আমার ঘরে।

চলুন।

মধ্যবর্তী দরজাটা খোলাই ছিল। সেই দরজাপথেই অতঃপর আমরা পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

সেটাও বেশ বড় ঘর। বেশ সাজানো। নিভাঁজ শয্যা পাতা পালঙ্কের ওপর।

এঘরে কে থাকেন এখন?

তাজুদ্দিন।

সাত

আয়রন সেফটা কোথায়? কিরীটী প্রশ্ন করল।

দক্ষিণ দিককার দেওয়ালে একটা বড় ছবি টাঙানো ছিল। জেরিনা বেগম এগিয়ে গিয়ে সেই ছবিটা দু'হাতে তুলে ধরলেন। ছবি অপসারিত হতেই নজরে পড়ল আমাদের সিন্দুকটার প্রতি।

সিন্দুকটা দেওয়ালের গায়ে এমন ভাবে বসানো ও দেওয়ালের রংয়ের সঙ্গে এমন ভাবে রং করা যে বুঝবার উপায় নেই চট্ করে সেখানে দেওয়ালের মধ্যে কোন সিন্দুক বসানো আছে।

কিরীটী অনেকক্ষণ ধরে সিন্দুকটা পরীক্ষা করে দেখল। সত্যিই কুণ্ডলের আকারে সিন্দুকের ডালায় পাশাপাশি দুটো খাঁজ কাটা।

রায় সাহেব! হঠাৎ জেরিনার প্রশ্নে কিরীটী ওর দিকে ফিরে তাকাল।

কিছু বলছিলেন?

সিন্দুকের কথা আপনি কার কাছে শুনলেন?

সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী জবাব দিল, শুনেছিলাম একদিন নবাব সাহেবের কাছেই। আর—

আর!

ঐ সিন্দুকটার মধ্যে বেশ কিছু দামী রেয়ার জুয়েল্স্ আছে শুনেছিলাম।

কে বলেছেন—আমার স্বামী?

হ্যাঁ।

বাজে কথা। মিথ্যে কথা।

বাজে কথা!

হ্যাঁ। ছিল হয়তো এক সময়—কিন্তু আমার স্বামী সব নষ্ট করে ফেলেছেন—বেচে দিয়েছেন অনেক দিন আগেই।

কিরীটী কোন জবাব দিল না বেগমসাহেবার কথার।

কেবল বললে, আজ তাহলে চলি—

যাবেন?

হ্যাঁ। আমার যা দেখার ছিল, দেখা হয়ে গিয়েছে।

অতঃপর বিদায় নিয়ে ঐ ঘর ছেড়ে বের হয়ে এলাম। নীচে নামছি—হঠাৎ

সিঁড়ির বাঁকে মরিয়মের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

সে আমাদের দেখেই চট্ করে সরে গেল। কিরীটীর ব্যাপারটা নজরে পড়েছিল, সে নিম্নকণ্ঠে বললে, চকিতপ্রেক্ষণা—দেখলি সুব্রত!

বললাম, হুঁ।

নবাব সাহেবের বাড়ি থেকে বের হয়ে কিরীটী তার ড্রাইভারকে বললে, একবার এয়ার ইণ্ডিয়া অফিস ঘুরে যাবার জন্য।

বললাম, হঠাৎ এয়ার ইণ্ডিয়া অফিসে কেন!

একটু দরকার আছে।

প্রথমে এয়ার ইণ্ডিয়া অফিসে, তারপর লালবাজার ঘুরে আমরা রাত এগারোটা নাগাদ ফিরে এলাম বাড়িতে।

পরের দিন।

রাত আটটা নাগাদ কিরীটী তার ল্যাবোরেটারি রুম থেকে যখন ঘণ্টা-খানেক বাদে বের হয়ে এল দেখলাম তার বেশভূষা ও চেহারার পরিবর্তনটা লক্ষণীয়।

চিবুকে মেহেদী রাঙানো নূর দাড়ি—ঠোঁটের উপরে মোমের মাঞ্জা দেওয়া সরু গোঁফ। পরনে চুড়িদার পাঞ্জাবি ও চাপা পায়জামা। মাথায় ফেজ।

হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি কোন নবাব বংশের রহিস আদমী।

ক্ষণকাল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, এই বেশে আজকের পার্টিতে যাবি নাকি?

বেশখ। যা তুইও যা—চট্‌পট বেশভূষা বদলে আয় ঐ ঘরে গিয়ে, সব প্রস্তুত করে রেখে এসেছি। ইতিমধ্যে আমি একটা জরুরী ফোন সেরে নিই।

আমাকেও যেতে হবে নাকি?

বাঃ, যাবি না! নাটকের শেষ দৃশ্যটা কেমন অভিনয় হয়—কতটা climax এ ওঠে দেখবি না!

তুই কি আজ তবে হোটেলের ফাংশানের মধ্যেই—

সম্ভব হলে সেখানেই হয়তো যবনিকাপাত—নচেৎ—

নচেৎ?

আরও একটু এগুতে হবে।

কিন্তু আমি তো নিমন্ত্রিত নই!

সে ব্যবস্থা করে রেখেছি। নে, আর দেরি করিস না। চট্‌পট ready হয়ে নে।

পাশের ঘরে ঢুকে পোশাক বদল করতে করতে কিরীটীর গলা শোনা যেতে লাগল। এবং ফোনে কিরীটীর কথাগুলোই কানে আসতে লাগল।

কিরীটী বলছিল, তাহলে বেগমসাহেবা, ঐ কথাই রইল। আপনি প্রস্তুত হয়ে যেমন বললাম তেমনি বেশভূষা করে বাড়ি থেকে আপনার খিড়কী দরজা

দিয়ে বের হয়ে গলি অতিক্রম করে বড় রাস্তায় পড়ে একটা ট্যাক্সি নেবেন। বোরখাটা সঙ্গে নেবেন, কিন্তু ঐ সময় ব্যবহার করবেন না। না না—please, ঐ সময় বোরখা ব্যবহার করবেন না—অন্তত যদি আপনার কার্যসিদ্ধি করতে চান। ট্যাক্সিতে উঠে বোরখা পরতে পারেন। হ্যাঁ, তারপর সোজা মেট্রোর সামনে গিয়ে নেমে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। আমার গাড়ি গিয়ে ঠিক আপনার সামনে দাঁড়াবে, ড্রাইভার নেমে দরজা খুলে দেবে, আপনি উঠে পড়বেন। মনে থাকবে তো সব কথা, যা যা বললাম! নমস্কার।

কিরীটী ফোনটা রেখে দিল।

বেশভূষা করে প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে এসে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, কি ব্যাপার, এতক্ষণ বেগমসাহেবাকে তালিম দিচ্ছিলি নাকি?

হ্যাঁ। আর নিশীথবাবুর সঙ্গেও কিছু জরুরী কথা ছিল—সেরে নিলাম।

নিশীথবাবু, সলিসিটার?

হ্যাঁ।

তার সঙ্গে আবার কি কথা ছিল?

ছিল। আমি জানতাম নবাব সমশের আলীও ওঁর দীর্ঘদিনের ক্লায়েণ্ট। যাক, চল্—আর দেরি নয়। পথে আর একটা কাজ সেরে যেতে হবে।

কি কাজ?

চল্ না, দেখবি'খন।

কিরীটীর নির্দেশে গাড়ি এসে ঠাকুরদাস জুয়েলারীর শো রুমের সামনে বৌ-বাজারে থামল। কিরীটী গাড়ি থেকে নেমে গেল—আমায় মিনিট কুড়ি বসতে বলে।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে কিরীটী ফিরে এল। তার হাতে একটা প্যাকেট। গাড়িতে উঠে কিরীটী হীরা সিংকে বললে, মেট্রো সিনেমার সামনে চল হীরা সিং।

গাড়ি ছুটল।

কি কিনতে গিয়েছিলি ওখানে?

কিছু জুয়েলারী।

হঠাৎ?

মাছ ধরেছিস কখনো?

মাছ!

হ্যাঁ। বড় মাছ জল থেকে খেলিয়ে তুলতে হলে ফাতনায় গেঁথে বড় টোপই ফেলতে হয়।

মানে?

ঠিক, বন্ধু! জুয়েল্স্ উদ্ধার করতে হলে জুয়েল্স টোপেরই দরকার হয়। মণিকুণ্ডল কি আর এমনি হাতের মুঠোয় আসে! মণিহারেরও প্রয়োজন

হয়—ম্যাচিং বলতে একটা কথা আছে গহনার নারীদেহে! তার পরেই একটু থেমে বললে, বুঝবি কি করে হতভাগা—ও রত্ন তো জীবনে পেলি না!

থাক, পেয়ে কাজ নেই।

সত্যিই সুব্রত, তুই একটা **uncultured brute**!

মানে?

মানে নিজের গোঁয়ার্তুমির জন্য নিজেও বরবাদ হলি, আর কুন্তলার মত একটি মেয়ের জীবনও বরবাদ করে দিলি।

থাম্ তো!

বুঝবি একদিন—বুঝবি। কি অমূল্য রতন হেলায় হারিয়েছিস্!

আমি আর কোন কথা বললাম না। অনেক দিন পরে কুন্তলার কথাটা মনে পড়ায় মনটা যেন হঠাৎ কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। মাস তিনেক বোধহয় দেখা-সাক্ষাৎ নেই।

মেট্রোর সামনে ঠিক কিরীটীর নির্দেশমতই বোরখা পরিহিতা একজন মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিরীটী হীরা সিংকে তার সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করাতে বললে। গাড়ি থামতেই বললে, দরজা খোল দো হীরা সিং—ঐ জেনানা গাড়িমে উঠেগি।

সব যেন নিঃশব্দে সম্পন্ন হল।

বড় বেগমসাহেবা গাড়িতে উঠতে গাড়ি চলতে শুরু করে অজন্তা হোটেলের দিকে।

কিরীটী বলেছিল নাটকের শেষ দৃশ্য অভিনীত হবে আজ রাত্রেই, সম্ভবতঃ হোটেল অজন্তাতেই। কিন্তু তখনও বুঝিনি—কল্পনাও করতে পারিনি নাটকের শেষ দৃশ্যটা কি হতে পারে!

তবে নিঃসন্দেহে ভিতরে ভিতরে একটা রীতিমত উত্তেজনা অনুভব করছিলাম।

আট

বোরখা-ঢাকা বেগমসাহেবা আমাদের গাড়িতে ওঠবার পর গাড়ি পুনরায় চলতে শুরু করতেই কিরীটী তার হাতের বাক্সটা পার্শ্বস্থ উপবিষ্ট বেগম-সাহেবার হাতে দিয়ে বললে, এসুলো পরে নিন বেগমসাহেবা।

বোরখা না সরিয়েই গাড়ির আবছা-আবছা অন্ধকারে বেগমসাহেবা দেখলাম কিরীটীর দেওয়া গহনাগুলো পরে নিলেন।

আপনাকে যেমন যেমন বলেছি মনে আছে তো?

নিঃশব্দে মাথা হেলালেন বেগমসাহেবা!

হলে ঢুকে আমি আপনার পরিচয়টা সুযোগ-সুবিধামত একসময় নবাব সাহেবের সঙ্গে করিয়ে দেব। কিন্তু তার আগেই বোরখা খুলে ফেলবেন।

বেগমসাহেবা আবার সম্মতিসূচক মাথা হেলালেন।

গাড়ি একসময় আমাদের এসে অজন্তা হোটেলের সামনে দাঁড়াল। দারোয়ান গাড়ির দরজা খুলে দিল। আমরা একে একে গাড়ি থেকে নামলাম।

কার্পেট-মোড়া বিরাট লম্বা করিডোর অতিক্রম করে আমরা হোটেলের ব্যাংকোয়েট হলে প্রবেশ করলাম।

ব্যাংকোয়েট হলের মধ্যে মৃদু আলোর ব্যবস্থা ছিল। একটা ঝাপসা-ঝাপসা আলো-আঁধারি—কিন্তু তা হলেও হলের মধ্যে জমায়েত সকলেরই খুব স্পষ্ট না হলেও চেহারা ও বেশভূষা দেখা যাচ্ছিল।

শহরের যাবতীয় উচ্চ অভিজাত মহলের নরনারীই বোধহয় সে রাত্রে সেখানে জমায়েত হয়েছিল। বিচিত্র সাজ—বিচিত্র তার রং-বেরং! মনে হচ্ছিল যেন অসংখ্য রঙিন প্রজাপতি ডানা মেলে সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বহু কণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন, হাসির তরঙ্গ রণরণিয়ে চলেছে। আর চলেছে গ্লাসের পর গ্লাস মদ্যপান। নারী পুরুষ প্রত্যেকেরই হাতে ধরা গ্লাস—কেউ মধ্যে মধ্যে চুমুক দিচ্ছে, কেউ হাতে করে আলাপ করছে পাশের কোন নারী বা পুরুষের সঙ্গে।

কিরীটী গাড়িতে আসতে আসতে বেগমসাহেবাকে নির্দেশ দিয়েছিল যে হল-ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই তাঁর মুখের বোরখা অপসারিত করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি তা অপসারিত করলেন না। বুঝলাম কিরীটী নির্দেশ দিলেও তিনি বড় ঘরের পর্দানশীন বেগম বলেই হয়তো বোরখা মুখ থেকে তুলতে পারছেন না।

চিরন্তন সংস্কারের সঙ্গে স্বাভাবিক রীতিই হয়তো তাঁকে বাধা দিচ্ছে। বেগমসাহেবা প্রথমটায় আমাদের পাশে পাশেই ছিলেন। একটু পরেই লক্ষ্য করলাম তিনি আর আমাদের পাশে নেই। ভিড়ের মধ্যে কখন একসময় মিশে গিয়েছেন।

হঠাৎ এদিক ওদিক তাকাতে নজরে পড়ল আমাদের তাজুদ্দিন সাহেবকে। তিনিও এসেছেন পার্টিতে, তবে চোখে তাঁর রঙিন কাচের চশমা। তা সত্ত্বেও তাঁকে চিনতে কিন্তু আমাদের কষ্ট হল না। তাঁর সঙ্গে নবাব সাহেবে ও ছোটি বেগমসাহেবাকেও দেখতে পেলাম।

ছোটি বেগম বোরখা ব্যবহার করেননি আর যা সেজেছেন তিনি, তাঁকে মুসলমানী খানদানী সাজ বলা চলে না। আধুনিক সজ্জায় তাঁকে যেন একটি রঙীন প্রজাপতির মতই মনে হচ্ছিল।

ক্রমশঃ যত রাত বাড়তে থাকে, অফুরন্ত ঢালোয়া মদ্যপানে যেন সকলে বেসামাল ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতে থাকে।

আমরা দুজনেই দর্শক। চেয়ে চেয়ে দেখছি। তখনও জানি না কিরীটীর সে-রাত্রে ওখানে আসার আসল উদ্দেশ্যটা কি! কারণ কিরীটী এক পেগের

বেশী মদ্যপান করেনি। গ্লাসটা তার হাতেই ধরা রয়েছে। রাত্রি আরও গভীর হয়।

হঠাৎ একসময় নজরে পড়ল নবাব সাহেব ও বড় বেগমসাহেবা দুজনে হলের সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে হলঘর থেকে বের হয়ে গেলেন—বাইরের লনে।

এবং ব্যাপারটা যে কেবল আমাদের দুজনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তাই নয়, ছোটি বেগমসাহেবারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—কারণ ওঁরা হলঘর থেকে বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়, অর্থাৎ নবাব সাহেব ও বড় বেগম-সাহেবা হলঘর থেকে বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ছোটি বেগমসাহেবাও তাঁদের অনুসরণ করে হলঘর থেকে বের হয়ে গেলেন, এবং তাঁর সঙ্গে তাজুদ্দিন সাহেবও। ফিস ফিস করে বললাম, কিরীটী, ওরা যে চলে গেল!

অন্য কোথাও নয়, কিরীটী পূর্ববৎ চাপা গলায় বললে, হলের বাইরেই লন আছে, সেই লনেই সম্ভবত গেছে। আয় আমার সঙ্গে। ব্যাপার সুবিধা মনে হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত—

কিন্তু কথাটা আর শেষ করল না কিরীটী, নিঃশব্দে দ্রুত হলঘর থেকে বের হল। আমি ওকে অনুসরণ করলাম। হলের মধ্যে তখন সুরাপানে মত্ত নর-নারীদের আব্রুহীন যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার কলোচ্ছ্বাস যেন সর্বত্র বয়ে যাচ্ছে। হলঘরের আলো এত কম যে আলোছায়ার একটা অস্বচ্ছ কুয়াশা যেন সর্বত্র। এই আজকের তথাকথিত সমাজের কৃষ্টি ও আভিজাত্যের সুস্পষ্ট ছবি। সুরা-সিগারেট ও নানা ধরনের বিলাতী ও ফরাসী সুগন্ধের মিশ্রণে ঘরের বাতাস যেন গরম। অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

বাইরে এসে মুক্ত আকাশের তলে ঠাণ্ডা হাওয়ায় যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বুকে ভরে নিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাচলাম। বিস্তীর্ণ লন, চারিদিকে নানা ধরনের ফুলগাছ, মাঝখানে একটা ফোয়ারা থেকে বৃষ্টিকণার মত জল চারি-দিকে ছড়িয়ে পড়ছে নীচের জলাশয়ে অবিরাম।

এখানে ওখানে কিছু বড় বড় পামট্রি কুঞ্জ আর মধ্যে মধ্যে বসবার জায়গা! অন্ধকার রাত। চাঁদ ছিল না আকাশে—ছিল অগণিত নক্ষত্র কেবল। নক্ষত্রের স্তিমিত আলোয় একটা আলো-ছায়ার রহস্য যেন চারিদিকে সূক্ষ্ম মসলিনের পর্দার মত দুলছিল। বাইরে এসে প্রথমটায় তাই নজরে পড়েনি আমার, কিন্তু কিরীটীর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল লনের কোথায় নবাব সাহেব ও বড় বেগমসাহেবা ঘনিষ্ঠভাবে মুখোমুখি একটা হাসনুহানার ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।

কিরীটী আমার গা টিপে সেই দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মাঝখানে হাত বারো-তেরোর ব্যবধান ওদের সঙ্গে আমাদের।

কয়েকটা মুহূর্ত অপেক্ষা করেই অন্ধকারে শিকারী বিড়ালের মত পা টিপে টিপে লনের ঘাসের উপর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল কিরীটী সেই ঝোপটার। বলাই বাহুল্য, আমিও তার পিছনে পিছনে এগিয়ে চললাম।

কোন্ নাটক যে আমাদের সামনে ঐ মধ্যরাত্রে একটু পরেই অভিনীত হতে চলেছে তখন বুঝতে পারিনি। কিরীটীও কোন ইঙ্গিত মাত্র দেয়নি। তবে আমার সমস্ত সতর্ক ইন্দ্রিয় যেন বলছিল, ঘটবে—একটা কিছু ঘটবে। এবং সেই ঘটনার জন্য কিরীটী প্রস্তুত হয়েই হলঘর থেকে বের হয়ে এসেছে। যদিও ঘুণাক্ষরেও সে আমাকে এখনো পর্যন্ত কিছু জানতে দেয় নি।

একেবারে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে নবাব সাহেব ও বড় বেগমসাহেবা দাঁড়িয়ে ঝোপের ধারে ঝুপসী অন্ধকারে। একটু যেন উত্তেজিত ও চাপা কর্কশ কন্ঠে ওরা কি বলছে পরস্পরকে। বোঝবার উপায় ছিল না যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে। দেখলাম কিরীটী তখনও নিঃশব্দে ঐ ঝোপের দিকে পামট্রিগুলোর আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলেছে।

আমিও ওকে অনুসরণ করলাম। ছোটি বেগমসাহেবাকে তখনও আমি দেখতে পাইনি, অথচ তিনিও ওঁদের অনুসরণ করে হলঘর থেকে বের হয়ে এসেছিলেন ইতিমধ্যে আগেই তা বলেছি।

কাছাকাছি যেতেই ঝোপটার কাছ থেকে একটা চাপা তীক্ষ্ন কণ্ঠস্বর আমাদের কানে এল—নারীকণ্ঠস্বর, নেহি নেহি, ছোড় দিজিয়ে—মুঝে যানে দিজিয়ে! বুঝলাম বড় বেগমসাহেবা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন।

নবাবের নেশায় জড়ানো কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ইতনি জলদি মেরিজান!

তারপরই অন্ধকারে একটা ধস্তাধস্তি। আর সেই মুহূর্তে তীক্ষ্ন পুরুষ-কণ্ঠের একটা যন্ত্রণাকাতর অস্ফুট আর্তনাদ শোনা গেল।

চকিতে কিরীটী দ্রুতপায়ে সামনের দিকে অন্ধকারে ছুটে গেল।

নয়

যা ঘটবার ঘটে গিয়েছিল।

আবছা আবছা অন্ধকারে দেখলাম ঝোপের সামনে মাটিতে পড়ে একটা দেহ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দ্রুত ধাবমান একটা পদশব্দ কানে এল।

কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে ছুটল সেই ধাবমান পদশব্দ লক্ষ্য করে লনের অন্য-প্রান্তে।

হতভম্ব আমি প্রথমটায় বুঝতে পারিনি কে মাটিতে পড়ে! কিন্তু বিহ্বলতা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পকেট থেকে টর্চ বের করে আলো জ্বালাতেই সেই আলোয় সামনের দিকে নজর পড়ায় আমি যেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

পৃষ্ঠে আমূল ছুরিকাবিদ্ধ যে দেহটা পড়ে অছে উপুড় হয়ে—রক্তে ভেসে যাচ্ছে—সে আর কেউ নয়, নবাব সমশের আলী।

দেহটা তখনও মৃদু মৃদু আক্ষেপ করছিল।

নীচু হয়ে আমি ভাল করে দেখতে যাব, একটা অস্ফুট আর্ত নারীকণ্ঠ

কানে এল একেবারে আমার পশ্চাতেই।

ইয়া আল্লা!

ফিরে তাকালাম। ছোটি বেগমসাহেবা।

আশেপাশে তখন বড় বেগমসাহেবার চিহ্নমাত্রও ছিল না।

ছোটি বেগম ছুরিকাহত নবাবের রক্তাপ্লুত দেহটার সামনে বসে পড়ে তখন কাঁদতে শুরু করেছেন।

একটু পরেই কিরীটী ফিরে এল ঘটনাস্থলে।

কিরীটী!

কিরীটী আমার ডাকে কোন সাড়া না দিয়ে প্রথমেই দেহটা পরীক্ষা করল এবং নবাব সাহেবের বুক পকেট থেকে পার্সটা বের করে নিল। তারপর বললে মৃদুকণ্ঠে, সব শেষ! আমার সামান্য একটু ভুলের জন্য নবাব সাহেবকে প্রাণ দিতে হল। তবে আজ বাঁচলেও, পরে হয়তো ওঁকে আমি বাঁচাতে পারতাম না। প্রাণ ওঁকে দিতেই হত। ওঁর নিজের পাপের মাশুল ওঁকে দিতেই হত।

বলাই বাহুল্য, ব্যাপারটা চাপা রইল না।

কিরীটী ম্যানেজারকে গিয়ে সংবাদটা দিতেই পুলিসে ফোন করে দেওয়া হল।

হলের মধ্যে তখনও সুরাপান ও হৈ-হল্লা আরও চরমে উঠেছে। ওরা কিছুই জানতে পারেনি—বাইরের মর্মান্তিক ঘটনার কিছু।

মৃতদেহ পুলিসের জিম্মায় তুলে দিয়ে আমরা আরও অনেকক্ষণ সর্বত্র লনের মধ্যে ও হলঘরে বড় বেগমসাহেবার সন্ধান করলাম কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখতে পেলাম না।

কিরীটী যেন মনে হল কি ভাবছে। সে যেন বেশ চিন্তান্বিত।

ছোটি বেগমসাহেবাকে তাঁর আব্বাজানের গৃহে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ভদ্রমহিলা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন।

কিরীটী তখনও আশেপাশে অকুস্থানে হাতের জোরালো টর্চের আলো ফেলে ফেলে দেখছে। হঠাৎ মাটি থেকে কয়েকটা ভাঙা কাচের চুড়ির টুকরো ওর নজরে পড়ায় তুলে নিল নিচু হয়ে।

কি ওগুলো?

রেশমী চুড়ির টুকরো। বলতে বলতে হঠাৎ যেন কিরীটীর দু'চোখের তারা দুটো কি এক দ্যুতিতে ঝকঝক করে ওঠে। বলে, এ চুড়িগুলো চিনতে পারছিস সুব্রত!

না তো! কার?

বড় বেগমসাহেবার—।

বলিস কি। তবে কি—, একটা সম্ভাবনা যেন চকিতে আমার মনের মধ্যে উদয় হয়।

চল্, এখুনি একবার কড়েয়ায় নবাব সাহেবের বাড়িতে যেতে হবে।

দুজনে আর কালবিলম্ব না করে তখুনি বের হয়ে পড়লাম।

রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। হলের মধ্যে মদ্যপান ও হৈ-হুল্লোড়—সংযমের বাঁধ তখন বুঝি ভেঙেছে।

প্রায় মধ্যরাত্রির শীতের নির্জন পথ ধরে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে।

কিরীটী আমার পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। মুখে তার পাইপ।

শেষ পর্যন্ত তাহলে—, বললাম আমি, বড় বেগমসাহেবাই—

আমার কথা থামিয়ে দিয়ে কিরীটী বললে, Fool! I was a big fool! আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল ঐ নিস্তব্ধতার কারণ কি? Yes I must admit—স্বীকার আমাকে করতেই হবে সুব্রত, হত্যাকারী was not only clever—very much clever! শুধু তাই নয়—প্রচণ্ড দুঃসাহস তার। সামান্য এক নারী—

তাহলে কি—

কিন্তু এবারও আমার কথা শেষ হল না। কিরীটী আমার কথায় যেন কান না দিয়েই হীরা সিংকে চাপা গলায় নির্দেশ দিল, হীরা সিং, quick—এয়ারপোর্ট চল!

এয়ারপোর্ট?

হ্যাঁ, জলদি চল।

আমাদের গাড়ি ঘুরে এয়ারপোর্টের দিকে ছুটল।

বললাম, হঠাৎ এয়ারপোর্ট কেন? সেখানে কি—

একদম মনে ছিল না একটা কথা সুব্রত!

কি?

মস্কোর একটা International flight করাচি হয়ে যায়—আর সেটা ঠিক বারোটা পঞ্চান্নয় ছাড়ে।

কিন্তু—

হঠাৎ মনে পড়ল আমার, এক বন্ধুর আজ ঐ flight-এ ফ্রাঙ্কফুর্ট যাওয়ার কথা।

কড়েয়ার বাড়িতে যাবি না?

হ্যাঁ, এয়ারপোর্ট থেকে যাব।

কিন্তু ইতিমধ্যে—

কি?

বড় বেগমসাহেবা যদি গা-ঢাকা দেন?

পালাবেন কোথায়! পুলিস সর্বত্র তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে।

এয়ারপোর্টে যখন পৌঁছলাম, ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটটা ছাড়তে তখনও

মিনিট চল্লিশেক বাকী।

কনকনে শীতের রাত।

তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে আমরা লাউঞ্জে গিয়ে প্রবেশ করলাম। দূর থেকেই কাউণ্টারের সামনে নজরে পড়ল এক বোরখা-পরিহিতা মুসলমান মহিলা ও এক প্রৌঢ়কে।

প্রৌঢ়ের পরিধানে পায়জামা ও শেরওয়ানী, মাথায় ফেজ, মুখে কাঁচাপাকা চাপ দাড়ি, গোঁফ কামানো। হাতে একটা লাঠি। ওঁরা কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বোধহয় টিকিট চেক করাচ্ছেন, পাশে আরও কয়েকজন বিদেশী ও বিদেশিনী।

সুব্রত, দাঁড়া এখানে। আমি আসছি। কথাটা বলেই কিরীটী চলে গেল।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই কিরীটী ফিরে এল। সঙ্গে তার এয়ারপোর্ট পুলিসের একজন অফিসার।

ওরা দুজনে লাউঞ্জের পশ্চিম দিকে একটা নিরালা সোফার দিকে এগিয়ে গেল। বলা বাহুল্য, আমিও ওদের অনুসরণ করলাম।

একটা সোফার ওপর সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও সেই বোরখা-পরিহিতা মহিলা।

পুলিস অফিসারই কথা বললেন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে সম্বোধন করে, আপলোক ফ্লাইট নাম্বার ৭৬৯-সে যা রহে হেঁ?

জী কিঁউ?

গলা শুনে আমি চমকে উঠেছি।

If you don't mind, what's your name please?

হায়দার খান!

আপকা সাথ ইয়ে—

হামারা জেনানা।

May I have a look at your passport! Both of yours!

কিঁউ নেই! বলে প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাঁর পকেট থেকে পাসপোর্ট দুটো বের করলেন।

দশ

পুলিস অফিসার পাসপোর্ট দুটো খুলে পাশাপাশি ধরতেই কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঝুঁকে পড়লাম পাসপোর্টের ফটো দেখবার জন্য।

সঙ্গে সঙ্গে আবার দ্বিতীয় চমক।

এবং প্রথম বারের চমক যে আমার মিথ্যা নয় তাও প্রমাণিত হয়ে গেল।

কিরীটী চোখের ইঙ্গিতে যেন কি বলল পুলিস অফিসারকে। অফিসার পাসপোর্ট দুটো নিজের পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, **I am sorry Mr. Khan, এই flight-এ আপনাদের যাওয়া হতে পারে না।**

মাইকে তখন ঘোষণা শুরু হয়েছে ঃ Passengers bounded to Karachi, Moscow, Frankfurt are requested to proceed towards the Customs counter for their checkings of luggages --

হায়দার খান মনে হল যেন রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। বললেন, ইসকা মতলব !

আপ দোনোকো হামার সাথ পুলিস স্টেশন পর্ জানে পড়েগা ?

But why—why the hell—we should go the Police Station !

ঐ সময় কিরীটী সহসা হাত বাড়িয়ে খান সাহেবের দাড়িটা মুঠো করে ধরে এক হেঁচকা টানে নকল দাড়ি তার মুখ থেকে খসিয়ে এনে বললে, তাজুদ্দিন সাহেব, সবার চোখে ধুলো দিতে পারলেও আমার চোখকে আপনি পারেননি —now without creating a scene here—আপনার সঙ্গিনীকে বলবেন কি আপনার সঙ্গে তাঁকেও পুলিস স্টেশনে যেতে !

তাজুদ্দিন সাহেব থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন সত্যি।

ফ্যালফ্যাল করে কয়েকটা মুহূর্ত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিন্তু আমাকে ও আমার বেগমকে থানায় যেতে হবে কেন ? কি করেছি আমরা ?

আপনার পরামর্শমত উনি কিছুক্ষণ আগে নবাব সমশের আলীকে অজন্তা হোটেলের লনে হত্যা করেছেন।

What nonsense ! কি পাগলের মত যা-তা বলছেন ?

চলুন থানায়, সেখানেই সব প্রমাণ পাবেন।

বেশ, চলুন।

দেখলাম হঠাৎ যেন ভদ্রলোক শান্ত হয়ে গেলেন।

পুলিসের সশস্ত্র প্রহরায় তাদেরই ভ্যানে ওদের তুলে দেওয়া হল, আর আমরা আমাদের গাড়ীতেই অগ্রবর্তী পুলিসের ভ্যানকে অনুসরণ করলাম।

কোথায় আপাততঃ যাচ্ছি আমরা কিরীটী ? জিজ্ঞেস করলাম।

রাত কটা হয়েছে রে ? কিরীটী শুধাল।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, রাত সোয়া একটা। কি যাচ্ছি সব কোথায়—থানায় না বাড়িতে ?

আগে একবার সাহেবের কড়েয়ার বাড়িতে।

সেখানে এত রাত্রে ?

নাটকের শেষ দৃশ্য তো এখনও অভিনীতই হল না !

তার মানে ?

হোটেলের ব্যাপারটা তো নাটকের climax নয় !

মানে, এখনও climax বাকী আছে নাকি ?

আছে বৈকি। তাছাড়া—

তাছাড়া আবার কি ?

নাটক যেমন মঞ্চে সব চাইতে ভাল এবং ঠিক ঠিক জমে, তেমনি এ ধরনের হত্যারহস্যজনিত নাটকও জমে সেইখানেই যেখানে প্রথম রহস্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়।

হাসতে হাসতে বললাম, তুই যে দেখছি দিনকে-দিন ক্রমশঃ কবি হয়ে উঠছিস !

কবি নয় রে। তাছাড়া কবিতা কোথায় নেই বল্ জীবনে ! চোখে সব সময় আমাদের পড়ে না তাই—নচেৎ জন্মের সঙ্গে যেমন কবিতা আছে মৃত্যুর সঙ্গেও আছে।

তারপর একটু থেমে বললে, বর্তমান রহস্যের বীজ বল্—অঙ্কুরোদগম বল্—বেগমসাহেবার অপহৃত মণিকুণ্ডলের মধ্যেই ছিল। ঐ মণিকুণ্ডলজোড়া যদি চুরি না যেত, বেগমসাহেবা যদি আমার কাছে না আসতেন ছুটে এবং তাঁর পিছনে পিছনে ছোটি বেগমসাহেবা ও নবাব সাহেব, তাহলে হয়তো আজ হতভাগ্য নবাব সাহেবকে ঐ ভাবে বোধহয় প্রাণটা দিতে হত না !

বুঝলি সুব্রত, মানুষের যতগুলো রিপু আছে তার মধ্যে যে আদিমতম রিপু—তার কার্যকলাপটা সত্যিই বিচিত্র, মানুষের চিন্তা-ধারণারও বোধগম্যের বাইরে। সেই কবে মদনভস্মের সঙ্গে যে-কাহিনী শুরু হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি চলেছে আজও যুগ যুগ ধরে। মানুষের শিক্ষা কৃষ্টি রুচি কিছুই সেই আদিমতম রিপুর অব্যাহত গতি আজ পর্যন্ত রোধ করতে পারেনি। যার ফলে মানুষ যে এক জায়গায় পশুরও অধম সেটাই বার বার প্রমাণিত হয়ে চলেছে। যাক, আমরা বোধহয় এসে গেলাম !

হীরা সিং, নবাব সাহেবের বাড়ি—

ঠিক হ্যায়।

হীরা সিং গাড়ি চালাতে লাগল।

বাড়ির গেটের সামনে এসে যখন আমাদের গাড়ি দাঁড়াল, মধ্যরাত্রি উত্তীর্ণ হয়েছে। একটা স্তব্ধতা যেন চারিদিকে।

কোথাও কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই।

পুলিসের ভ্যানটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। কেবল পুলিস অফিসার মিঃ বাসুকে ডেকে নিল কিরীটী আমাদের সঙ্গে।

আমি, কিরীটী আর মিঃ বাসু।

কিরীটী যে হঠাৎ কেন অত রাত্রে ঐখানে এল তখনও বুঝে উঠতে পারিনি, তবে এটা বুঝতে পারছিলাম বিশেষ কোন অভিসন্ধি নিয়েই কিরীটী অত রাত্রে সোজা এয়ারপোর্ট থেকে নবাব সাহেবের কড়েয়ার বাড়িতে হানা দিয়েছে। এবং অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনেই।

মিঃ বাসু !

বলুন মিঃ রায়।

আমি হুইসেল দিলেই আপনি বোরখা-পরিহিতা বেগমসাহেবাকে উপরে নিয়ে আসবেন, but be careful—ও কিন্তু সাক্ষাৎ কালনাগিনী—এতটুকু সুযোগ পেলে ছোবল দিতে দেরি করবে না!

ঠিক আছে।

চল্ সুব্রত। তাহলে আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে দরজার কলিং বেল টিপল।

বার-দুই বেল টিপবার পরই ভৃত্য আবদুল এসে সদর দরজা খুলে দিল।

কাকে চাই?

ছোটি বেগমসাহেবা এখানে আছেন না?

জী, একটু আগেই এসেছেন।

চল, তাঁর ঘরে যাব।

আবদুল ইতস্ততঃ করে, কিন্তু আমাদের পাশেই পুলিস অফিসার মিঃ বসুকে দেখে আপত্তি করতে সাহস পায় না বোধহয়।

একটু বিব্রত হয়েই যেন বলে, চলুন।

ভিতরে প্রবেশ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কিরীটী শুধায়, আর কেউ সে ঘরে আছে?

বলতে পারি না।

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল।

মৃদু নক করতে ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে সাড়া এল, কে?

আবদুল বোধহয় আমাদেরও পুলিসের লোক ভেবেছিল। বললে, পুলিস!

ভিতরে আসতে বল।

আমরা ভিতরে ঢুকলাম।

এ সেই ঘর নবাব সাহেবের শয়নকক্ষ।

ঘরময় জিনিসপত্র ছড়ানো। দুটো আলমারির দরজাই হাট করে খোলা—তার ভিতরকার জিনিসপত্রও এলোমেলো।

ঘরের ভিতর একটা সোফায় বসে ছোটি বেগমসাহেবা নুরুন্নেসা। মাথার চুল উসকো-খুসকো—সমস্ত মুখ জুড়ে নিদারুণ একটা হতাশা যেন প্রকট হয়ে উঠেছে। আমরা ঘরে ঢুকতেই নুরুন্নেসা বেগম আমাদের মুখের দিকে তাকালেন। কেবল যেন বোবা অসহায় শূন্য দৃষ্টি।

কি হল ছোটি বেগমসাহেবা, পেলেন না কুণ্ডলজোড়া? কিরীটী শান্ত গলায় প্রশ্ন করল।—আপনার বোঝা উচিত ছিল ছোটি বেগমসাহেবা যে সে কুণ্ডল জোড়া আপনার পক্ষে খুঁজে বের করা সম্ভব কোনদিনই ছিল না।

ছোটি বেগমসাহেবা কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়েই আছেন শূন্য দৃষ্টিতে। তখনও কিরীটীর কথাগুলো তাঁর কানে প্রবেশ করেছে বলে মনে

হল না।

কিরীটী এরপর তার পকেট থেকে একটা কালো পার্স বের করে ছোটি বেগমের সামনে এগিয়ে ধরল, দেখুন, কুণ্ডলজোড়া হয়তো এর মধ্যেই আছে!

সহসা যেন হাত বাড়িয়ে কিরীটীর প্রসারিত হাত থেকে কালো পার্সটা বাঘিনীর মত ছিনিয়ে নিয়ে, ভিতরে ঘাঁটতেই একজোড়া কুণ্ডল বের হয়ে এল।

ছোটি বেগমের চোখের মণি দুটো লালসায় চিকচিক করে ওঠে।

কিরীটী ঐ সময় শান্তগলায় বললে, ছোটি বেগমসাহেবা, ঐ কুণ্ডল পাওয়া না পাওয়া আজ মিথ্যা!

কি বললেন?

ঠিকই বলছি। সেফের মধ্যে যে সব জুয়েল্‌স্‌ ছিল তা আগেই একজন বের করে নিয়েছে। সেফ খুলে দেখতে পারেন—সেফ খালি!

তথাপি ছোটি বেগম বিশ্বাস করলেন না বোধহয় কিরীটীর কথা। ছুটে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে সেফটা কুণ্ডলজোড়ার সাহায্যে খুলে ফেললেন তখুনি।

কিন্তু দেখা গেল কিরীটীর কথাই সত্যি। সেফ শূন্য। তার মধ্যে জুয়েল্‌সের বাক্সটা নেই।

বিশ্বাস হল তো এখন! কিন্তু এখন বলুন—সে-রাত্রে বড় বেগমসাহেবার পানীয়ের সঙ্গে কে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল-আর কার পরামর্শে!

তাজুদ্দিন—হ্যাঁ, তাজুদ্দিন—

কিন্তু জানেন কি, সে আপনাকে ফাঁকি দিয়ে আজ রাত্রের প্লেনে পাকিস্তান-

চলে গিয়েছে? সে যে বলেছিল কাল যাবে! চিৎকার করে উঠলেন ছোটি বেগম।

যেতে পারেনি। কিরীটী বললে।

পারেনি? তবে কোথায় সে?

কিরীটী জানলার ধারে গিয়ে হুইশেল বাজাল। এবং হুইশেল বাজিয়ে ফিরে এসে ছোটি বেগমসাহেবার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, বুঝতে পারছেন বেগমসাহেবা, লোভের মাশুল আপনাকে কি মর্মান্তিক ভাবেই না শোধ করতে হল!

আমি—

জানি আপনি ভুল করেছিলেন, কিন্তু একজন নারী হয়ে এত বড় ভুলটা করলেন কি করে?

উঃ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি—দিদির মনে ঐ ছিল; ভাবতে পারিনি সামান্য কয়েকটা জুয়েল্‌সের জন্য সে তার স্বামীকে পর্য্যন্ত হত্যা করতে পারে!

কিন্তু আমি সে কথা বলছি না ছোটি বেগমসাহেবা—আমি বলছিলাম—

কিন্তু কিরীটীর কথা শেষ হল না, মিঃ বাসু তাজুদ্দিনকে হাতকড়া-পরা অবস্থায় ও বোরখা-ঢাকা বড় বেগমসাহেবাকে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন।

তাজুদ্দিনকে দেখে নুরুন্নেসা যেন পাগলের মতই চিৎকার করে উঠল, তাজ—you traitor - filthy snake—

দাঁড়ান দাঁড়ান ছোটি বেগম, ব্যস্ত হবেন না। কিরীটী বললে, ওর ন্যায্য প্রাপ্য শাস্তি আদালতই দেবে। কিন্তু দেখুন তো,—বোরখা-ঢাকা বড় বেগম-সাহেবার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে শান্ত গলায় কিরীটী বললে, ওঁকে চিনতে পারছেন কি না? আমাদের এই বোরখা-আবৃতাকে?

চিনতে পারব না কেন? বড় বেগমসাহেবা! ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে বললে, নুরুন্নেসা বেগম।

হ্যাঁ, উনিই আপনার স্বামীর হত্যাকারী—তাই না? তবে উনি বড় বেগম-সাহেবা নন! কিরীটী শান্ত গলায় বললে একটু থেমে থেমে।

তবে কে? Who—who is she!

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে সহসা একটানে ক্ষিপ্রহাতে বোরখা-আবৃতা নারীর বোরখাটা মুখ থেকে তুলে দিতেই, সকলের গলা থেকে যেন একটা অস্ফুট বিস্ময়ের ধ্বনি নির্গত হল।

এ কি—মরিয়ম!

ছোটি বেগম বললেন, মরিয়ম তুই! তোর এই জঘন্য কাজ!

মরিয়ম নির্বাক।

কিরীটী এবারে মরিয়মের দিকে তাকিয়ে বললে, মরিয়ম, তুমি অতীব ধূর্ত সন্দেহ নেই—কিন্তু তুমি জান না আজ সন্ধ্যায় বড় বেগমসাহেবাকে যখন আমি ফোন করি তুমি ফোন ধরে আমার সঙ্গে কথা বললেও তোমার গলা যে বেগমসাহেবার নয় সেটা বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি। আর বুঝতে পেরেও চুপ করেছিলাম বলেই তুমি এত সহজে আমার পাতা ফাঁদে পা দিয়েছিলে! কিন্তু তুমি আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলে কেমন করে জান?

ফোনে আমার কথার জবার কেবল হাঁ-হুঁ করে সারছিলে যখন, সঙ্গে সঙ্গে মনে আমার সন্দেহ হয়—তাই যাচাই করবার জন্য তুমি ফোন ছেড়ে দেবার একটু পরেই দ্বিতীয়বার আবার যখন ফোন করলাম, ফোনের লাইন এনগেজড পেলাম—অর্থাৎ তুমি লাইনটা কেটে রেখেছিল প্লাগ থেকে তারটা খুলে—চেয়ে দেখো এখনও লাইনটা খোলাই আছে প্লাগ থেকে, ফোনটা আবার প্লাগে লাগিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিলে। এমনই হয়—ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

আমরা চেয়ে দেখলাম কিরীটীর কথা মিথ্যা নয়, প্লাগে ফোনের কানেক-শনটা খোলা। কিরীটী আবার বলে, পাছে বড় বেগমসাহেবার কাছে ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায় বলেই তুমি ওই কাজ করেছিলে। অবিশ্যি এও বলব, আমি যখন বড় বেগমসাহেবাকে ফোন করি—ভাগ্যক্রমে তুমি এই ঘরে ছিলে এবং ফোনে আমার গলার স্বর শুনেই বুঝতে পেরেছিলে আমি কে! সমস্ত ব্যাপারটাই একটা আকস্মিক যোগাযোগ।

এব্যার বল তো মরিয়ম, বড় বেগমসাহেবা কোথায়—তাঁকেও কি নবাব-

সাহেবের মত তুমি আর তাজুদ্দিন সাহেব দুজনে মিলে শেষ করে দিয়েছ, না এখনও তিনি জীবিত ?

মরিয়ম নির্বাক।

কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি থেকে যে ঘৃণা আর অবজ্ঞা ঝরে পড়ছিল, সেটা বুঝতে আমাদের কারুরই কষ্ট হয় না।

কিরীটী ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললে, সুব্রত ওর মুখ থেকে কোন কথাই বের করা যাবে না! মিঃ বাসু, আপনি আর সুব্রত বাড়িটা খুঁজে দেখুন—আমার ধারণা বড় বেগমসাহেবা এই বাড়ির মধ্যেই কোথাও-না-কোথাও আছেন। অবিশ্যি জানি না হতভাগিনী এখনও জীবিতা আছেন কিনা। আমি এখানেই রইলাম।

আমি আর মিঃ বাসু তখুনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম।

প্রথমেই পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

কিন্তু বেশী খোঁজাখুঁজি করতে হল না। ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের মধ্যেই বড় বেগমসাহেবাকে পাওয়া গেল। হাত-মুখ-বাঁধা অবস্থায় বাথরুমের মধ্যেই পড়ে আছেন বড় বেগমসাহেবা দেখা গেল। কিন্তু তাঁর জ্ঞান নেই।

হাত পা ও মুখের বাঁধন খুলে দিয়ে তাঁর চোখে কিছুক্ষণ জলের ঝাপটা দিতেই বড় বেগমসাহেবার জ্ঞান ফিরে এল। কাতর শব্দ করে চোখ মেলে তাকালেন তিনি।

দেখা গেল মাথায় তাঁর একটা আঘাতের চিহ্ন। বোধ হয় কোন ভারী বস্তুর সাহায্যে মাথায় আঘাত হেনে তাঁকে অজ্ঞান করে হাত-পা-মুখ বেঁধে বাথরুমের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছিল।

ধরাধরি করে আমি আর মিঃ বাসু তাঁকে তাঁর শয়নকক্ষে নিয়ে এলাম।

কেমন বোধ করছেন এখন বড় বেগমসাহেবা ? জিজ্ঞাসা করলাম।

ক্ষীণকণ্ঠে বললেন বেগমসাহেবা, মাথায় বড় যন্ত্রণা।

কে আপনার মাথায় আঘাত করেছিল জানেন ?

না।

জানতে পারেননি ?

না। বসে বসে একটা বই পড়ছিলাম, হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে মাথায় আঘাত করেছিল—তারপর আর কিছুই জানি না। একটু জল—

ঘরে সরাইয়ের মধ্যে জল ছিল, জল দিলাম। জলপান করে যেন একটু সুস্থ হলেন।

উঠে এবারে পাশের ঘরে যেতে পারবেন ?

পারব।

চলুন তাহলে পাশের ঘরে।

বড় বেগমসাহেবা তখনও বেশ দুর্বল মনে হল আমাদের। আমিই তাঁকে ধরে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেলাম। ঘরে ঢুকে কিরীটীকে সব কথা বললাম।

বড় বেগমসাহেবা ছোটি বেগমসাহেবার দিকে তাকিয়েছিলেন—ছোটি বেগমসাহেবাও বড় বেগমসাহেবার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

ছোটি বেগমসাহেবা!

কিরীটীর ডাকে নুরুন্নেসা বেগম ওর মুখের দিকে তাকাল।

এবার সব স্বীকার করুন।

কি স্বীকার করব?

কেন, আজ যা-যা ঘটেছে।

আমি—আমি কিছু জানি না।

জানেন আপনি সব কিছুই, কারণ আপনি নাটের গুরু!

কি বলছেন যা-তা মিঃ রায়?

ভুলে যাবেন না বেগমসাহেবা, আমি কিরীটী রায়। আমার চোখে আপনি ধুলো দিতে পারেননি। আর এও তো বুঝতে পারছেন তাসের ঘর আপনার ভেঙে গিয়েছে—the cat is now out of the bag!

What do you mean?

ঠিক যা সত্যি তাই মিন করেছি আমি। কারণ মরিয়ম নয়—it was you—হ্যাঁ, আপনিই নবাব সাহেবকে হত্যা করেছেন।

Are you mad? আপনি কি ক্ষেপে গেলেন? তীক্ষ্ণ প্রতিবাদের কণ্ঠে বলে উঠলেন ছোটি বেগমসাহেবা।

না, ক্ষেপিনি। যা বলছি তা সত্যি জেনেই বলছি। আপনি হত্যা করেছেন আপনার স্বামীকে।

I must warn you Mr. Roy, it is extremely damaging—মানহানিকর।

কিরীটী মৃদু হাসল। তারপর শান্তকণ্ঠে বললে, damaging তো বটেই, তবে ফাঁসির দড়িটা এড়াতে পারবেন না।

আমরা ঘরের মধ্যে সকলেই নির্বাক স্তম্ভিত হয়ে তখনো দাঁড়িয়ে।

ভাবছেন কেমন করে প্রমাণ করব কথাটা, তাই না বেগমসাহেবা? প্রমাণ—হ্যাঁ, দুটো মোক্ষম প্রমাণ আমার হাতে আছে।

কি বললেন?

বললাম তো, দুটো প্রমাণ আছে আমার হাতে। বলতে বলতে পকেট থেকে ভাঙা কাচের চুড়ির একটা অংশ ও একটা মেয়েলী হাতের দস্তানা বের করল কিরীটী, look—চেয়ে দেখুন। চিনতে পারছেন এই বস্তু দুটি? একটা ভাঙা কাচের চুড়ির অংশ আর এই দস্তানাটা—এ দুটোই যে আপনার সেটা প্রমাণ করতে আদালতে কষ্ট হবে না। এ দুটোই আমি হোটেলের বাগানে ঘটনাস্থলে কুড়িয়ে পেয়েছি। হাতে দস্তানা এঁটে আপনার স্বামীকে আপনি ছোরা মেরে হত্যা করেছিলেন—যাতে করে ছোরার বাঁটে আপনার হাতের কোন চিহ্ন না পাওয়া যায়, আর আপনার হাতের ঐ কাচের চুড়িগুলোই প্রমাণ করে

দেবে ওরই একটা ছোরা মারার সময়ে ভেঙে গিয়েছিল— so you understand, you are caught red-handed !

নির্বাক স্তব্ধ সকলে। বোবা স্তব্ধতা একটা ঘরের মধ্যে।

নুরুন্নেসা বেগম তখন পাথরের মত নিষ্প্রাণ।

কিরীটী মিঃ বাসুর দিকে একবার চেয়ে বলল, ওঁকে arrest করুন মিঃ বাসু—আমার কাজ শেষ হয়েছে। তবে মরিয়ম আর তাজুদ্দিন সাহেবকেও ছাড়বেন না—তারাও conspxiracy-র মধ্যে ছিল।

মিঃ বাসুর ইঙ্গিতে একজন সেপাই এগিয়ে গিয়ে নুরুন্নেসার হাতে লোহার বালা পরিয়ে দিল।

বড় বেগমসাহেবা, আমি সত্যিই দুঃখিত। কুণ্ডলজোড়া আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারলেও, আপনাকে অন্ধ বিশ্বাসের খেসারত দিতে হল। চল সুব্রত।

আমরা ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

॥ এগারো ॥

পরের দিন কিরীটীর বাড়ির বাইরের ঘরেই বসে সমস্ত ব্যাপারটার বিশ্লেষণ করছিল। ঘরের মধ্যে আমি, মিঃ বাসু ও বড় বেগমসাহেবা ছিলেন। কিরীটী বলছিল, সব ঘটনার মূলেই ঐ অভিশপ্ত মণিকুণ্ডলজোড়া। মাস চারেক আগে তাজুদ্দিন খান লাহোর থেকে এখানে ভারতবর্ষে আসে। এসে ওঠে নবাব সাহেবের গৃহেই। এবং ধূর্ত তাজুদ্দিনের বুঝতে বেশী দেরী হয় না যে নবাব সাহেবের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

বড় বেগমসাহেবা বললেন, আমি কথায় কথায় ওকে একদিন কথাটা বলেছিলাম !

শুধু তাই নয়, আরও একটা কথা নিশ্চয়ই বলেছিলেন—নবাব বংশের রেয়ার জুয়েল্‌স্‌গুলোর কথাও, নয় কি ?

হ্যাঁ।

সেটাই হয়েছিল আপনার মারাত্মক ভুল।

বুঝতে পারিনি—

জানি। যাই হোক, জুয়েল্‌স্‌গুলোর কথা শুনে তাজুদ্দিনের মনে লোভের সঞ্চার হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবতে শুরু করে, কি করে সেগুলো হাতিয়ে সে পাকিস্তানে সরে পড়বে !

এদিকে একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল—

কি ? প্রশ্ন করলাম আমি।

খুপসুরৎ চেহারা তাজুদ্দিন খানের - একই সঙ্গে যার ফলে দুটি নারী তার প্রতি আকৃষ্ট হল—ছোটি বেগমসাহেবা আর মরিয়ম বিবি। ফলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেল আপনা হতেই দৈবক্রমে তাজুদ্দিন খানের কাছে।

দুজনের সঙ্গেই ভদ্রলোক প্রেমের খেলা শুরু করলেন। মরিয়ম বিবি আর নুরুন্নেসা বেগম! অথচ দুজনের একজনও ব্যাপারটা সন্দেহ করল না।

দুজনকেই বোঝালেন খান সাহেব, জুয়েল্‌স্‌গুলো হাতিয়ে পাকিস্তানে সরে পড়বেন। দুজনেই সাহায্য করতে লাগল তাকে।

মরিয়মকে তুই সন্দেহ করেছিলি কখন? প্রশ্ন করলাম আমি।

বড় বেগমসাহেবার মুখ থেকে তাঁর কুণ্ডল চুরির বৃত্তান্ত শুনেই। কারণ পানীয়ের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ দিয়ে কুণ্ডল চুরি-করা তার পক্ষে যতটা সহজ ছিল অন্য কারও পক্ষে সেটা ছিল না। ঐ সঙ্গে এও বুঝেছিলাম, মরিয়মের মত সামান্য এক দাসী কারোর পরামর্শ ব্যতীত ঐ দুঃসাহসিক কাজ করতে পারে না।

কিন্তু সে কে? কে দিয়েছিল পরামর্শ তাকে?

ছোটি বেগমসাহেবা—না, এক নারী কখনও অন্য এক নারীকে অতটা বিশ্বাস করতে পারে না।

তাই ভাববার জন্য ব্যাপারটা বড় বেগমসাহেবার কাছে দুদিনের সময় নিয়েছিলাম।

তারপরই নবাব সাহেবের ওখানে গিয়ে খান সাহেবকে দেখে ও তার ছোটি বেগমের কথাগুলি শুনে মনে মনে বুঝলাম এর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি আছে—আর সে অন্য কেউ নয়, ঐ আমাদের খান সাহেব।

তারপর?

সঙ্গে সঙ্গে খান সাহেব সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারলাম—তার পাকিস্তান ফিরে যাবার এয়ার প্যাসেজ বুক্‌ড্‌ হয়ে গিয়েছে। বুঝলাম তখন যা কিছু ঘটার ঐ রাত্রেই ঘটবে। আর ঐ পার্টিই হচ্ছে সব চাইতে বড় সুযোগ। তাই পার্টিতে যাই আমি। এখন কথা হচ্ছে, মরিয়ম বিবিকে চিনতে পারা সত্ত্বেও কেন তাকে জানতে দিলাম না। জানতে দিইনি এই কারণে, তাহলে অত সহজে মরিয়ম বিবিকে ধরতে পারতাম না।

নবাব সাহেবও কি মরিয়মকে চিনতে পারেননি? প্রশ্ন করলাম আমি, সে রাত্রে?

নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিলেন।

তবে?

লনে নিয়ে গিয়েছিলেন তাকে নুরুন্নেসা ও তাজুদ্দিন সাহেবের ব্যাপারটা জেনে নেবার জন্য। কিন্তু হতভাগ্য জানতেন না, ঐ রাত্রেই তাজুদ্দিন ও নুরুন্নেসা মতলব করে ছিল তাঁকে শেষ করে ফেলার জন্য!

তাহলে, everything was pre-arranged?

তাই। সবটাই স্থির মস্তিষ্কের পূর্ব-পরিকল্পিত ব্যাপার ছিল! হয়ত—

কি?

তাজুদ্দিন খান ও নুরুন্নেসা দুজনেই মতলব করেছিল, যে সুবিধা পাবে

সেই নবাব সাহেবকে হত্যা করবে সে-রাত্রে। হয়তো পানীয়ের সঙ্গে বিষ দিয়েই হত্যা করতে চেয়েছিল, যাতে করে কোন সন্দেহ তাদের উপর না পড়ে। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটনাচক্রে হয়ে দাঁড়াল অন্য—

মানে? মিঃ বাসু শুধালেন।

মরিয়মকে চিনতে পেরে নবাব সাহেবের মনে সন্দেহ জাগে, ফলে তিনি আর তার সঙ্গ ছাড়তে চাননি।

নবাব সাহেব তাহলে কুণ্ডলজোড়া পেলেন কি করে?

probably that was another story! কিরীটী বললে।

কি রকম?

নবাব সাহেব হয়তো মরিয়ম বিবির কাছ থেকেই কুণ্ডলজোড়া কিছুটাকা বকশিশ দিয়ে হাতিয়ে নিয়েছিলেন! কারণ মরিয়ম বিবিকে হাত করা নবাব সাহেবের পক্ষে খুব একটা অসাধ্য কিছু ছিল না কিংবা হয়তো মরিয়মের সঙ্গে সাহেবের কোন অবৈধ সম্পর্কও ছিল। তারপর যা ঘটেছে—তাও আমার কিছুটা অনুমান—

কি রকম? শুধালেন মিঃ বাসু।

কুণ্ডলজোড়া মরিয়ম বিবির হাত-ছাড়া হয়ে যাবার পর হয়তে খান সাহেবের মরিয়ম বিবির সঙ্গে প্রেমটা চটে যায়—

খুব সম্ভব। বললাম আমি।

সম্ভব নয়, হয়তো তাই হয়েছিল আর তাইতেই মরিয়ম স্থির করে—যেমন করেই হোক খান সাহেবের কাছ থেকে কুণ্ডলজোড়া আবার হাতিয়ে নিয়ে যে করেই হোক যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেবে।

মরিয়ম বিবি কি কুণ্ডলের আসল রহস্য জানতে পেরেছিল বলে তোর মনে হয় কিরীটী? প্রশ্ন করলাম আমি।

সম্ভব নয়। তাহলে সে অত সহজে কুণ্ডলজোড়া হাত-ছাড়া করত না। নবাব সাহেবও সেটা পেতেন না।

মিঃ বাসু বললেন, সত্যিই অভিশপ্ত কুণ্ডল!

কিরীটী বললে, সত্যিই তাই মিঃ বাসু। নচেৎ নিজের জিনিসের জন্যই বা নবাব সাহেবকে ঐভাবে প্রাণ দিতে হবে কেন?

বড় বেগমসাহেবা বললেন, অথচ একবারও যদি সে চাইত কুণ্ডলজোড়া আমার কাছে, দিয়ে দিতাম।

বেগমসাহেবার চোখে জল।

বেগমসাহেবা!

কিরীটীর ডাকে বেগমসাহেবা অশ্রুসজল চোখ দুটি তুলে তাকালেন ওর মুখের দিকে।

কুণ্ডল সম্পর্কে যে কাহিনী আপনি বলেছিলেন, সবটাই তাহলে আপনার বানানো?

হ্যাঁ।

তবে কেন বলেছিলেন ?

আমি যদি জানতাম কুণ্ডল আমার স্বামীই নিয়েছে—

তাহলে আসতেন না আমার কাছে, তাই না ?

হ্যাঁ। তাছাড়া আমি—

নরুন্নেসা বেগমের হাত থেকে স্বামীকে আপনার আবার ফিরে পেতে চেয়েছিলেন, তাই তো ?

হ্যাঁ। আমি ভাবিনি সে অমন করে ওকে গ্রাস করবে! ভেবেছিলাম দুজনে মিলে মিশে থাকব। বলতে বলতে দু'ফোঁটা অশ্রু বড় বেগমসাহেবার শীর্ণ গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

আমি এবার যাই!

আসুন।

বেগমসাহেবা নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন বোরখাটা মুখের ওপর টেনে দিয়ে।

— সমাপ্ত —

নীহার রঞ্জন গুপ্ত

কিরীটী অমনিবাস